আরবি ভাষা ও সাহিত্য শেখার কলাকৌশল



মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল আউয়াল

তিনি স্বপ্ন দেখতেন অনেক বড়ো হওয়ার। আদর্শ লেখক হওয়ার। প্রতিনিয়ত লিখতেন। আরবি ও বাংলা উভয় ভাষায়ই তাঁর দক্ষতা ছিল ঈর্ষনীয়।

বর্তমানে তিনি জামিআতুন নুর আল ইসলামিয়া ঢাকা-য় আরবি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের বিভাগীয় প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এছাড়াও তিনি একাধিক জামিয়ায় আরবি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগে খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করছেন।

ছাত্রজীবন থেকেই তিনি সময় ও নিয়মাবর্তিতায় অত্যন্ত সজাগ ও যত্নশীল। প্রতিটি মুহূর্তকে মুতালাআ ও গভীর অধ্যয়ন, তাহকিক ও গবেষণা, তাসনিফ-তালিফ ও লেখালেখিতে ব্যয় করতে ভালোবাসেন। ইতোমধ্যে মাকতাবাতুত তাকওয়া, বাংলাবাজার, ঢাকা থেকে প্রকাশিত তাঁর তাহকিক ও তালিককৃত শরহে বেকায়া (১ম খণ্ড) কিতাবটি দেশবরেণ্য মুহাক্কিক উলামায়ে কেরামের নিকট ব্যাপক সমাদৃত হয়েছে। অর্জন করেছেন বিজ্ঞ মুরব্বি উলামায়ে কেরামের স্নেহ, প্রীতি, ভালোবাসা ও আস্থা।

এছাড়াও আরবি ও বাংলা উভয় ভাষায় তাঁর লিখিত, অনূদিত, সম্পাদিত ও তাহকিক-তালিককৃত সর্বমোট ষলোটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তার মাঝে অন্যতম হলো 'তারাজিমুল আলাম আল্লাজিনা বাজালু জুহুদাহুম ফি নাশরিল ইসলাম, সাফাহাতুম মিনাত তাআম্মুলাত ওয়ান নাজারাত, রাওয়ায়িয়ুল কিসাসিল আদাবিয়্যাহ, রাওয়ায়িয়ুত তাআবির, আবু বকর আসসিদ্দিক রা., নবিপ্রেমের নিদর্শন, আরবি কথোপকথন কীভাবে শিখব, গল্পে গল্পে জীবন সাজাই, আরবি ভাষা ও সাহিত্য শেখার কলাকৌশল' ইত্যাদি। আরো সাতটি বই প্রকাশিতব্য। লেখালেখি করেছেন একাধিক আরবি ও বাংলা পত্রিকায়। তাঁর কলমের যাদুময়ী লেখার মুগ্ধ পাঠক আমি।

–মুফতি আবু জর হুসাইন

শিক্ষক: জামিয়া রাহমানিয়া আজিজিয়া
বসিলা, মুহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭



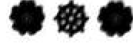
আরবি ভাষা ও
সাহিত্য শেখার কলাকৌশল

মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল আউয়াল
উসতাযুল আদাবিল আরাবি
জামিআতুন নুর আল ইসলামিয়া ঢাকা

মুআসসাসাহ আরাবিয়্যাহ বাংলাদেশ

আরবি ভাষা ও সাহিত্য শেখার কলাকৌশল

লেখক	মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল আউয়াল
প্রকাশক	মুআসসাসাহ আরাবিয়্যাহ বাংলাদেশ ০১৭৬৫১২৭৭৫৫
প্রথম প্রকাশ	নভেম্বর ২০২২ঈ.
স্বত্ব	লেখক
পরিবেশক	**# মাকতাবাতুত তাকওয়া**, ১১/১ ইসলামী টাওয়ার, (আণ্ডার গ্রাউণ্ড), বাংলাবাজার, ঢাকা। ০১৯৬২৪১৫০৭০ **# তারুণ্য প্রকাশন**, দোকান নং: ১৩, ২য় তলা, ইসলামি টাওয়ার, ১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০ ০১৯৭৯৪৫৬৭২১, ০১৯৭৯৪৫৬৭২২
অনলাইন পরিবেশক	ওয়াফি লাইফ, www.wafilife.com
প্রাপ্তিস্থান	মুআসসাসাহ আরাবিয়্যাহ বাংলাদেশ ০১৭৬৫১২৭৭৫৫
প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা	মুনীর সাআদাত
©	এই বইটির স্বত্ব লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত। লেখকের অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো অংশ যেকোনো উপায়েই ইলেক্ট্রনিক বা প্রিন্ট মিডিয়ায় পুনঃপ্রকাশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। স্ক্যান করে ইন্টারনেটে (পিডিএফ) আপলোড করা বা ফটোকপি কিংবা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং আইনত দণ্ডণীয়। ধন্যবাদ।
মুদ্রিত মূল্য	৩২০ টাকা মাত্র



আ । ল । ই । হ । দা

সাইয়েদ আবুল হাসান আলি নাদাবি রহিমাহুল্লাহ

যাঁর প্রতিটি লেখা আমার হৃদয়কে স্পর্শ করে এবং যাঁর মতো
হওয়ার জন্য রোজ প্রভাতে আকাশের দিকে তাকিয়ে
প্রভুর কাছে প্রার্থনা করি।

জামিয়া রাহমানিয়া আজিজিয়া মুহাম্মাদপুর ঢাকা-র স্বনামধন্য প্রধান মুফতি ও সিনিয়র মুহাদ্দিস এবং কালজয়ী বিখ্যাত গ্রন্থ 'আল বুদুরুল মুজিয়্যাহ ফি তারাজিমিল হানাফিয়্যাহ' এর সম্মানিত গ্রন্থকার আল্লামা মুফতি হিফজুর রহমান হাফিজাহুল্লাহ-র **দুআ ও বাণী**

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

পৃথিবীর সকল ভাষার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষা হলো আরবি ভাষা। কেননা এটি আল কুরআনুল কারিমের ভাষা, হাদিস শরিফের ভাষা। বিশ্বের মুসলমানদের নিকট আরবি ভাষাকে ধর্মীয় ভাষা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। আরবি ভাষা ইসলামি জ্ঞানচর্চা ও মুসলিম সমাজ-সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। আল্লাহ তাআলা বলেন, "إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون" অর্থ: "নিশ্চয় আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি আরবি ভাষায়, যেন তোমরা উপলব্ধি করতে পারো।" (সুরা ইউসুফ: ২)

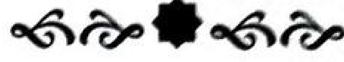
যেকোনো ফন বা শাস্ত্রে গভীর জ্ঞান অর্জনের জন্য সর্বপ্রথম আরবি ভাষার জ্ঞান অর্জন করা আবশ্যক। কেননা ইলমুল কুরআন, ইলমুত তাফসির, ইলমুল হাদিস, ইলমুল ফিকহ ইত্যাদি শাস্ত্রের অধিকাংশ কিতাব আরবি ভাষাতেই লিখিত। তো আরবি ভাষা শেখার আদর্শ কিছু পথ-পন্থা রয়েছে। সেগুলো অনুসরণ করে মেহনত করলে অতি সহজে ও যথাযথভাবে আরবি ভাষাজ্ঞান অর্জিত হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। আমার অত্যন্ত স্নেহশীল ছাত্র মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল আউয়াল 'আরবি ভাষা ও সাহিত্য শেখার কলাকৌশল' নামক একটি গুরুত্বপূর্ণ কিতাব রচনা করেছে। কিতাবটির বিভিন্ন অংশ আমি পড়ে দেখেছি। তাতে আরবি ভাষা শেখার আদর্শ পথ ও পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। আরবি ভাষার শিক্ষার্থীর জন্য এটি অত্যন্ত উপকারী একটি কিতাব।

আমি দুআ করি, আল্লাহ তাআলা কিতাবটিকে সকল শিক্ষার্থীর জন্য উপকারী বানান এবং কবুল করুন। এর লেখককেও কবুল করুন। তার যোগ্যতাকে আরো বাড়িয়ে দিন এবং ইখলাস ও ইতকানের সাথে সারা জীবন ইলমি কাজ করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

হিফজুর রহমান

মুফতি হিফজুর রহমান হাফি.

৩ জুলাই ২০২২ঈ. রোববার



ভূমিকা

الحمد لله الذي أنزل الكتاب بلسان عربي مبين، وغرس حب العرب ولغتهم في قلوب المسلمين، والصلاة والسلام على رسوله العربي الأمين، وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد.

আল্লাহ তাআলার অশেষ মেহেরবানিতে আমার দীর্ঘ চার বছরের মেহনত ও পরিশ্রমের সুফল এখন আমার সামনে দেখতে পাচ্ছি। এজন্য আমি আল্লাহর দরবারে হৃদয়ের গভীর থেকে শুকরিয়া আদায় করছি। আলহামদুলিল্লাহ। বহু কষ্টের পর যখন কোনো একটি কাজ সামনে আসে তখন কী যে আনন্দ লাগে! সে আনন্দের কথা মুখের ভাষায় কিংবা কলমের কালিতে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। একজন কৃষক জমিতে ধানের চারা বপন করে। চারাগুলো ধীরে ধীরে বড়ো হতে থাকে। তাতে পানি দেয়। আগাছা পরিষ্কার করে। রোদে পুড়ে। বৃষ্টিতে ভিজে। এভাবে কষ্ট করতে করতে একদিন যখন ধানের সেই ছোট্ট চারাগুলো আকারে বড়ো হয় তখন পাকা ধানের মৌ মৌ করা গন্ধে কৃষকের মনে আনন্দের ঢেউ খেলে যায়। সোনালী ধানের অপরূপ দৃশ্য তার চোখ দুটোকে জুড়িয়ে দেয়। ঠিক তেমনি একজন লেখককে গ্রন্থ রচনায় নিমজ্জিত থাকতে হয়। অনেক কষ্ট পোহাতে হয়। দিনের পর দিন পরিশ্রম করে যেতে হয়। রাত নেই, দিন নেই, সকাল নেই, সন্ধ্যা নেই, একজন কলমচাষী কলম চর্চায় আত্মনিমগ্ন থাকেন। একটি বই প্রকাশ করতে যে কত কষ্ট করতে হয় টুকটাক লেখালেখি যারা করে একমাত্র তারাই তা উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে। শত কষ্টের পর যখন বইটি প্রকাশিত হয়, তখন এতটাই আনন্দ লাগে যে, পেছনের সব কষ্টের কথা ভুলে যায়। যেন কোনো কষ্টই ছিল না।

যাহোক, আমার এই বইটি, যেটি এখন পাঠকের হাতে বিগত চার বছর মেহনতের ফসল। আমার বড়ো আশা ছিল, আরবি ভাষা ও সাহিত্য শেখার আদর্শ পথ ও পদ্ধতি বিষয়ে একটি গ্রন্থ রচনা করব। আল্লাহ তাআলা আমার

সেই আশা পূরণ করেছেন। এজন্য আমি আল্লাহর দরবারে আবার শুকরিয়া আদায় করছি আলহামদুলিল্লাহ।

নিঃসন্দেহে আরবি ভাষা হলো পৃথিবীর সবচেয়ে শ্রেষ্ঠতম ভাষা। কেননা তা পবিত্র কুরআনে কারিম ও হাদিস শরিফের ভাষা। একজন মানুষ যেই ফনেই মাহির বা দক্ষ হতে চায়, তাকে সর্বপ্রথম আরবি ভাষার গভীর জ্ঞান অর্জন করতে হয়। কারণ কুরআন, হাদিস, তাফসির, ফিকহ-ফাতাওয়া, নাহু, সরফ ইত্যাদি ফনের অধিকাংশ কিতাবগুলোই হলো আরবি ভাষায় লিখিত। তাছাড়া পবিত্র কুরআনে কারিম যেহেতু আরবি ভাষায়ই অবতীর্ণ, তাই আরবি ভাষাজ্ঞান অর্জন করা ব্যতীত কুরআনে কারিম গভীরভাবে অনুধাবন করা সম্ভব নয়। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون (يوسف: ٢)

অর্থ: আমি একে আরবি ভাষায় কুরআনরূপে অবতীর্ণ করেছি, যাতে তোমরা বুঝতে পার।[১]

অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে-

قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون (الزمر: ٢٨)

অর্থ: এটা আরবি কুরআন, নয় বক্রতাপূর্ণ, যাতে মানুষ তাকওয়া অবলম্বন করে।[২]

আরো বর্ণিত হয়েছে-

إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون (الزخرف:٣)

অর্থ: আমি একে বানিয়েছি আরবি কুরআন, যাতে তোমরা বুঝতে পার।[৩]

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ. এর 'ইকতিদউস সিরাতিল মুসতাকিম লি মুখালাফাতি আসহাবিল জাহিম' কিতাবের ৪নং খণ্ডের ৪৭০ নং পৃষ্ঠায় আমিরুল মুমিনিন হজরত উমর ইবনুল খাত্তাব রা. এর একটি উক্তি বর্ণিত আছে-

---

(১) সুরা ইউসুফ, আয়াত: ২

(২) সুরা জুমার, আয়াত: ২৮

(৩) সুরা জুখরুফ, আয়াত: ৩

تعلموا العربية فإنها من دينكم অর্থাৎ, তোমরা আরবি ভাষা শিখ, কেননা তা তোমাদের দীনেরই অংশ।[১]

এটা অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে, আমাদের দেশে দিন দিন আরবি ভাষার চর্চা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আরবি ভাষার চর্চা আরো অধিক পরিমাণ হওয়া প্রয়োজন। আমাদের দেশে এমন এক ঝাঁক আরবি ভাষার রিজাল তৈরি হওয়া দরকার যারা কুরআন সুন্নাহর ভাষার জন্য জীবনকে ওয়াকফ করে দিবেন। আরবি ভাষায় গভীর জ্ঞান অর্জন করবেন। এই শাস্ত্রে ইখতিসাস অর্জন করবেন। আমাদের উপমহাদেশের আকাবির ও আসলাফের রেখে যাওয়া ইলমি আমানতকে আরবি ভাষায় রূপান্তর করে আরব বিশ্বে ছড়িয়ে দিবেন। বিভিন্ন শাস্ত্রে আরবি ভাষায় ইলমি কাজ করবেন। যোগ্য যোগ্য তালিবে ইলম তৈরি করবেন। আরব দেশগুলোতে দীনি দাওয়াতি কাজ করবেন। মহান রব্বুল আলামিনের নিকট ফরিয়াদ, অধম বান্দাকে যেন সেই ভাগ্যবান রিজালুল আরাবিয়্যাহর কাতারে শামিল করেন। আমিন।

আমার মতো ক্ষুদ্র একজন তালিবে ইলমের হৃদয়ে একটি ব্যথা আছে। সেই ব্যথার কথা আজকে আমার প্রিয় পাঠক বন্ধুদের নিকট বলতে ইচ্ছে করছে। আমাদের দেশের তালিবুল ইলম ভাইয়েরা বহু কষ্ট করে বছরের পর বছর ইলম চর্চায় নিমগ্ন থাকে। দূরদূরান্ত থেকে মা-বাবা, আত্মীয়স্বজন সবার মায়া ত্যাগ করে ছুটে আসে ইলমি কাননে ইলমে দীন শেখার আগ্রহে। সবাই আসে বড়ো স্বপ্ন নিয়ে। মা-বাবা অনেক আশা নিয়ে সন্তানকে পাঠান ইলমের বাগানে। কিন্তু আফসোসের বিষয় হলো, শৈশবে মক্তবে ভর্তি হওয়া অসংখ্য নিষ্পাপ শিশুদের মধ্যে ক'জনেই বা পারে গন্তব্যে পৌঁছতে? সবাইকে তো আলিম হওয়ার জন্য, হামিলে ইলমে ওহি হওয়ার জন্য আসে। কিন্তু কেন সবাই দাওরায়ে হাদিস পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না? কেন তারা মাদরাসার নুরানি পরিবেশ থেকে বিদায় নিয়ে অন্য কোনো পরিবেশে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে? এই ব্যাথাতুর প্রশ্নের উত্তর অনেক কিছু হতে পারে। আমি ক্ষুদ্র তালিবে ইলমের মতে সেই সব কারণগুলোর মধ্যে অন্যতম কারণ হলো, কিতাব না বুঝা। নাহু-সরফের ভীতি, আরবি ইবারত সহিহভাবে পড়া ও অনুধাবনের অক্ষমতা।

---

(১) ইকতিদউস সিরাতিল মুসতাকিম লি মুখালাফাতি আসহাবিল জাহিম: ইবনে তাইমিয়া রহ., ড. নাসির বিন আবদুল কারিম এর তাহকিক ও তালিককৃত, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৪৭০, মাকতাবাতুর রশিদ, রিয়াদ, সৌদি আরব।

সেই আশা পূরণ করেছেন। এজন্য আমি আল্লাহর দরবারে আবার শুকরিয়া আদায় করছি আলহামদুলিল্লাহ।

নিঃসন্দেহে আরবি ভাষা হলো পৃথিবীর সবচেয়ে শ্রেষ্ঠতম ভাষা। কেননা তা পবিত্র কুরআনে কারিম ও হাদিস শরিফের ভাষা। একজন মানুষ যেই ফনেই মাহির বা দক্ষ হতে চায়, তাকে সর্বপ্রথম আরবি ভাষার গভীর জ্ঞান অর্জন করতে হয়। কারণ কুরআন, হাদিস, তাফসির, ফিকহ-ফাতাওয়া, নাহু, সরফ ইত্যাদি ফনের অধিকাংশ কিতাবগুলোই হলো আরবি ভাষায় লিখিত। তাছাড়া পবিত্র কুরআনে কারিম যেহেতু আরবি ভাষায়ই অবতীর্ণ, তাই আরবি ভাষাজ্ঞান অর্জন করা ব্যতীত কুরআনে কারিম গভীরভাবে অনুধাবন করা সম্ভব নয়। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون (يوسف: ٢)

অর্থ: আমি একে আরবি ভাষায় কুরআনরূপে অবতীর্ণ করেছি, যাতে তোমরা বুঝতে পার।[১]

অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে–

قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون (الزمر: ٢٨)

অর্থ: এটা আরবি কুরআন, নয় বক্রতাপূর্ণ, যাতে মানুষ তাকওয়া অবলম্বন করে।[২]

আরো বর্ণিত হয়েছে–

إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون (الزخرف:٣)

অর্থ: আমি একে বানিয়েছি আরবি কুরআন, যাতে তোমরা বুঝতে পার।[৩]

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ. এর 'ইকতিদউস সিরাতিল মুসতাকিম লি মুখালাফাতি আসহাবিল জাহিম' কিতাবের ৪নং খণ্ডের ৪৭০ নং পৃষ্ঠায় আমিরুল মুমিনিন হজরত উমর ইবনুল খাত্তাব রা. এর একটি উক্তি বর্ণিত আছে–

---

(১) সুরা ইউসুফ, আয়াত: ২

(২) সুরা জুমার, আয়াত: ২৮

(৩) সুরা জুখরুফ, আয়াত: ৩

تعلموا العربية فإنها من دينكم অর্থাৎ, তোমরা আরবি ভাষা শিখ, কেননা তা তোমাদের দীনেরই অংশ।[১]

এটা অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে, আমাদের দেশে দিন দিন আরবি ভাষার চর্চা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আরবি ভাষার চর্চা আরো অধিক পরিমাণ হওয়া প্রয়োজন। আমাদের দেশে এমন এক ঝাঁক আরবি ভাষার রিজাল তৈরি হওয়া দরকার যারা কুরআন সুন্নাহর ভাষার জন্য জীবনকে ওয়াকফ করে দিবেন। আরবি ভাষায় গভীর জ্ঞান অর্জন করবেন। এই শাস্ত্রে ইখতিসাস অর্জন করবেন। আমাদের উপমহাদেশের আকাবির ও আসলাফের রেখে যাওয়া ইলমি আমানতকে আরবি ভাষায় রূপান্তর করে আরব বিশ্বে ছড়িয়ে দিবেন। বিভিন্ন শাস্ত্রে আরবি ভাষায় ইলমি কাজ করবেন। যোগ্য যোগ্য তালিবে ইলম তৈরি করবেন। আরব দেশগুলোতে দীনি দাওয়াতি কাজ করবেন। মহান রব্বুল আলামিনের নিকট ফরিয়াদ, অধম বান্দাকে যেন সেই ভাগ্যবান রিজালুল আরাবিয়্যাহর কাতারে শামিল করেন। আমিন।

আমার মতো ক্ষুদ্র একজন তালিবে ইলমের হৃদয়ে একটি ব্যথা আছে। সেই ব্যথার কথা আজকে আমার প্রিয় পাঠক বন্ধুদের নিকট বলতে ইচ্ছে করছে। আমাদের দেশের তালিবুল ইলম ভাইয়েরা বহু কষ্ট করে বছরের পর বছর ইলম চর্চায় নিমগ্ন থাকে। দূরদূরান্ত থেকে মা-বাবা, আত্মীয়স্বজন সবার মায়া ত্যাগ করে ছুটে আসে ইলমি কাননে ইলমে দীন শেখার আগ্রহে। সবাই আসে বড়ো স্বপ্ন নিয়ে। মা-বাবা অনেক আশা নিয়ে সন্তানকে পাঠান ইলমের বাগানে। কিন্তু আফসোসের বিষয় হলো, শৈশবে মক্তবে ভর্তি হওয়া অসংখ্য নিষ্পাপ শিশুদের মধ্যে ক'জনেই বা পারে গন্তব্যে পৌঁছতে? সবাইকে তো আলিম হওয়ার জন্য, হামিলে ইলমে ওহি হওয়ার জন্য আসে। কিন্তু কেন সবাই দাওরায়ে হাদিস পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না? কেন তারা মাদরাসার নুরানি পরিবেশ থেকে বিদায় নিয়ে অন্য কোনো পরিবেশে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে? এই ব্যাথাতুর প্রশ্নের উত্তর অনেক কিছু হতে পারে। আমি ক্ষুদ্র তালিবে ইলমের মতে সেই সব কারণগুলোর মধ্যে অন্যতম কারণ হলো, কিতাব না বুঝা। নাহু-সরফের ভীতি, আরবি ইবারত সহিহভাবে পড়া ও অনুধাবনের অক্ষমতা।

---

(১) ইকতিদউস সিরাতিল মুসতাকিম লি মুখালাফাতি আসহাবিল জাহিম: ইবনে তাইমিয়া রহ., ড. নাসির বিন আবদুল কারিম এর তাহকিক ও তালিককৃত, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৪৭০, মাকতাবাতুর রশিদ, রিয়াদ, সৌদি আরব।

আরবি ভাষা কি কঠিন কোনো বিষয়? নাহু-সরফ তথা আরবি ব্যাকরণ কি এমন কোনো শাস্ত্র, যার নাম শুনলে অন্তরে ভীতির সঞ্চার হবে? আমার তো মনে হয়, একজন ছাত্র যত দুর্বলই হোক, আরবি ভাষা ও নাহু-সরফের কিতাবগুলো যদি সে সহিহ পদ্ধতিতে পড়ে তাহলে মাত্র দুই/তিন বছরের মধ্যেই এই স্তরের যোগ্যতা অর্জন হওয়া সম্ভব যে, যেকোনো আরবি কিতাবের ইবারত নিজে নিজে সহিহভাবে পড়তে ও বুঝতে পারবে এবং আরবি ভাষায় সাবলীলভাবে বলা ও লেখার মাধ্যমে মনের ভাব প্রকাশ করতে সক্ষম হবে ইনশাআল্লাহ। হ্যাঁ, কোনো শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য ও ইখতিসাস এবং ফন্নি ইসতিদাদ, রুসুখ ফিল ইলম, তাফাক্কুহ ফিদ দীন অর্জন করার জন্য তো আজীবন মেহনত ও সাধনা করে যেতে হবে।

তিন চার বছরের একটি শিশু কেবল চারপাশের মানুষদের মুখে শুনে শুনে মাতৃভাষা আয়ত্ব করে ফেলে। ফলে সে সহিহভাবে মনের ভাব ব্যক্ত করতে পারে এবং অন্যের জবানের ভাষাও বুঝতে পারে। এতটুকু জ্ঞান অর্জন করার জন্য তাকে কোনো বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে হয় না। বাংলাভাষায় লিখিত কোনো বই-পত্র পড়তে হয় না। ব্যাকরণ পড়তে হয় না। এজন্য তাকে কোনো শ্রম ব্যয় করতে হয় না। কোনো প্রকার কষ্ট পোহাতে হয় না। শুধুমাত্র আল্লাহ প্রদত্ত শ্রবণ শক্তির মাধ্যমে মনের অজান্তেই হাসি-আনন্দের মাঝে শত শত শব্দ তার হৃদয়পটে বসে যায়। অসংখ্য বাক্যের ব্যবহার তার আত্মস্থ হয়ে যায়। ইসম, ফেয়েল, হর্‌ফ, ফায়েল, মাফাইলে খমসাহ, মুজাফ-মুজাফ ইলাইহি, মুবতাদা-খবর, ইসমে ইশারা-মুশারুন ইলাইহি, নিদা-মুনাদা ইত্যাদির ব্যবহার একটি শিশু শিখে ফেলে। হয়তো শিশুটি নিজে নিজে জামা-প্যান্টও ঠিক করে পরতে পারে না, জুতাজোড়াও সোজা করে পড়তে পারে না; কিন্তু একটি ভাষা কোনো প্রকার মেহনত ব্যতীত সে আয়ত্ব করে ফেলে।

তাহলে কী বোঝা গেল! একটি শিশুর নিকট নিজে নিজে জামা প্যান্ট পরা কঠিন হলেও ভাষা আয়ত্ব করা কঠিন নয়, অনেক সহজ। আরবি ভাষাও কঠিন কোনো বিষয় নয়; বরং খুবই সহজ। আমরা চাইলেই তা অতি সহজেই আয়ত্ব করতে পারি। এর জন্য জরুরি হলো, আরবি ভাষার প্রতি ভালোবাসা ও তা শেখার প্রতি অদম্য স্পৃহা এবং আরবি ভাষার কিতাবগুলোকে যথাযথ পদ্ধতিতে পাঠ করা।

পৃথিবীর যেকোনো ভাষার মতো আরবি ভাষার ক্ষেত্রে চারটি দক্ষতা রয়েছে। সেগুলো হলো- ১. মাহারতুল কিরাআহ তথা পঠন দক্ষতা। ২. মাহারতুল কিতাবাহ তথা লিখন দক্ষতা। ৩. মাহারতুল কালাম তথা কথন দক্ষতা। ৪. মাহরতুস সামা তথা শ্রবণ দক্ষতা। 'আরবি ভাষা ও সাহিত্য শেখার কলাকৌশল' নামক এই বইটিতে আরবি ভাষার চার দক্ষতা অর্জনের সহিহ ও আদর্শ পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। প্রতিটি আলোচনার সাথে জীবন্ত উদাহরণ ও প্রায়োগিক নমুনা উল্লেখ করে বিষয়বস্তু অত্যন্ত পরিষ্কার করে তুলে ধরা হয়েছে।

আমার এই কিতাবটি পড়ার দ্বারা যদি কোনো তালিবে ইলমের হৃদয়ে আরবি ভাষার প্রতি ভালোবাসা ও আগ্রহ বৃদ্ধি পায়; তা শেখার জন্য হিম্মত পায় এবং আরবি ভাষা শেখার ক্ষেত্রে উপকৃত হয় তাহলে আমার এ শ্রম-সাধনা সার্থক ইনশাআল্লাহ।

কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি আমার প্রাণপ্রিয় উসতাদে মুহতারাম জামিয়া রাহমানিয়া আজিজিয়ার প্রধান মুফতি ও সিনিয়র মুহাদ্দিস বরেণ্য লেখক আল্লামা মুফতি হিফজুর রহমান হাফিজাহুল্লাহ-কে। হুজুর আমার এ কিতাবটিকে ধন্য করেছেন তাঁর মূল্যবান একটি বাণী দিয়ে। হুজুরের কাছে কিতাবটির পাণ্ডুলিপি নিয়ে হাজির হয়েছিলাম। হুজুর বেশ সময় নিয়ে পাণ্ডুলিপিটি দেখেছেন। অনেক খুশি প্রকাশ করেছেন। দিকনির্দেশনা প্রদান করেছেন। আমার জন্য অনেক দুআ করেছেন। জামিয়া রাহমানিয়ায় পড়াকালীন মাঝে মাঝে আসরের পর হুজুরের কামরায় যেতাম। হুজুর আমাকে খুব স্নেহ করতেন। পড়ালেখা সংক্রান্ত মূল্যবান নসিহত করতেন। হুজুরকে দেখলে আমার মধ্যে ইলমের প্রতি ভালোবাসা আরো বৃদ্ধি পেত। নতুনভাবে যেন উদ্যমতা ফিরে পেতাম। আমার কচিমনে বারবার উঁকি দিত, এই বৃদ্ধ বয়সে হুজুর এত মেহনত পরিশ্রম কীভাবে করেন? এত শক্তি, এত উদ্যমতা কোথায় পান?! আসলে যাঁরা আল্লাহওয়ালা ইলম ও আমলের ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে এক রুহানি শক্তি দান করেন। আল্লাহ তাআলা হুজুরকে সিহহত ও আফিয়াতের সাথে দীর্ঘ নেক হায়াত দান করুন। হুজুরের ইলমি কাজগুলো দ্বারা আমাদের উপকৃত হওয়ার তাওফিক দান করুন। আমিন।

মানুষ ভুলের উর্ধ্বে নয়। বক্ষমাণ গ্রন্থটি নির্ভুল করার জন্য যথেষ্ঠ মেহনত পরিশ্রম করা হয়েছে। এরপরও ভুল-ত্রুটি থাকাটা অস্বাভাবিক নয়। যদি কারো

কোনো ভুল-ত্রুটি দৃষ্টিগোচর হয় আমাদের অবগত করার অনুরোধ রইল। পরবর্তী সংস্করণে পরিমার্জন করা হবে ইনশাআল্লাহ।

দয়াময় রবের নিকট প্রার্থনা, তিনি যেন এই কিতাবটিকে কবুল করেন। কিতাবটিকে উপকারী বানান। এর লেখক, পাঠক, প্রকাশকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে কবুল করুন। আমিন ইয়া রব্বাল আলামিন।

وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد -فداه أبي وأمي- وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين.

বিনীত

মুহাম্মাদ আবদুল আউয়াল

২১ অক্টোবর ২০২২ঈ.

রবিবার দিবাগত রাত ১ টা ৩৪ মিনিট



সূচিপত্র

المهارات اللغوية

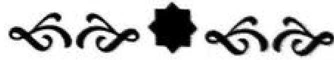
ভাষা দক্ষতা

পৃথিবীর অন্য সকল ভাষা যেমন: আরবি, বাংলা, ইংরেজি, উর্দু, ফারসি, হিন্দি ইত্যাদির মতো আরবি ভাষাও যথাযথভাবে আয়ত্ব করতে ও তাতে বুৎপত্তি অর্জন করতে হলে চারটি দক্ষতা অর্জন করা আবশ্যক। সেগুলো হলো-

- مهارة القراءة তথা পঠন দক্ষতা।
- مهارة الكتابة তথা লিখন দক্ষতা।
- مهارة الكلام তথা কথন দক্ষতা।
- مهارة السماع তথা শ্রবণ দক্ষতা।

কোনো ভাষার এই চারটি দক্ষতা অর্জন হলে ঐ ভাষা পরিপূর্ণরূপে অর্জিত হয়। এগুলোকে 'ভাষাকলা'ও বলা হয়। এই চার দক্ষতার কোনোটিই পৃথকভাবে পূর্ণাঙ্গ নয়। প্রত্যেকটিই একে অপরের পরিপূরক। এখন উপরোক্ত চার দক্ষতা অর্জনের পদ্ধতি সম্পর্কে চারটি অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

প্রথম অধ্যায়



مهارة القراءة/ পঠন দক্ষতা

পাঠের প্রয়োজনীয়তা

ইলম বা জ্ঞান অন্বেষণের যত মাধ্যম বিদ্যমান রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হলো পাঠ। মানুষ বই পুস্তক পাঠ করেই জ্ঞানী হয়। যে যেই ফন বা শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করতে চায় তাকে ওই শাস্ত্রে প্রচুর পরিমাণ বই পুস্তক পাঠ করতে হয়। যেমন, কেউ যদি ডাক্তার হতে চায় তাহলে তাকে দক্ষ চিকিৎসকের সাহচর্য অর্জনের পাশাপাশি চিকিৎসা বিষয়ে লিখিত বই পুস্তক

অধিক পাঠ করতে হবে। অথবা কেউ যদি ইঞ্জিনিয়ার হতে চায় তাহলে তার জন্য ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে লিখিত বই পুস্তক অধ্যয়নে মনোনিবেশ জরুরি। আবার কেউ যদি কবি হতে চায় তাহলে তাকে বরেণ্য আদর্শ কবিদের কবিতা পাঠে মন দিতে হবে।

অনুরূপ কেউ যদি তাফসির ও হাদিস শাস্ত্রে বুৎপত্তি অর্জন করতে চায় তাহলে তার জন্য তাফসির ও হাদিস সংক্রান্ত লিখিত কিতাবাদি প্রচুর পরিমাণ অধ্যয়ন করা আবশ্যক। আবার যে ব্যক্তি নাহু সরফের জ্ঞান অর্জন করতে চায় তার জন্য নাহু-সরফ সংক্রান্ত লিখিত কিতাবাদি ব্যাপক অধ্যয়নের বিকল্প নেই। মোট কথা, যে বিষয়েই দক্ষ হতে চায় তাকে ওই বিষয়ে লিখিত কিতাবাদি পাঠ করা অতীব জরুরি।

পাঠের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

ধারাবাহিক শিক্ষা ও আজীবন জ্ঞানার্জন মানুষের জন্য তখনই নিশ্চিত হয় যখন সে পড়তে সক্ষম হয়। সুতরাং পড়ার জন্য কিছু লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য রয়েছে যা নিম্নরূপঃ

- ব্যাপক শিক্ষার জন্য ব্যাপক পড়াশোনা করা আবশ্যক। অন্য যেকোনো উপায়ে মানুষ যা অর্জন করে তার চেয়ে বেশি অর্জন করে পাঠের মাধ্যমে।
- পড়ার মাধ্যমে পাঠক শিক্ষার কার্যকর উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত করতে পারে। চাই সে উদ্দেশ্য ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বা শিক্ষা বিষয়ক হোক।
- পঠন এমন এক দক্ষতা যার মাধ্যমে পাঠক উপভোগের পরিমাণ নিশ্চিত করতে পারে এবং অবসর সময়কে অতিবাহিত করতে পারে।
- পাঠ এমন এক দক্ষতা যার ওপর ভিত্তি করে একজন শিক্ষার্থী প্রাতিষ্ঠানিক পড়ালেখা সমাপ্তির পর একা একাই নিজের উন্নতি ঘটাতে পারে। পাঠ ধারাবাহিক শিক্ষা ও আজীবন জ্ঞানার্জনের উপায়।
- পাঠের গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হলো, শব্দাবলি, বাক্যাবলি, অনুচ্ছেদসমূহের বিশুদ্ধ উচ্চারণ এবং উত্তমভাবে আদায় করা ও বর্ণের মাখরাজ আদায় করে অর্থের প্রকাশ ও বাক্যাবলির মর্ম উপলব্ধি করা।

নিয়ে আসে এবং তা পড়তে থাকে। এর পরিণাম সাধারণত কল্যাণময় হয় না। অনেক ক্ষেত্রে লাভের চেয়ে ক্ষতিই বেশি হয়ে থাকে এবং আশ্চর্যের বিষয় হলো, এই স্বাধীন অধ্যয়নে শিক্ষার্থীদের ক্ষতি হচ্ছে তা সে নিজেও উপলব্ধি করতে পারছে না।

আবার অনেক সময় এমনও হয় যে, শিক্ষার্থী তার তালিমি মুরুব্বির পরামর্শ ব্যতীত নিজের ইচ্ছে মতো ভালো কিতাবই নির্বাচন করে অধ্যয়ন করতে থাকে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে এই অধ্যয়নে ক্ষতির কোনো দিক দৃষ্টিগোচর না হলেও তাতে ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে। অন্তত অধিক উপকার হতে বঞ্চিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে নিশ্চয়।

কারণ, শিক্ষার্থী হয়তো ভাবছে, এই কিতাবটি তার জন্য উপকারী। কিন্তু বাস্তবে তার ব্যতিক্রমও হতে পারে। বরং তার জন্য এখন এই কিতাব না পড়ে অন্য কোনো কিতাব পড়া আরো অধিক ফায়দাজনক হতে পারে। আর এটা নিশ্চয় শিক্ষার্থীর চেয়ে শিক্ষক বেশি ভালো বুঝবেন। তাই অন্তত ছাত্রজীবনে স্বাধীন অধ্যয়ন পরিহার করে তালিমি মুরুব্বির পরামর্শক্রমে অধ্যয়ন করা উচিত।

সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নাদাবী রহ. বলেন, “দরদী বন্ধুর সাবধানবাণী মনে রাখুন! অধ্যয়ন হলো দু’ধারী তরবারী। তা সঠিক ব্যবহার না হলে সর্বনাশের কারণও হতে পারে। এটা ইলমি যিন্দেগির এক পুলছিরাত যা অত্যন্ত সতর্কতার সাথে পার হতে হবে এবং আগের যাত্রীদের নিকট থেকে আলো নিতে হবে। নতুবা অতল গহ্বরে পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থেকেই যাবে। তাই আসাতিযায়ে কেরামের পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা গ্রহণ করুন। সময় কম কাজ বেশি এবং অনেক বেশি, পড়ার বিষয়ও দিন দিন বেড়েই চলেছে। ছাপাখানা বন্যার মত গ্রন্থ প্রকাশ করে চলেছে। কিন্তু ছাপা কাগজ মাত্রই পড়ারযোগ্য নয় এবং যে কোনো বই ও পত্রিকা আপনার পড়ার টেবিলে আসার উপযুক্ত নয়।”

বাইরের কোনো নাপাকি যেমন ভিতরে আনা যায় না, তেমনি আমাদের টেবিলে এমন কোনো বই-পত্রও রাখা উচিত নয় যা নাপাকির চেয়েও অধিক ক্ষতিকর ও দূর্গন্ধ ছড়ায় এবং ঘরের পবিত্রতা নষ্ট করে। আমাদের টেবিল এক পবিত্র শিক্ষাঙ্গনের টেবিল, এক উচ্চ গবেষণাগারের টেবিল, তা শোধন করা হয়। এখানে পাঠাগারের আলমারীতে এবং পড়ার টেবিলে এমন কোনো বই

এছাড়াও পাঠের আরোও কিছু লক্ষ্য আছে তা নিম্নরূপ-

গবেষণার জন্য পঠন

মানুষ কখনো পাঠ করে নির্দিষ্ট কোনো বিষয়ে গবেষণা করার জন্য। কারণ কোনো বিষয়ে গবেষণা করার জন্য গভীর অধ্যয়নের বিকল্প নেই।

সংক্ষেপ করতে পঠন

মানুষ কখনো মূল পাঠের উদ্ধৃতিকে সংক্ষেপ করার জন্য পাঠ করে। এ ক্ষেত্রে তার পড়া সতর্ক, সূক্ষ্ম ও ব্যাপক আকারে হবে। কারণ পাঠক তা হতে মৌলিক চিন্তাকে আবিষ্কার করতে চায় এবং গুরুত্বহীন অনর্থক বিশ্লেষণ থেকে দূরে থাকতে চায়।

পরীক্ষার জন্য পঠন

মানুষ কখনো যেকোনো পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য পড়াশোনা করে। এক্ষেত্রে তার পাঠ সূক্ষ্ম ও সতর্কতামূলক হয়। পাঠক তখন পাঠকে মুখস্ত ও আয়ত্ত করার জন্য বারবার পড়তে বাধ্য হয়।

বিনোদনের জন্য পড়া

কখনো কখনো মানুষ বিনোদন ও সময় কাটানোর জন্য বই পড়ে। এই অবস্থায় সে সচরাচর এককেন্দ্রিক পড়া পড়ে না, বরং সে এক লাইন থেকে অন্য লাইনে, এক পৃষ্ঠা থেকে অন্য পৃষ্ঠায় অতিক্রম করে।[১]

পড়ার জন্য কিতাব নির্বাচনে শিক্ষকের পরামর্শ জরুরি

যে কোন কিতাবের অধ্যয়ন অবশ্যই তালিমি মুরুব্বি বা কোনো শিক্ষকের পরামর্শক্রমে হওয়া আবশ্যক। কারণ, কিতাব পড়ার মাঝে দুধারী তরবারীর মতো লাভের যেমন সম্ভাবনা আছে, তদ্রূপ ক্ষতিরও আশঙ্কা আছে। স্বাধীন অধ্যয়ন অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ একটি বিষয়। বিশেষ করে কচি বয়সে, যখন শেখা ও প্রভাবিত হওয়ার বয়স। অনেক শিক্ষার্থী তালিমি মুরুব্বি বা কোনো শিক্ষকের পরামর্শ গ্রহণ ব্যতীত লাইব্রেরীতে গিয়ে মনমতো কিতাব ক্রয় করে

(১) আরবি ভাষায় দক্ষতা ও শিক্ষাদান পদ্ধতি, প্রফেসর ড. মোহাম্মদ ইউসুফ, পৃষ্ঠা: ১১৬-১১৭

থাকার অধিকার নেই, যার দুর্গন্ধ পরিবেশকে দূষিত করে। যা একবার পড়ার পর মানুষ দিনের পর দিন চিত্ত-বিক্ষেপের শিকার হয়ে পড়ে। অবশ্য এজন্য নিয়ম, নিয়ন্ত্রণ ও শাসনের প্রয়োজন নেই। সুস্থ বিবেকই যথেষ্ট।

কিতাব পড়ার উদ্দেশ্য

আমরা কম বেশি সবাই কিতাব পড়ি। কিন্তু আমরা কি জানি কিতাব পড়ার উদ্দেশ্য কী? এ সম্পর্কে মাওলানা আবু তাহের মিছবাহ হাফিজাহুল্লাহ এর ভাষায় এতটুকু বলাই যথেষ্ট– "কিতাব বা বই পড়ার দুটি উদ্দেশ্য: 'জ্ঞান ও তথ্য গ্রহণ এবং ভাষা ও সাহিত্য আহরণ'। বিষয়বস্তু ও তথ্যগত জ্ঞান লাভের জন্য যে কোনো কিতাব বা বই পড়া যেতে পারে। ভাষা ও সাহিত্যমান যেমনই হোক। তবে তা থেকে শব্দ ও ভাষা গ্রহণ করা যাবে না। ভাষা ও সাহিত্য শেখার জন্য বরণীয় লেখক-সাহিত্যিকদের বই পড়তে হবে। সাধারণ লেখকদের কাঁচা হাতের বাজে লেখা একদম পড়া যাবে না। তাহলে লেখার দোষ-ত্রুটি শিক্ষার্থীর লেখাতেও আছর করবে।"[১]

আরবি ভাষার প্রাথমিক শিক্ষা

আরবি ভাষার প্রাথমিক শিক্ষা মূলত মকতব থেকেই শুরু হয়। আরবি হরফ পরিচিতি, শব্দ-বাক্য পাঠ, বিশুদ্ধ উচ্চারণ ও আরবি হস্তলিপি এগুলো আরবি ভাষার একদম প্রাথমিক স্তরের জ্ঞান। যা কুরআন-হাদিসের নিসবতে মুমিন হিসেবে প্রত্যেকের শেখা আবশ্যক। আর এগুলোর চর্চা মকতবেই হয়ে থাকে। একজন শিক্ষার্থীর আরবি ভাষার এই প্রাথমিক স্তরটি অর্জিত হওয়ার পরই শুরু হয় আরবি ভাষা বোঝার স্তর। আরবি ভাষা শেখা বলতে এই দ্বিতীয় স্তরকেই বোঝানো হয়।

আরবি ভাষা শেখার প্রথম ধাপ

বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষার দুটি নেসাব রয়েছে। একটি হলো দরসে নেজামি। ভারত উপমহাদেশের অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দরসে নেজামির অনুসরণ করা হয়। অপরটি হল মাদানী নেসাব; যার প্রতিষ্ঠাতা হলেন বাংলাদেশের ইলমের আকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্র, আরবি ও বাংলা সাহিত্যের ময়দানের সেনাপতি, ইলমের বাগানের দরদী মালী মাওলানা আবু তাহের

(১) আরবি ভাষা পাঠদান পদ্ধতি, মাওলানা সফিউল্লাহ ফুআদ হাফিজাহুল্লাহ।

মিছবাহ হাফিজাহুল্লাহ। যা হোক, উভয় নেসাবেই আরবি ভাষা শেখার প্রথম ধাপ শুরু হয় দুটি কিতাবের পাঠদানের মাধ্যমে। একটি হলো, 'এসো আরবি শিখি'[১]। অপরটি হলো, 'আত তামরিনুল কিতাবী আলাত তরিক ইলাল আরাবিয়্যাহ'। উভয় কিতাবের লেখক হলেন, মাওলানা আবু তাহের মিছবাহ।

প্রাথমিক পর্যায়ে আরবি ভাষা শেখার ক্ষেত্রে 'এসো আরবি শিখি' ও 'আততামরিনুল কিতাবী'র সীমাহীন ভূমিকা ও কতটা কল্যাণকর তা কারো অজানা নয়। আরবি ভাষা ও সাহিত্যের উজ্জ্বল তারকা বিশিষ্ট আরবি সাহিত্যিক মাওলানা সফিউল্লাহ ফুআদ হাফিজাহুল্লাহ বলেন, "মাওলানা আবু তাহের মিছবাহ হাফিজাহুল্লাহ প্রণিত 'এসো আরবি শিখি' একটি ইলহামি কিতাব।"

সত্যিই, এটি আরবি ভাষা শেখার ক্ষেত্রে অত্যন্ত চমৎকার ও উপকারী কিতাব।

'এসো আরবি শিখি' কিতাবটি কীভাবে পড়ব?

আরবি ভাষা শেখার ক্ষেত্রে 'এসো আরবি শিখি' কিতাবটি অনন্য ও অত্যন্ত কার্যকরী। তা থেকে পরিপূর্ণ ফায়দা লাভ করতে হলে নির্দিষ্ট কিছু পন্থা অবলম্বনের মাধ্যমেই কিতাবটি পড়তে হবে। নতুবা গতানুগিতকভাবে পড়ে কিতাব সমাপ্ত করলেও কাঙ্খিত ফায়দা অর্জিত হবে না। এমন বহু তালিবে ইলম আছে যাদের অভিযোগ হলো, "আমি তো 'এসো আরবি শিখি' কিতাব পড়েছি, 'আততামরিনুল কিতাবী' কিতাব পড়েছি। এমনকি আরবি ভাষার মাধ্যমিক ও উঁচু স্তরের কিতাবও পড়েছি। কিন্তু এখনো আমি অনেক আরবি ইবারত বুঝি না। অনুবাদ করতে পারি না। দরসের বাইরে কোনো কিতাব সামনে আসলে তা পড়তে ও বুঝতে সক্ষম হই না। সহজ কোনো বাংলারও আরবি করতে না পারি। আরবিতে কোনো বিষয়ে সাধারণ একটি মাকালা বা প্রবন্ধ লিখতে পারি না। পরীক্ষায় প্রশ্নের উত্তর আরবিতে লিখতে পারি না।"

---

(১) "এসো আরবি শিখি" কিতাবটি ইলহামি কিতাব। কিতাবটির মুসান্নিফ হজরত মাওলানা আবু তাহের মিছবাহ হাফিজাহুল্লাহ মুয়াফ্‌ফাক মিনাল্লাহ। আরবি ভাষা শেখার জন্য কিতাবটি অত্যন্ত উপকারী। সারা দেশে দরসে নেজামি ও মাদানি নেসাবসহ প্রায় সকল কওমী মাদরাসায় কিতাবটি সিলেবাসভূক্ত। মূলত কিতাবটি আদীব হুজুরের জীবনের দীর্ঘ সাধনার ফসল। খুব সহজে আরবি ভাষা শেখার আদর্শ একটি কিতাব এটি। আল্লাহ তাআলা আদীব হুজুরকে দীর্ঘ নেক হায়াত দান করুন। আমিন।

এগুলো শুধু দুর্বল ছাত্রদের অভিযোগ ব্যাপারটি তেমন নয়, বরং অনেক মেধাবী ছাত্রদেরও একই অভিযোগ। এর মূল কারণ হলো, আরবি ভাষার বিভিন্ন স্তরের কিতাব পড়া হয় বটে, তবে তা যথাযথ নিয়মে হয় না। যথাযথ পন্থায় আরবি ভাষার কিতাব পাঠ না করলে এমন অভিযোগ কখনোই শেষ হবে না।

তাই নিম্নে কয়েকটি পদ্ধতি উল্লেখ করা হলো; কাঙ্খিত ফায়দা অর্জন করতে চাইলে সেগুলো অনুসরণ করেই শিক্ষাবর্ষের শুরু থেকে 'এসো আরবি শিখি' কিতাবটি পড়তে হবে-

- সর্বপ্রথম কুরআন ও হাদিসের ভাষা তথা আরবি ভাষার প্রতি মহব্বত, ভালোবাসা ও আগ্রহ, উদ্দীপনা লালন করা।

- দরসে বসার পূর্বে মুতালাআ করে আসা, দরসে মনোযোগ সহকারে উসতাদের কথা শ্রবণ করা এবং দরস শেষে সহপাঠীর সঙ্গে মুজাকারা ও তাকরার করা।

- প্রাথমিক পর্যায়ে এই কিতাব পড়ার ক্ষেত্রে নাহু-সরফের কাওয়ায়িদ না পড়া; বরং কাওয়ায়িদ না পড়ে শুধু উসতাদের অনুসরণ করে পড়া ও শেখা।

- প্রতিটি দরসের মুফরাদাত বা শব্দার্থগুলো খুব ভালোভাবে মুখস্থ, ঠোঁটস্থ, কণ্ঠস্থ ও আত্মস্থ করা।

- শব্দার্থ মুখস্থ করার পর বাংলা থেকে আরবি, আরবি থেকে বাংলা; উভয় পদ্ধতিতে তামরিন করা। প্রথম পদ্ধতিতে তুলনামূলক বেশী তামরিন করা চাই। কেননা আরবি থেকে বাংলা কিছুটা সহজ হলেও বাংলা থেকে আরবি তুলনামূলক একটু কঠিন। অনুরূপভাবে জুমলা বা বাক্যের তামরিনও এভাবে করা।

- প্রত্যেক দরসের মৌলিক জুমলা বা বাক্যের কাঠামো দিয়ে পর্যাপ্ত তামরিন করা। উসতাদের তত্ত্বাবধানে ৩/৪ জন করে তামরিনের গ্রুপ বানিয়ে নিতে হবে। তারপর গ্রুপের প্রত্যেক তালিবে ইলম তামরিন করাবে। একজন আরবি বলবে, আর বাকি সবাই বাংলা বলবে। আবার

সে বাংলা বলবে, আর বাকি সবাই আরবি বলবে। এভাবে গ্রুপের প্রত্যেক তালিবে ইলমই তামরিন করাবে। যেন সবাই পারে। কেউ যেন দুর্বল না থাকে। কেননা যারা তামরিন ও তাকরার করে তারাই বেশী উপকৃত হয়। অন্যরা দুর্বল থেকে যায়।

- এভাবে একটি বাক্যের কাঠামো শেষ হলে আরেকটি কাঠামো শুরু করতে হবে। কিছুক্ষণ পর পেছনের পঠিত কাঠামোগুলোকে পুনরায় তামরিনে নিয়ে আসতে হবে। এতে পেছনের পড়াগুলোও মনে থাকবে। এভাবে কিতাবের বাইরের আরো ১০/১২টি বাক্য নিজ থেকে বানিয়ে তামরিন করবে।

- জুমলার একেকটা নতুন কাঠামো দিয়ে তামরিন করার পাশাপাশি ঐ কাঠামো দিয়ে নতুন শব্দযোগে ১০/১৫টি করে জুমলা লিখতে হবে। এতে ওই বাক্যের কাঠামোর ছবি হৃদয়ে গেঁথে যাবে ইনশাআল্লাহ।

- যে কোনো নতুন কাঠামো দিয়ে কিছুক্ষণ তামরিন করার পর সর্বশেষ মুখস্থকৃত নতুন শব্দযোগে তামরিন করতে হবে। এতে তামরিনও হয়ে যাবে এবং নতুন শব্দগুলোও ভালভাবে মুখস্থ হয়ে যাবে।

- পড়ালেখা সংক্রান্ত যেকোনো সমস্যার সম্মুখীন হলে অবশ্যই শিক্ষকের স্মরণাপন্ন হতে হবে।

- কিতাবের মধ্যে যেসকল তামরিন বা প্রশ্নমালা আছে, সেগুলোর উত্তর ভালোভাবে আয়ত্ব করা।

- কিতাবের মধ্যে যেসকল মুফরাদাত তথা শব্দার্থ রয়েছে সেগুলো ছাড়াও আরো প্রচুর পরিমাণ শব্দার্থ মুখস্ত করা। কারণ আরবি ভাষা ভালোভাবে আয়ত্ব করতে হলে প্রচুর শব্দভাণ্ডার জরুরি।

বাক্যের কাঠামো দিয়ে তামরিন করার নমুনা

এখন একটি বাক্য দিয়ে প্রচুর পরিমাণ তামরিন কিভাবে করবে তার কিছু নমুনা নিম্নে পেশ করছি, যেন খুব সহজেই তামরিনের বিষয়টি উপলব্ধি করা যায়। যেমন:

كتابُ خالدٍ - قلم فاطمةَ - غرفة المعلمِ

উপরে তিনটি বাক্য লেখা হয়েছে। এই তিনটি বাক্য হলো কাঠামো। এগুলোর আলোকে বাক্য গঠন করতে হবে। প্রথম বাক্যটি হলো- كتاب خالد, তো প্রথমত হুবহু এই বাক্যটিই ১০/১২ বার পড়ুন এবং তামরিনের মাধ্যমে আয়ত্ব করুন। অতঃপর এই বাক্যের মাঝে পরিবর্তন করুন। উদাহরণ স্বরূপ كتاب শব্দটি রেখে خالد শব্দের পরিবর্তে অন্য একটি শব্দ ব্যবহার করুন। যেমন:

كتاب راشد، كتاب بكر، كتاب شاهد، كتاب عمرو، كتاب عبد الله، كتاب عبد الرحمن، كتاب عبد الستار، كتاب عبد الكريم، كتاب سليمان، كتاب رفيق الإسلام، كتاب يونس، كتاب معين الإسلام، كتاب أيوب، كتاب نعيم الإسلام، كتاب روح الإمين، كتاب سيف الإسلام، كتاب تاج الدين، كتاب حسين أحمد، كتاب أبي هريرة، كتاب شريف الإسلام، كتاب المدرسة، كتاب المكتبة، كتاب التلميذ، كتاب المعلم، كتاب الأخ.

লক্ষ্য করুন, উপরে كتاب خالد এর বাক্য কাঠামোতে كتاب শব্দটি রাখা হয়েছে এবং خالد এর পরিবর্তে বিভিন্ন নাম ও শব্দ বসিয়ে অনেক বাক্য গঠন করা হয়েছে।

এবার আমরা كتاب خالد এর বাক্য কাঠামোতে خالد রেখে كتاب শব্দের স্থলে আরো কিছু নতুন শব্দ যুক্ত করে আরো কিছু বাক্য গঠন করব। যেমন:

قلم خالد، كراسة خالد، غرفة خالد، قلنسوة خالد، مروحة خالد، مدرسة خالد، قرية خالد، يد خالد، رجل خالد، فم خالد، شعر خالد، معلم خالد، عم خالد، أبو خالد، أخو خالد، قميص خالد، صديق خالد، صندوق خالد، حذاء خالد، طاولة خالد.

এবার উভয়টার মধ্যে পরিবর্তন করে ২০/২৫ করে বাক্য গঠন করুন।

এরপর আসবে ২য় কাঠামো। সেটি হল- قلم فاطمةَ এখন এই কাঠামো দিয়ে আগের মতো বেশ কিছু বাক্য তৈরির নমুনা পেশ করা হলো। যেমন:

قلم عائشة، قلم خالدة، قلم حسينة، قلم ربيعة، قلم كريمة، قلم ميمونة، قلم شريفة، قلم عالية، قلم شميلة، قلم مسفرة، قلم مطمئنة، قلم سعيدة، قلم بشرى، قلم محمودة، قلم مقصودة، قلم تمنى، قلم طيبة، قلم نجاحة، قلم أمينة، قلم ليلى.

লক্ষ্য করুন, উপরোক্ত বাক্যগুলোতে قلم শব্দটি রেখে فاطمة শব্দের পরিবর্তে অন্যান্য নাম বসানো হয়েছে।

এবার আসুন, فاطمة শব্দের ঠিক রেখে শুরুতে বিভিন্ন শব্দ বসিয়ে কিছু বাক্য তৈরি করি। যেমন:

أم فاطمة، أخت فاطمة، أخو فاطمة، أبو فاطمة، عم فاطمة، خال فاطمة، خالة فاطمة، عمة فاطمة، جد فاطمة، جدة فاطمة، بيت فاطمة، غرفة فاطمة، سرير فاطمة، كرسي فاطمة، خمار فاطمة، مائدة فاطمة، عين فاطمة، رأس فاطمة، خط فاطمة، ساعة فاطمة.

এরপর আসবে ৩য় কাঠামো। সেটি হলো- غرفة المعلم। এখন এই কাঠামো দিয়ে আগের মতো কিছু বাক্য তৈরির নমুনা পেশ করা হলো। যেমন:

غرفة التلميذ، غرفة السائق، غرفة التاجر، غرفة الفلاح، غرفة الكاتب، غرفة القارئ، غرفة العالم، غرفة الإمام، غرفة المؤذن، غرفة الشرطة، غرفة المدير، غرفة الوزير، غرفة الحارس، غرفة المصلي، غرفة السيد، غرفة العبد، غرفة الشيخ، غرفة الحداد، غرفة الغني، غرفة الفقير.

দ্বিতীয় শব্দের মধ্যে পরিবর্তন করে কিছু বাক্য তৈরি করা হলো। যেমন:

بيت المعلم، سرير المعلم، طاولة المعلم، كتاب المعلم، مذكرة المعلم، طاقية المعلم، إزار المعلم، فراش المعلم، وسادة المعلم، ثوب المعلم، مصباح المعلم، قفل المعلم، مفتاح المعلم، دراجة المعلم، سيارة المعلم، توقيع المعلم، دعاء المعلم، مهارة المعلم، قلب المعلم، غضب المعلم.

এই কাঠামোগুলো আয়ত্ব হয়ে গেলে এগুলোর শুরুতে هذا যোগ করে هذا كتاب خالد এভাবে তামরিন করবে। এই পর্ব শেষ হলে শেষে একটা গুনবাচক جميل শব্দযোগে আরো অনেক বাক্য তৈরি করবে। যেমন:

كتابُ خالد جميلٌ - এই পদ্ধতিতে প্রতিটি কাঠামো দিয়ে তামরিন করতে থাকবে। এভাবে প্রত্যেকটির মধ্যে পরিবর্তন করে প্রচুর পরিমাণ বাক্য গঠন করে একে অপরে তামরিন করতে হবে। প্রত্যেক বারই একজন আরবি বলবে বাকি সবাই বাংলা বলবে। আবার সে বাংলা বলবে বাকি সবাই আরবি বলবে। এভাবে দীর্ঘ সময় তামরিন করতে হবে।

'আততামরিনুল কিতাবী' পড়ার নিয়ম

'আততামরিনুল কিতাবী' পড়ার আদর্শ পদ্ধতি রয়েছে। সেগুলো মেনে কিতাবটি পড়লে তা থেকে যথাযথ ফায়দা অর্জিত হবে ইনশাআল্লাহ। নতুবা শুধু পড়াই হবে, কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জিত হবে না। পদ্ধতিগুলো নিম্নরূপ–

- প্রথমে কিতাবে উল্লিখিত প্রতিটি তামরিন সহপাঠীর সঙ্গে উপরোল্লিখিত নিয়মে তামরিন ও মুজাকারা করে যবান চালু করা।
- অতঃপর ওই তামরিন খাতায় লেখা।
- কিতাবের তামরিনের আলোকে আরো কিছু নতুন বাক্য তৈরি করা।
- উসতাদ যেসব তামরিন লিখতে দেন সেগুলো লিখে উসতাদকে দেখানো। অতঃপর উসতাদ যে সকল ভুল নির্ণয় করেছেন সেগুলো কয়েকবার খাতায় লিখে ও সহপাঠীর সঙ্গে মুজাকারা করে শুধরে নেয়া।

আরবি ভাষা শেখার প্রাথমিক স্তরে নাহু-সরফ

একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, আরবি ভাষা শেখার প্রাথমিক পর্যায়ে নাহু-সরফের কোনো কায়দা না পড়া কাম্য। কারণ, প্রথম থেকেই যদি নাহু-সরফের কায়দা পড়ে ও মুখস্ত করে তাহলে সে না কাওয়ায়িদ ভালোভাবে বুঝতে সক্ষম হবে, না ভাষা শিখতে পারবে। কারণ, ভাষার প্রাথমিক স্তর অর্জন করার পূর্বে কাওয়ায়িদ ভালোভাবে বোঝা সম্ভব নয়। এমনটা করলে ভাষা শেখার ক্ষেত্রে প্রভাব পড়ার আশঙ্কা আছে। কেননা সে তখন আরবি কিতাব পাঠ করার সময় শুধু কাওয়ায়িদ খুঁজতে থাকবে। এতে ভাষা আয়ত্ব হবে না।

আরবি ভাষার প্রাথমিক শিক্ষা কীভাবে অর্জন করবে?

এখন প্রশ্ন হল তাহলে কীভাবে পড়বে ও শিখবে? হ্যাঁ, প্রাথমিক পর্যায়ে আরবি ভাষা শিখতে হবে উসতাদের অনুসরণ করে করে, তাঁর কথা শুনে শুনে। তিনি যেই শব্দে পেশ দিবেন আপনিও সেই শব্দে পেশ দিবেন। তিনি যেই শব্দে যবর দিবেন, আপনিও সেই শব্দে যবর দিবেন। তিনি যেই শব্দে যের প্রদান করবেন, আপনিও সেই শব্দে যের প্রদান করবেন। কেন দিলেন? কোথায় যবর, যের, পেশ দিতে হয় এসব আপাতত এখন জানার প্রয়োজন নেই। যেমন, উসতাদ বললেন, রাশেদের বই সুন্দর, এর আরবি হলো- كتابُ راشدٍ جميلٌ

এখানে লক্ষ্য করুন, উসতাদ এই বাক্যে كتابُ শব্দটিতে পেশ, راشدٍ শব্দটিতে যের, جميلٌ শব্দটিতে পেশ দিয়েছেন। এখানে কিছু প্রশ্ন হতে পারে-

১. كتابُ শব্দের মধ্যে পেশ কেন দেয়া হলো?

২. راشدٍ শব্দের মধ্যে যের কেন দেয়া হলো?

৩. جميلٌ শব্দের মধ্যে পেশ কেন দেয়া হলো?

৪. শেষ শব্দ দুটিতে তানবিন এসেছে, কিন্তু প্রথম শব্দটিতে তানবিন কেন আসে নি?

প্রশ্নগুলোর উত্তর যথাক্রমে-

১. كتابٌ শব্দটি তারকিবে মুবতাদা হয়েছে, তাই তাতে পেশ দেয়া হয়েছে। কারণ, নাহুর একটি প্রশিদ্ধ কায়দা আছে। সেটি হলো, মুবতাদা সর্বদা পেশ বিশিষ্ট হয়।

২. راشدٍ শব্দটি তারকিবে মুজাফ ইলাইহি হয়েছে, তাই তাতে যের দেয়া হয়েছে। কারণ, নাহুর একটি প্রশিদ্ধ নিয়ম হলো, মুজাফ ইলাইহি সর্বদা যের যুক্ত হয়।

৩. جميلٌ শব্দটি তারকিবে খবর হয়েছে। আর নাহুর কায়দা হলো, খবর সর্বদা পেশ বিশিষ্ট হয়।

৪. প্রথম শব্দটি মুযাফ হয়েছে। আর নাহুর কায়দা হলো, মানেয়ে তানবিন তথা তানবিন দিতে বাধা তিন ধরনের জিনিস:

১. ال যেমন: الكتابُ، القلمُ، المدرسةُ

২. مضاف যেমন: كتابُ راشد، كرّاسةُ حامد

৩. غير المنصرف যেমন: عمرُ، مساجدُ، مصابيحُ

অতএব, নাহুর এই কায়দা অনুযায়ী كتابُ راشد جميل এই বাক্যে كتابُ শব্দের মধ্যে তানবিন হয় নি। পক্ষান্তরে راشد ও جميل শব্দদ্বয়ে মানেয়ে তানবিন বা তানবিন দিতে বাধাপ্রদানকারী কোনটি পাওয়া যায় নি। তাই তাতে তানবিন দেয়া হয়েছে।

আর এই বাক্যটি হলো জুমলায়ে ইসমিয়া খবারিয়া। জুমলায়ে ইসমিয়া খবারিয়া কাকে বলে? সেটা জানার আগে জানতে হবে জুমলায়ে খবারিয়া কাকে বলে? জুমলায়ে খবারিয়া বলা হয়, যেই জুমলার বক্তাকে সত্য বা মিথ্যার গুণে গুণান্বিত করা যায়। অতঃপর জুমলায়ে খবারিয়ার শুরুটা যদি ইসম দ্বারা হয় তাহলে তাকে জুমলায়ে ইসমিয়া খবারিয়া বলা হয়।

দেখুন, كتابُ راشدٍ جميلٌ (রাশেদের বই সুন্দর) বাক্যটি কত ছোট। কিন্তু তাতে কতগুলো নাহুর কায়দা পাওয়া যাচ্ছে। উপরে যে কায়দাগুলো উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো তো অতি সামান্য। এই একটি বাক্যে নাহুর আরো অনেক কায়দা আছে। বিস্তারিত লিখতে গেলে মূল আলোচনাই ঢাকা পড়ে যাবে।

তো একজন শিক্ষার্থী যদি প্রথমেই নাহুর কাওয়ায়িদ পড়ে ফেলে। তাহলে 'রাশেদের বই সুন্দর' আরবি কী জিজ্ঞেস করার সাথে সাথে তার মস্তিষ্কে প্রথমেই নাহুর উপোরক্ত কাওয়ায়িদ ঘুরপাক খেতে থাকবে। দীর্ঘ সময় চিন্তা করে এই আরবিটি তাকে তৈরি করতে হবে। তাতে সে হিমশিম খাবে এবং অনেক বিরক্ত বোধ করবে। এক পর্যায়ে আরবি ভাষা শেখার আগ্রহ হারিয়ে ফেলবে।

এই জন্য আরবি ভাষা শেখার প্রাথমিক পর্যায়ে নাহু-সরফের কোনো কাওয়ায়িদ পড়া উচিত নয়। এটি কেবল আরবি ভাষার ক্ষেত্রেই নয়; বরং পৃথিবীর যে কোনো ভাষার ক্ষেত্রেও একই কথা যে, ভাষা শেখার প্রাথমিক পর্যায়ে কাওয়ায়িদ বা ব্যাকরণ ব্যতীত শিক্ষকের নিকট থেকে শুনে শুনে অনুসরণ করে করে শিখতে হবে এবং পড়তে হবে।

শিশুরা কীভাবে ভাষা শেখে

একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হবে। শিশুরা যখন কথা বলতে শেখে তখন কি তারা প্রথমে ওই ভাষার কায়দা কানুন বা ব্যাকরণ শেখে? শেখে না; বরং শিশুরা শোনার মাধ্যমেই ভাষা শিখে। শিশুরা মূলত ভাষা শিখে না; বরং তাদের ভাষা জ্ঞান অর্জন হয়। তারা অবচেতন মনে ভাষা শিখে।

শিশু তার মায়ের কাছ থেকে শুনে। বাবার কাছ থেকে শুনে। ভাই-বোনের কাছে শুনে। নানা-নানি, দাদা-দাদি মোট কথা বিভিন্নজন থেকে ভাষা শুনতে থাকে এবং শিখতে থাকে। এই শোনার ফলে শিশু শুধু প্রচুর শব্দই শিখে না, বহু শব্দের সফল প্রয়োগও তার অবচেতন মনে জানা হয়ে যায়। মনের ভাব প্রকাশের অনেক ভঙ্গি তার শেখা হয়ে যায়। যেমন একটা শিশু তার বাবার কাছে 'খেলনা' চাইবে। তখন এই ভাবটা বিভিন্নভাবে প্রকাশ করে। যেমন:

- আব্বু! আমার খেলনা কোথায়?
- আব্বু! আমার খেলনাটা দেখেছেন?

- আব্বু! আমি এখন খেলব। আমার খেলনাটা দেখছি না যে!
- আব্বু! আমার খেলনা খুঁজে দেন না!
- আব্বু! আমার খেলনা তো এখানে ছিল। পাচ্ছি না যে, কোথায়?
- আব্বু! এখন তো আমার খেলার সময়। আমার খেলনাটা দিন।
- আব্বু! আপনি না বলেছেন, আমার পড়া হয়ে গেলে আমাকে খেলনা দিবেন। আমার তো পড়া শেষ। এখন খেলনা দিন। আমি খেলব।

মোট কথা, একটি ভাবকে বিভিন্নরূপে প্রকাশ করার মতো গুরুত্বপূর্ণ দক্ষতাও শিশু শুধু শ্রবণ করার দ্বারাই অর্জন করতে সক্ষম হয়। সে শোনার মাধ্যমে اسم فعل حرف সকল প্রকারের শব্দ শিখে ফেলে। الجملة الاسمية، الجملة الشرطية، الجملة الإنشائية، الجملة الخبرية، الجملة الفعلية، الجملة البيانية، الجملة الدعائية، الجملة الاستفهامية، الجملة الظرفية، الجملة الحالية সহ সকল প্রকারের কথা সে বলতে পারে। তবে এতটুকু যে, সে শুধু পরিভাষাগুলো জানে না যে, কোনটি الجملة الاسمية কোনটি الجملة الفعلية।

এখন প্রশ্ন হতে পারে যে, তাহলে কি আরবি ভাষা শেখার ক্ষেত্রে নাহু-সরফের কাওয়ায়িদের কোনো প্রয়োজন নেই? অথচ একটি প্রবাদ সকলের কাছেই প্রশিদ্ধ যে, النحو في الكلام كالملح في الطعام অর্থাৎ, ভাষায় নাহু তেমন, খাবারে লবন যেমন।

এই প্রবাদের ব্যাখ্যা অনেকেই ভুল বুঝে থাকে। তাই কেউ কেউ এর ব্যাখ্যা করে যে, খাবারে লবন না থাকলে যেমন খাবার স্বাদ হয় না। ঠিক তেমনিভাবে ভাষায় নাহু না থাকলে সেই ভাষা সুন্দর ও বিশুদ্ধ হয় না। অতএব, প্রচুর পরিমাণ নাহুর কাওয়ায়িদ মুখস্ত করতে হবে। ফলে তারা ভাষা শেখার তুলনায় নাহুর কায়দাই বেশি মুখস্ত করে থাকে।

النحو في الكلام كالملح في الطعام (ভাষায় নাহু তেমন, খাবারে লবন যেমন) এর সঠিক ব্যাখ্যা

النحو في الكلام كالملح في الطعام তথা, 'ভাষায় নাহু তেমন, খাবারে লবন যেমন' এই কথাটির সঠিক ব্যাখ্যা হলো, খাবারে লবন ততুটুকই ব্যবহার হয় যতটুকু প্রয়োজন হয়। আর একথা সবার কাছেই স্পষ্ট যে, খাবারে লবন অবশ্যই খাবারের চেয়ে শুধু কমই নয়, বরং অনেক কম ব্যবহার করা হয়। এমন কাউকে দেখা যায় না যে, এক প্লেট লবন নিয়েছে। আর তাতে ভাত নিয়েছে অতি সামান্য। বরং এর বিপরীত পরিলক্ষিত হয়, এক প্লেট ভাতের মধ্যে অতি সামান্য একটু লবন নিয়ে থাকে। আবার অনেকে লবনই গ্রহণ করে না। এটা হলো, স্বাভাবিক নিয়ম। কেউ যদি ব্যতিক্রম করে যে, এক প্লেট লবন নিয়ে সামান্য একটু ভাত খেতে বসেছে তাহলে অবশ্য তাকে মানুষ সুস্থ বলবে না এবং সে নিজেও ওই খাবার খেতে পারবে না। ঠিক তেমনিভাবে আরবি ভাষা জ্ঞান থাকতে হবে অনেক বেশি। তারপর প্রয়োজনীয় কিছু নাহবী কায়দা বা আরবি ব্যাকরণ শিখতে হবে। তাহলে ভাষায় স্বাদ পাওয়া যাবে এবং ভুল ত্রুটি থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। এর বিপরীত যদি দেখা যায় যে, নাহবী কায়দা প্রচুর মুখস্ত করে ফেলেছে। অথচ আরবি ভাষা জ্ঞান অতি সামান্য শিখেছে তাহলে তেমনি দুর্ঘটনা ঘটবে, যেমন দূর্ঘটনা ঘটে যখন আধা প্লেট ভাতের মধ্যে এক প্লেট লবন নেয়া হয়।

তাই তো দেখা যায় যে, একজন তালিবুল ইলম মাফউলে লাহু'র সংজ্ঞা মুখস্ত করে ফেলে অথচ কোনো আরবি কিতাবে যদি মাফউলে বিহি আসে, আর তাকে জিজ্ঞেস করা হয় যে, এই শব্দটিতে যবর কেন দেয়া হয়েছে? তখন সে উত্তর দিতে দ্বিধায় পড়ে যায়। অনুরূপ সে حال এর পরিচয় মুখস্ত করে ফেলে। অথচ কিতাবে حال আসলে তখন সে চিনতে সক্ষম হয় না। مستثنى مستثنى منه এর পরিচয়, প্রকারভেদ, ইরাব সব মুখস্ত করে ফেলে, অথচ সে বাক্যের মাঝে কোনটি مستثنى আর কোনটি مستثنى منه কোনটির কী ইরাব, এগুলো প্রায়োগিক ক্ষেত্রে বলতে ও বুঝতে ব্যর্থ হয়। এর মূল কারণ সে শুধু

নাহবী কায়দা মুখস্ত করে ফেলেছে। প্রায়োগিকভাবে চর্চা করে নি। ভাষার ব্যবহার শিখে নি। ইজরা করে নি।

আবার অনেক তালিবে ইলমকে দেখা যায় যে, সে আরবি কিতাবের ইবারত পড়ার সময় সহিহভাবে পড়ে যায়। যবরের জায়গায় যবর, যেরের জায়গায় যের, পেশের জায়গায় পেশ দিয়ে পড়তে সক্ষম হয়। তবে কেন দিচ্ছে সেটা হয়তো বলতে পারছে না। কারণ সে নাহবী কায়দার তুলনায় ভাষাটা ভালোভাবে সঠিক পদ্ধতিতে শিখেছে।

এখন আপনিই বলুন কে সফল, যার নাহবী কায়দা মুখস্ত, কিন্তু আরবি ইবারত সঠিক ভাবে পড়তে ও বুঝতে সক্ষম হয় না সে? নাকি যার নাহবী কায়দা মুখস্ত নেই। তবে আরবি ইবারত সঠিকভাবে পড়তে ও বুঝতে সক্ষম সে? নিশ্চয় আপনি বলবেন, দুজনের মধ্যে দ্বিতীয় জন সফল।

القواعد النحوية বা আরবি ব্যাকরণ শেখার উদ্দেশ্য

কেননা নাহবী কায়দা পড়ার উদ্দেশ্য হলো, صيانة الذهن عن الخطأ اللفظي في كلام العرب অর্থাৎ, আরবি ভাষায় শাব্দিক ভুল-ভ্রান্তি থেকে বেঁচে থাকা। এ কথা আমরা সবাই হেদায়াতুন্নাহু ও কাফিয়া কিতাবের শুরুতেই পড়ে এসেছি। আমার যদি ভাষাজ্ঞানই না থাকে তাহলে আমি নাহবী কায়দা কোথায় প্রয়োগ করব? এবং নাহবী কাওয়ায়িদ পড়ানো হয় যেই উদ্দেশ্যে, তথা, 'আরবি ভাষায় শাব্দিক ভুল-ভ্রান্তি থেকে বেঁচে থাকা' সেটা যদি অর্জিত না হয় তাহলে আমি সফল নই। পক্ষান্তরে কোনো তালিবে ইলম যদি বিশুদ্ধভাবে আরবি ইবারত পড়তে ও বুঝতে পারে, কিন্তু নাহবী কায়দা পারে না, তাহলে সে অবশ্যই সফল। কারণ, তার মূল উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে।

মনে করুন, আমরা বাংলায় কথা বলি, বাংলা বই পড়ি, বাংলায় চিঠিপত্র, দরখাস্ত, প্রবন্ধ, নিবন্ধ লিখি। আমরা কি সবাই বাংলা ব্যাকরণ জানি? জানি না। কিন্তু আমরা তা বিশুদ্ধভাবে লিখতে পারি। তো এখন কথা হলো, আমাদের এই ব্যাকরণ না জানার মাঝে কি কোনো ত্রুটি আছে? নিশ্চয় নেই। কেননা আমাদের যেটা মূল লক্ষ্য সেটা তো অর্জিত হয়েছে। পক্ষান্তরে কারো যদি বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, অব্যয়, ক্রিয়া ইত্যাদি বাংলা ব্যাকরণের যাবতীয় নিয়ম কানুন মুখস্ত থাকে, কিন্তু সে বাংলায় লিখিত কোনো প্রবন্ধ-

নিবন্ধ শুদ্ধরূপে পড়তে পারে না, বিশুদ্ধভাবে বলতে পারে না, কেউ বাংলায় কথা বললে তা পরিপূর্ণ বুঝতে পারে না। চিঠিপত্র, দরখাস্ত, প্রবন্ধ, নিবন্ধ লেখা তো দূরের কথা; তাহলে সে কি সফল? তার ওই ব্যাকরণ মুখস্তকরণের মাঝে কী ফায়দা? তার ওই মুখস্তকৃত ব্যাকরণ কোনো কাজে আসবে? অবশ্যই না; বরং তাকে শুধু আফসোস করতে হবে। হ্যাঁ কারো যদি বাংলা ভাষাজ্ঞান থাকার পাশাপাশি ব্যাকরণও জানা থাকে তাহলে তো সে প্রশংসার যোগ্য এবং তা অধিক ফলদায়ক।

তদ্রূপ আরবি ভাষার ক্ষেত্রেও একই কথা। কোনো তালিবে ইলম যদি নাহুর সব কাওয়ায়িদ কবিতার মতো মুখস্ত করে নেয়, কিন্তু সে শুদ্ধরূপে আরবি ইবারত পড়তে ও বুঝতে সক্ষম না হয়, এবং আরবিতে বলতে ও লিখতে না পারে, এমনকি সে যেই কাওয়ায়িদ মুখস্ত করেছে তা আরবি ইবারত পড়ার সময় প্রয়োগ করতে না পারে তাহলে তার ওই কাওয়ায়িদ মুখস্ত করার মাঝে বিশেষ কী উপকারিতা আছে? ব্যাপারটা কিন্তু ভাবার বিষয়। বড়ো দুঃখের সাথে বলতে হয়, অনেক তালিবুল ইলম ভাই অনেক কষ্ট করে নাহুর কাওয়ায়িদ মুখস্ত করে। কিন্তু তা ইজরার আলোকে ইবারতে প্রয়োগ করে না। ফলে তাকে যখন কোনো আরবি কিতাব খুলে তামিজ জাতীয় কোনো শব্দের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, এই শব্দের মধ্যে যবর কেন হয়েছে? সে বলতে পারে না। অথবা ভুল উত্তর দেয়। একবার বলে এটি মাফউলে বিহি, আরেকবার বলে এটি হাল। এভাবে সে দ্বিধায় পড়ে যায়। অথচ তাকে যদি তামিজের সংজ্ঞা ও প্রকার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয় তাহলে সে হয়তো এক নিঃশ্বাসে তামিজের সংজ্ঞা, প্রকার ও উদাহরণ শুনিয়ে দিবে। আচ্ছা ভাই, আপনিই বলুন, তার এই পদ্ধতিতে কাওয়ায়িদে নাহবিয়্যাহ মুখস্তকরণ তাকে কী উপকার করল?

হ্যাঁ, কারো যদি নাহবী কাওয়ায়িদও জানা থাকে, পাশাপাশি আরবি ইবারত শুদ্ধরূপে পড়তে ও বুঝতে পারে তাহলে তো নুরুন আলা নুর। আল্লাহ তাআলা সকলকে সঠিক বুঝ দান করুন। আমিন।

القواعد النحوية বা আরবি ব্যাকরণ কখন শিখবে

আরবি ব্যাকরণ শেখার প্রয়োজন আছে। তবে সেটা প্রাথমিক পর্যায়ে নয়; বরং প্রাথমিক পর্যায়ে আরবি ভাষা জ্ঞান অর্জন করতে হবে উসতাদের নিকট

থেকে শুনে শুনে এবং অনুসরণ করে করে। এরপরের ধাপে গিয়ে القواعد النحوية বা আরবি ব্যাকরণ শিখবে। অর্থাৎ, 'এসো আরবি শিখি (১-৩য় খণ্ড) ও আততামরিনুল কিতাবী' পড়া শেষ হলে নাহবী কাওয়ায়িদ পড়বে। এজন্যে দরসে নেজামি ও মাদানী নেসাব উভয় শ্রেণীর মাদরাসাগুলোতে এই নিয়মেই القواعد النحوية বা আরবি ব্যাকরণ পড়ানো হয়। অর্থাৎ, দরসে নেজামিতে মিজান জামাতে 'এসো আরবি শিখি (১-৩য় খণ্ড) ও আততামরিনুল কিতাবী' পড়ানো হয়। এরপর পরবর্তী শিক্ষাবর্ষে অর্থাৎ নাহবেমির জামাতে القواعد النحوية বা আরবি ব্যাকরণের কিতাব 'নাহবেমির' পড়ানো হয়।

অনুরূপ মাদানী নেসাবের মাদরাসাগুলোতেও ১ম বর্ষে 'এসো আরবি শিখি (১-৩য় খণ্ড) ও আততামরিনুল কিতাবী' পড়ানো হয়। তারপর ২য় বর্ষে القواعد النحوية বা আরবি ব্যাকরণ সংশ্লিষ্ট মাওলানা আবু তাহের মিছবাহ হাফিজাহুল্লাহ এর লিখিত কিতাব 'এসো নাহব শিখি' পড়ানো হয়।[১]

---

(১) এখানে একটি নিবেদন করতে চাই, দরসে নেজামি হোক, আর মাদানী নেসাব হোক, উভয় নেসাবই উপকারী ও কল্যাণময়। কোনোটির মধ্যে ক্ষতির দিক নেই। অতএব, যারা দরসে নেজামিতে পড়ে তাদের উচিত নয়, মাদানী নেসাবে পড়ুয়া তালিবে ইলমকে তুচ্ছতার দৃষ্টিতে দেখা। আবার মাদানী নেসাবের তালিবে ইলমদের উচিত নয়, দরসে নেজামির তালিবে ইলমদেরকে হেয় দৃষ্টিতে দেখা। প্রিয় তালিবে ইলম ভাই! কোনো নেসাব আমাকে বড়ো করতে পারবে না। নেসাব আমাকে কেবল সহযোগিতা করতে পারবে, পথ দেখাতে পারবে। আমাকে বড়ো হতে হলে উসতাদের সাহচর্যে থেকে প্রচুর পরিমাণ মুতালাআ, অব্যাহত মেহনত-পরিশ্রম, আল্লাহ তাআলার দরবারে দোআ-কান্নাকাটি ও রোনাযারী করতে হবে। তবেই একদিন বড়ো হওয়া যাবে। মনে রাখবেন, নেসাবের নির্ধারিত কিতাব পড়ে কেবল কিতাবী ইসতিদাদ অর্জন করা সম্ভব। ফন্নী ইসতিদাদ বা শাস্ত্রীয় পাণ্ডিত্য এবং রুসুখ ফিল ইলম হাসিল করতে চাইলে নেসাবের বাইরে নির্দিষ্ট ফনের লিখিত আরো যেসকল মৌলিক গ্রন্থ আছে সেগুলো মাহেরে ফন কোনো উসতাদের সাহচর্যে থেকে মুতাআলা করতে হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সঠিক বুঝ দান করুন। আমিন।

القواعد النحوية বা আরবি ব্যাকরণ পড়ার পদ্ধতি

القواعد النحوية বা আরবি ব্যাকরণ পড়ার সঠিক পদ্ধতি হলো, যখন কোনো কায়দা পড়বে তখন সেই কায়দাটি ইজরা করে পড়বে এবং একটি কায়দার সাথে কিতাবের বাইরে আরো অনেক উদাহরণ নিজে নিজে তৈরি করবে ও ওই কায়দার উপর প্রচুর পরিমাণ তামরিন বা অনুশীলন করবে এবং যেদিন যেই কায়দা পড়বে সেদিন অন্য সকল আরবি কিতাবে ওই কায়দাটি খুঁজবে। কোথায় ওই কায়দাটি ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, আজকে مفعول به এর পরিচয় পড়া হলো। তাহলে আজ সারাদিন অন্যান্য আরবি কিতাব পড়ার সময় খেয়াল করতে হবে যে, আজকে সবকে কোনটি مفعول به হয়েছে এবং কীভাবে হয়েছে? এবং مفعول به এর সংজ্ঞা যেভাবে পড়া হয়েছে সেভাবে পাওয়া যাচ্ছে কিনা। উদাহরণ স্বরূপ নিম্নে একটি ইবারত তুলে দেয়া হলো-

من عادات الشعوب والزواج

يتبع الناس عادة خاصة بهم في الزواج في وسط يوغوسلافيا، فإذا أراد الشاب خطبة فتاة ذهب إلى أسرتها وبحث معهم أمور الزواج، وفي نهاية الحديث لا تعطي الأسرة رأيها فيه صراحة بنعم أولا، بل تقدم له القهوة. فإذا كانت حلوة معنى ذلك أنهم قبلوه للفتاة، وإذا كانت مرة فقد رفضت الأسرة الطلب وعليه أن يجد حظا أحسن في مكان آخر.(١)

উল্লিখিত ইবারতটি পড়ুন এবং উক্ত ইবারতের মধ্যে কোন কোন শব্দ مفعول به হয়েছে তা নির্ণয় করুন এবং তা مفعول به এর সংজ্ঞার সাথে মিলেছে কিনা তাও লক্ষ্য করুন।

এরপর আরবিতে বিভিন্ন বাক্য তৈরি করুন এবং তাতে مفعول به এর অনুশীলন করুন। নিম্নে নমুনাস্বরূপ কিছু বাক্য তৈরি করে দেখানো হলো-

---

(১) আল ক্বাওয়ায়িদুন নাহবিয়্যাহ আল মুয়াসসারাহ, লেখক: ড. মাহমুদ ইসমাঈল, ড. ইবরাহীম ইউসুফ, মুহাম্মাদ রিফাঈ পৃ: ৯১

- عين المفعول به في الجمل التالية : (নিম্নোক্ত বাক্যগুলোর মাঝে মাফউলে বিহি নির্ণয় কর)
  - كتب الطالب الدرس
  - شرب الطفل اللبن
  - ينتخب الشعب أعضاء البرلمان
  - أعلن الاستعمار الحرب على الدول الضعيفة
  - أقام المعهد حفلة لتخريج الطلاب
  - أنشأت الجامعة كلية للطب
  - اشترى علي بيتا
- ضع مفعولا به مناسبا في الفراغ: (শূন্যস্থানে উপযোগী মাফউলে বিহি বসাও)
  - أكل الضيف ....
  - عالج الطبيب ......
  - زار المهندس .....
  - انتخب ا لأعضاء ......
  - باع التاجر ....
  - تعلم الطالب ......
  - حل الأستاذ ....
  - نظف الخادم ....

- **أجب عن الأسئلة التالية بجمل فعلية مختارة تحتوي على مفعول به كما في المثال التالي:**

(নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও মাফউলে বিহিযুক্ত জুমলায়ে ফেলিয়া দ্বারা)

مثال: ماذا يشرب راشد؟

الجواب: يشرب راشد القهوة.

- ماذا يقرأ الطالب؟
- ماذا أدى المواطن؟
- ماذا اختار الأعضاء؟
- ماذا أحضر محمد؟
- ماذا اشترى الجيش؟
- ماذا أعلن القاضي؟
- ماذا أكد الإسلام؟
- ماذا بنى المهندس؟

অনুরূপভাবে একটি আরবি ইবারত লিখে প্রথমে সেটা পড়তে হবে এবং তা থেকে কিছু প্রশ্ন তৈরি করতে হবে যার উত্তর হবে এমন বাক্য দ্বারা যাতে مفعول به উল্লেখ থাকবে। নমুনা স্বরূপ একটি ইবারত ও তা থেকে কিছু প্রশ্ন তৈরা করা হলো-

كتب علي رسالة إلى صديقه محمود في جدة يخبره فيها بأنه قادم لزيارته بعد أسبوع. وفي الموعد المحدد لبس علي ثيابا جديدة وتجهز للسفر، وركب الطائرة من الرياض إلى جدة. استقبل محمود عليا في المطار، ثم توجها في السيارة إلى البيت حيث قدم محمود العصير لصديقه علي، ثم تناولا الطعام واستراحا قليلا

في البيت. وفي المساء صحب محمود عليا إلى شاطئ البحر، حيث شاهدا البواخر في الميناء، وقضيا وقتا ممتعا قبل أن يعودا إلى البيت. أمضى علي أسبوعا في زيارة صديقه، ثم شكره على حسن الضيافة وودعه عائدا إلى البيت.

- **أجب عن الأسئلة التالية بجمل فعلية تحتوي على مفعول به:**

(নিম্নোক্ত প্রশ্নোগুলোর উত্তর দাও মাফউলে বিহি যুক্ত জুমলা দ্বারা)

- ماذا كتب علي لصديقه محمود؟
- ماذا لبس علي قبل سفره إلى جدة؟
- ماذا ركب علي عند سفره إلى جدة؟
- ماذا قدم محمود لصديقه علي في البيت؟
- ماذا فعل محمود في المساء؟
- ماذا شاهد علي في المساء؟
- كم أسبوعا أمضى علي في زيارته؟

এটা গেল مفعول به এর কথা। মনে করুন আরেকদিন المفعول المطلق এর আলোচনা পড়া হলো। তাতে المفعول المطلق এর পরিচয় ও প্রকারের আলোচনা হলো। যেমন-

المفعول المطلق: اسم منصوب موافق للفعل في لفظه ويجيء بعد الفعل لتأكيده، أو لبيان نوعه أو عدده.

এখানে المفعول المطلق এর সংজ্ঞা ও প্রকার নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এখন আপনার কাজ হলো, বিভিন্ন আরবি কিতাব থেকে المفعول المطلق খুঁজে বের করা এবং বিভিন্ন উপায়ে المفعول المطلق এর অনুশীলন করা। নিম্নে কিছু নমুনা পেশ করা হলো-

- **استخرج من العبارة الآتية كل مفعول مطلق، وعين ما كان منه مؤكدا لفعله، وما كان مبينا لنوعه، أو عدده:**

(নিম্নোক্ত ইবারতের মধ্যে মাফউলে মুতলাক বের কর এবং কোনটি মাফউলে মুতলাকের কোন প্রকার তা নির্ণয় কর?)

تثور البراكين في بعض الجهات ثورانا شديدا، فتهدم المنازل هدما، وتدك المباني دكا، وتقذف النيران قذفا مستمرا، فيخاف السكان خوفا عظيما، فلا نسمع غير نساء تصيح صياحا، وأطفال تصرخ صراخا، ولا ترى إلا رجالا نكبهم الدهر نكبتين: مات أولادهم وضاعت أموالهم.

উল্লিখিত ইবারত থেকে المفعول المطلق ও তার প্রকার নির্ণয় করার দ্বারা المفعول المطلق এর পরিচয় অন্তরে গেঁথে যাবে ইনশাআল্লাহ।

- **اجعل كل اسم من الأسماء الآتية مفعولا مطلقا في جملة تامة:**

(নিম্নোক্ত প্রত্যেক ইসমকে মাফউলে মুতলাক বানিয়ে জুমলা তৈরি কর)

- نوما
- تعبا
- قياما
- استغفارا
- ضربتين
- إشراقا
- قعودا
- إكراما

- **ضع مفعولا مطلقا في كل جملة من الجمل الآتية:**

(নিম্নোক্ত প্রতিটি জুমলার শূন্যস্থানে মাফউলে মুতলাক বসাও)

- يفيض النهر....
- نهق الحمار....
- تجري الأرنب....
- ينبح الكلب....
- ابتعد عن الشر....
- سارت السيارة....
- ظهر الهلال....

- **كون خمس جمل تشتمل كل منها على مفعول مطلق مؤكد لفعله.**
- **كون خمس جمل تشتمل كل منها على مفعول مطلق مبين لنوع فعله.**
- **كون خمس جمل تشتمل كل منها على مفعول مطلق مبين لعدد فعله.**
- **كون جملة المفعول به فيها ضمير متصل، والفاعل اسم موصول مع اشتمالها على مفعول مطلق.**
- **كون جملة الفاعل فيها جمع مذكر سالم، والمعفول به جمع مؤنث سالم مع اشتمالها على مفعول مطلق.**
- **كون جملة تشتمل على نائب الفاعل، ومفعول مطلق مبين للنوع.**
- **كون جمل الفاعل فيها ضمير متصل، وبها مفعول مطلق مؤكد لفعله.**
- **كون جملة تشتمل على فعل أمر مبني على الفتح، وبها مفعول مطلق مبين للعدد.**

- كون جملة شرطية تشتمل على مفعول مطلق مؤكد لفعل الشرط ومفعول مطلق مؤكد لجواب الشرط.
- كون جملة الفاعل فيها مثنى مضاف مع اشتمالها على مفعول مطلق مبين للنوع.[১]

উপরে যেসকল অনুশীলনের নমুনা দেখানো হলো, নাহুর প্রত্যেকটি কায়দা যদি এভাবে অনুশীলনের মাধ্যমে পাঠ করা হয়, তাহলে আশা করা যায় যে, জীবনে কখনো আরবি ইবারত পড়া, লেখা ও বলার সময় ব্যাকরণগত কোনো ভুলের সম্মুখীন হবে না ইনশাআল্লাহ। আর নাহু সংক্রান্ত নিম্নে বর্ণিত আরবি ভাষায় লিখিত দুটি কিতাব মুতাআলা করলে অধিক উপকার হবে ইনশাআল্লাহ। কারণ তাতে বিস্তারিত প্রায়োগিক তামরিনের মাধ্যমে নাহবের কায়দাগুলো আলোচনা করা হয়েছে। কিতাব দুটি হলো:

১. আল কাওয়ায়িদুন নাহবিয়্যাহ আল মুয়াসসারাহ, লেখক: ড. মাহমুদ ইসমাইল, ড. ইবরাহিম ইউসুফ, মুহাম্মাদ রিফাই।

২. আননাবুল ওয়াজিহ ফি কাওয়ায়িদিল লুগাতিল আরাবিয়্যাহ, লেখক: ড. মুস্তফা আমিন ও ড. আলি আল জারিম।

মন থেকে নাহভীতি দূর করুন, আপনি পারবেন ইনশাআল্লাহ

আমাদের দেশের বহু তালিবুল ইলম ভাই এই মনে করে বসে আছে যে, 'নাহবি কাওয়ায়িদ ব্যতীত আরবি ভাষা শেখা অসম্ভব এবং ইলম মানেই হলো নাহুর কাওয়ায়িদ। আর নাহুর কিতাবগুলো যথেষ্ঠ কঠিন। কায়দাগুলো আয়ত্ব করা অনেক কষ্ট সাধ্য একটি দূর্বোধ্য বিষয়। আমার দ্বারা কিছুই হবে না। কারণ আমি তো নাহু বুঝি না। তারকিব বুঝি না।'

এই ভীতির কারণে বহু ছাত্র হতাশ হয়ে পড়ে। অনেককে হেদায়াতুন্নাহ/কাফিয়া জামাত থেকে ঝড়ে পড়তে দেখা যায়। অথচ ওই

---

(১) আননাবুল ওয়াজিহ ফি কাওয়ায়িদিল লুগাতিল আরাবিয়্যাহ, লেখক: ড. মুস্তফা আমিন ও ড. আলি আল জারিম, পৃ: ১৮১-১৮৩

তালিবুল ইলমের দ্বারা সম্ভব ছিল একজন বড়ো আলেম হওয়ার। শুধু অনর্থক ভীতি লালন করে নিজের জীবনটাকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দেয়।

মাওলানা সফিউল্লাহ ফুআদ হাফিজাহুল্লাহ এর লিখিত 'আরবি ভাষা পাঠদান পদ্ধতি' কিতাবের ১৪৭ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে, "ভাষা ও সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে, বিশেষত আরবি ভাষা ও সাহিত্য চর্চার জন্যে, অনেকেই نحو- صرف তথা ব্যাকরণকে ভিত্তি মনে করেন। অথচ এই ভিত্তিটি সম্পর্কে তেমন কিছু বলা হলো না। তো এ সম্পর্কে কথা হলো, আমি স্বীকার করি, ভাষাজ্ঞানের পরিপূর্ণতায় ও সাহিত্যজ্ঞানের বলিষ্ঠতায় نحو-صرف তথা ব্যাকরণজ্ঞান দরকার। তবে খাবারের সঙ্গে লবণের যে ধরনের সম্পর্ক, ভাষার সঙ্গে ব্যাকরণের সম্পর্ক সে ধরনেরই। কারণ, نحوي গণ বলেছেন- النحو في الكلام كالملح في الطعام অর্থ- খাবারে লবণ যেমন, ভাষায় ব্যাকরণ তেমন। তাঁদের এ বাণী আমাদের স্মরণ রাখতে হবে। অন্যথায় আঁতে ঘা লাগবে এবং ভাষা শেখার স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যাবে।

ভাষা ও সাহিত্য চর্চার একটি পর্যায় পৌঁছার পর নিয়মতান্ত্রিকভাবে ব্যাকরণ পড়ার সময় হয়। এর আগে নয়। نحو-صرف এর উপর এর আগে অহেতুক গুরুত্বারোপ করে ভাষা ও সাহিত্য চর্চাকে ব্যাহত করা এবং استعداد বিনির্মাণে বাধা সৃষ্টি করা উচিত নয়।"

নাহুভীতি থেকে উত্তরণের উপায়

নাহুভীতি থেকে উত্তরণের জন্য নিম্নে কিছু পন্থা উল্লেখ করা হলো। সেই পন্থাগুলো মেনে চললে নাহুভীতি আর থাকবে না এবং কাঙ্খিত যোগ্যতা অর্জন হবে ইনশাআল্লাহ। পন্থাগুলো হলো:

- মন থেকে ভয় দূর করতে হবে এবং এই আত্মবিশ্বাস রাখতে হবে যে, আমি পারব ইনশাআল্লাহ। অনেকেই পারে। তাহলে আমি কেন পারব না? আমাকে পারতেই হবে।

- আপনি আপনার দুর্বলতা নির্ণয় করুন, কোন কোন বিষয়ে আপনার দুর্বলতা আছে। আপনি কী কী বুঝেন না, কতটুকু বুঝেন আর কতটুকু বুঝেন না সেটা নির্ণয় করুন।

- অতঃপর নির্দিষ্ট একজন উসতাদের নিকট নিজেকে সপে দিন। তার নিকট আপনার যাবতীয় দুর্বলতা পেশ করুন। উসতাদ আপনার দুর্বলতা কাটানোর জন্য যেভাবে আপনাকে পড়ানো প্রয়োজন সেভাবে পড়াবেন। যতটুকু প্রয়োজন, যা যা প্রয়োজন তা পড়াবেন। আপনাকে উসতাদ যেই কাজ দেন সেই কাজ আদায় করুন। দেখবেন, এভাবে অব্যাহত মেহনত করতে থাকলে অল্প সময়ের মাঝেই আপনার সব দুর্বলতা দূর হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। তখন আপনিও ইবারত বুঝবেন। তারকিব বুঝবেন। পড়ার মাঝে স্বাদ পাবেন। অদৃশ্য এক আনন্দ উপলব্ধি করতে পারবেন ইনশাআল্লাহ।

- আর যদি আপনি আপনার দুর্বলতাকে নির্ণয় করতে সক্ষম না হন তাহলে অসুবিধে নেই। ভয়ের কোনো কারণ নেই। আপনি আপনার উসতাদের নিকট যান। তারপর নিজেকে পরীক্ষার সম্মুখীন করুন। উসতাদ আপনাকে পরীক্ষা নিয়ে বুঝতে পারবেন যে, আপনার কী কী সমস্যা? তারপর সেই অনুপাতে আপনাকে পরামর্শ প্রদান করবে এবং সেই পরামর্শ মেনে চলুন একদিন আপনার কিতাবি ইসতিদাদ তৈরি হবে এবং কোনো ধরনের দুর্বলতা থাকবে না ইনশাআল্লাহ।

হতাশ হবেন না

নাহভীতির কারণে হতাশ হওয়ার কিছু নেই। উপরোল্লিখিত পদ্ধতিতে মেহনত জারি রাখলে ইনশাআল্লাহ অল্প সময়ের মধ্যে যাবতীয় দুর্বলতা কাটানো সম্ভব। কেননা আরবি ভাষা শেখার ক্ষেত্রে নাহবী কায়দা খুব বেশি প্রয়োজন এমনটি নয়। মৌলিক কিছু বিষয় শিখে নিলেই যথেষ্ঠ। নাহুর সুক্ষ সুক্ষ কায়দার পেছনে পড়ে সময় নষ্ট করার দরকার নেই। হ্যাঁ, কেউ যদি নাহু বিষয়ে শাস্ত্রীয় পণ্ডিত হতে চায় তাহলে তাকে দাওরার পরে এ বিষয়ে দক্ষ কোনো নাহুবিদের তত্ত্বাবধানে দীর্ঘকাল পর্যন্ত বিস্তৃত মুতালাআ জারি রাখতে হবে।

এক তালিবে ইলম আল কাউসার পত্রিকায় নিজের নাহু-সরফ ও তারকিব দুর্বলতার কথা জানিয়ে হতাশা ব্যক্ত করে একটি পত্র পাঠিয়েছিল। হজরত

মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক সাহেব হাফিজাহুল্লাহ তার উত্তরে যা লিখেছিলেন তা নিম্নরূপ-

"প্রতিদিন বিশ-পঁচিশ মিনিট করে 'আননাহবুল ওয়াজিহ' কিংবা 'আততরিক ইলান নাহব'-এর সাহায্যে নাহবি তামরিন করবেন এবং 'আততরিক ইলাছ সরফ' এর সাহায্যে ছরফি তামরিন করবেন। এই দু'বিষয়ের তামরিন ফলপ্রসূ হওয়ার জন্য যদি 'আততরিক ইলাল আরাবিয়্যাহ' এবং 'আততামরিনুল কিতাবী আলাত তরিক ইলাল আরাবিয়্যাহ' প্রয়োজন হয় তবে তা-ও সঙ্গে রাখবেন।

আপনার দরসের কোনো আরবি কিতাব থেকে প্রতিদিন তিন-চার লাইন খাতায় লিখবেন। এরপর চিন্তা-ভাবনা করে প্রয়োজনে 'নাহবেমির' ও 'ইলমুস সিগা' এর সাহায্য নিয়ে এই বাক্যগুলোর'নাহবি' ও 'সরফি' তাহকিক করবেন। ই'রাব লাগাবেন এবং বাংলায় তরজমা করবেন। এটাও তামরিনের একটি পদ্ধতি। দশ পনের দিন এভাবে মেহনত করে দেখুন। ইনশাআল্লাহ কিছু কিছু সুফল পেতে শুরু করবেন।"

এছাড়া কুরআন-হাদিসসহ যাবতীয় আরবি কিতাব পড়ার জন্য যে সকল নাহবি কায়দা বা আরবি ব্যাকরণ প্রয়োজন হয় সেগুলো শেখার উপর সীমাবদ্ধ রাখাই যথেষ্ঠ। মনে রাখতে হবে আমার নাহু শেখার উদ্দেশ্য হলো, আরবি ইবারত পড়ার ক্ষেত্রে ভুল–ভ্রান্তি থেকে বেঁচে থাকা। অতএব, এর জন্য যতটুকু দরকার ততুটুকুই যথেষ্ঠ। আর এক্ষেত্রে আরবি ব্যাকরণের সুক্ষ সুক্ষ বিষয় কোনো প্রয়োজন হয় না। প্রয়োজন হয় মৌলিক কিছু বিষয় মাত্র। নাহবি কাওয়ায়িদ বা আরবি ব্যাকরণ একদম না পড়েও আরবি ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জন করা যে সম্ভব তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমাদের সম্মুখে আজও উদ্দীপ্ত। এখন চমকপ্রদ একটি ঘটনা শুনুন।

মাওলানা মুহাম্মাদ আল হাসানি রহ. এর আরবি ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জনের রহস্য

মাওলানা মুহাম্মাদ আল হাসানি রহ. নাদওয়াতুল উলামা, ভারত থেকে প্রকাশিত البعث الإسلامي নামক মাসিক পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন। তিনি জন্মগ্রহণ করেন ১৩৫৩ হি. মোতাবেক ১৯৩৪ ঈ. সনে। আর ইন্তেকাল

করেন ১৩৯৯ হি. মোতাবেক ১৯৭৯ ঈ. সনে। তিনি বিংশ শতাব্দীর আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামিক চিন্তাবিদ, দেওবন্দি আলেম, বরেণ্য ঐতিহাসিক আরবি সাহিত্যিক, লেখক, পণ্ডিত ও বিশিষ্ট মুবাল্লিগ আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলি নাদাবি রহ. (জন্ম: ৫/১২/ ১৯১৩ঈ., মৃত্যু: ৩১/১২/১৯৯৯ ঈ.) এর ভাতিজা ছিলেন। তিনি ছিলেন শাব্দিক অর্থেই আরবি ভাষার একজন অতি উঁচু স্তরের প্রতিভাবান লেখক ও সাহিত্যিক। তিনি এমন চমৎকার, সাবলীল, সুমিষ্ট, সুদৃঢ় ও যথোপযুক্ত ভাষায় আরবি লিখতেন যে, মিসর, সিরিয়া ও বিশ্বের অন্যান্য আরব দেশের বড়ো বড়ো লেখকগণ পর্যন্ত তাঁর প্রতি ঈর্ষা করতেন। তিনি নাহু-সরফ এর কিছুই জানতেন না। কিন্তু একটি আদর্শ জুমলা থেকে অনেকগুলো জুমলা তৈরির অভিনব অনুশীলনের ফলে এবং লেখা ও অনুবাদ করার নিরবিচ্ছন্ন চর্চার বদৌলতে তাঁর রচনা ও প্রবন্ধসমূহ খাঁটি আরবদের নিকটও ঈর্ষান্বিত হত। কারণ, তাঁর লেখা অনেক সময় আরবের দক্ষ লেখকদের লেখাকেও ছাড়িয়ে যেত।

আল জামিয়াতুল ইসলামিয়া দারুল উলুম দেওবন্দ, ভারত এর উচ্চতর আরবি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের প্রধান মুশরিফ মাওলানা নুর আলম খলিল আমিনি রহ.[১] বলেন– আমি তাঁকে কয়েকবার জিজ্ঞেস করেছি, অনারবি দেশে

(১) আহ, এখানে 'দা. বা.' শব্দটি লিখেছিলাম। সম্পাদনার সময় তার পরিবর্তে 'রহ.' শব্দ লিখতেই হৃদয়টা মোচড় দিয়ে উঠল। কষ্টে যেন বুকটা ফেটে যায়। যখন লেখাটি লিখেছিলাম তখন হজরত মাওলানা নুর আলম খলিল আমিনি রহ. ছিলেন মাটির উপরে পৃথিবীর বুকে। কিন্তু আজ যখন লেখাটির সম্পাদনা করছি তখন তিনি এ ধরার বুকে নেই। চলে গেছেন দূরে, বহু দূরে; যেখানে সবাই যায়, মন না চাইলেও যেতে হয়; কিন্তু ফিরে আসে না কেউ, আসতে পারে না। ফেরার কোনো সুযোগ নেই। মাদানীনগর মাদরাসায় কিসমুল আদাবিল আরাবি-তে পড়াকালীন উসতাদে মুহতারাম মাওলানা সফিউল্লাহ ফুআদ হাফিজাহুল্লাহ ও মাওলানা ফারুকুযযামান হাফিজাহুল্লাহ এর নিকট তাঁর আলোচনা এত অধিক শুনেছি যে, তিনি যেন আমাদের কাছের কেউ, অতি কাছের। যেন আপন কেউ, আত্মার আত্মীয়। মনের অজান্তেই হৃদয়ের গভীরে তাঁর প্রতি ভালোবাসার বীজ অঙ্কুরিত হয়েছে। হৃদয়ের বড়ো তামান্না ছিল, তাঁকে এক নজর দেখব, দু'চোখ ভরে দেখব, তাঁর কিছুটা সান্নিধ্য লাভ করে ধন্য হব। আফসোস, সেই সৌভাগ্য আমার জীবনে আর এলো না! তার আগেই তিনি আমাদের সবাইকে এতিম করে না ফেরার দেশে পাড়ি দিলেন। হায়, জীবনে একটি বার, মাত্র একটি বারও যদি তাঁর দেখা পেতাম! আসমানের মালিকের দরবারে গোনাহগারের ফরিয়াদ, স্বপ্নযোগে

এ স্তরের আরবি শেখা আপনার পক্ষে কী করে সম্ভব হলো? তিনি বলেছেন, "এ ব্যাপারে আমি আমার বিদ্বান পিতা, নিষ্ঠাবান ডাক্তার, প্রজ্ঞাবান মুবাল্লিগ, ডক্টর সাইয়েদ আবদুল আলি হাসানি রহ. (১৩১১-১৩৮০ হি./১৮৯৩-১৯৬১ ঈ.) এর নিকট ঋণী। যখন থেকে পবিত্র কুরআন পড়া শিখেছি, তিনি কুরআন থেকে আমাকে আরবি শেখাতেন। তিনি আমাকে আয়াতের একটি শব্দ সরিয়ে দিয়ে তার স্থানে অন্য একটি শব্দ প্রয়োগ করার আদেশ করতেন। আমার সঙ্গে অনুরূপ আচরণ করেছেন আমার মহান পিতৃব্য, মুফাক্কিরে ইসলাম, মুবাল্লিগ, আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী হাসানি নাদাবি রহ.। তিনি আমার জন্য قصص النبيين للأطفال কিতাব রচনা করেছেন। ফলে আমার বয়স পনের হওয়ার আগ থেকেই আমি যথোপযুক্ত ভাষায় আরবি লিখতে শুরু করেছি।"

এ জন্যে মাওলানা নুর আলম খলিল আমিনি রহ. অত্যন্ত জোর দিয়ে বলেন– "প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের সবচেয়ে বেশি দরকার হলো, প্রাঞ্জল ও সাবলীল ভাষা লিখিত এক বা একাধিক কিতাব (قصص النبيين للأطفال) থেকে তাদেরকে প্রথমত مفردات শিখানো। তারপর এক একটি আদর্শ জুমলার আলোকে একাধিক জুমলা তৈরির অনুশীলন করানো। এভাবে শিক্ষার্থী যখন একটি জুমলা ভালোভাবে আয়ত্ব করে নিবে এবং তাকে স্বাধীনভাবে রূপান্তর করতে সক্ষম হবে, তখন তার সামনে অন্য একটি জুমলা পেশ করা হবে এবং ওই জুমলার অনুকরণ করতে তাকে আদেশ করা হবে। এভাবে অগ্রসর হতে থাকবে। এ কাজটি জুমলায়ে ইসমিয়া থেকে প্রথমে এবং তার কিছুদিন পর জুমলায়ে ফে'লিয়া থেকে হওয়া ভালো হবে।

শিক্ষার্থীরা যখন সহজ ছোট ছোট জুমলা তৈরি করতে সক্ষম হবে, তখন তাদেরকে বড়ো বড়ো জুমলা তৈরির দায়িত্ব দেওয়া হবে। তারপর ছোট অনুচ্ছেদ তৈরির কাজ দেওয়া হবে। এরপর বড়ো অনুচ্ছেদ। তারপর ছোট প্রবন্ধ। এরপর তুলনামূলক বড়ো প্রবন্ধ। তখন তাদেরকে একটি বিষয় দেওয়া হবে। বিষয়ের প্রয়োজনীয় অংশ উল্লেখ করা হবে। ওই বিষয়ে লেখার পদ্ধতি

হলেও যেন তাঁর একমুহূর্তের সাক্ষাত পাই এবং ...। প্রার্থনা করি, আল্লাহ যেন হজরতকে জান্নাতুল ফিরদাউস দান করেন। আমিন ইয়া রব্বাল আলামিন।

স্পষ্ট করা হবে। তারপর লিখতে বলা হবে। তখন লেখার পর যেসমস্ত ভুল তাদের থেকে প্রকাশ হবে, সেগুলো সংশোধন করা হবে।"(১)

আরবি সাহিত্যের কিতাব পড়ার নিয়ম

যেকোনো ফনের কিতাব শুধু মুতালাআ করলেই তা থেকে ইস্তিফাদা করা সম্ভব হলেও আরবি সাহিত্যের কিতাবাদির ক্ষেত্রে কিছুটা ব্যতিক্রম। আরবি সাহিত্যের কিতাব পড়ার ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু নিয়ম-নীতির প্রতি লক্ষ্য রাখতে হয়। নতুবা গতানুগতিক পাঠ করলে তা থেকে বিশেষ ফায়দা অর্জিত হবে না। সেই নিয়ম-নীতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসবে ইনশাআল্লাহ। তার আগে এখানে আরেকটি বিষয় আলোচনা করতে চাই। সেটি হলো, কীভাবে আরবি কিতাব দ্রুত পাঠ করতে পারব এবং তা বুঝতে পারব। দেখুন, আমরা যখন বাংলা ভাষার কোনো বই পড়ি তখন কিন্তু শুধু পড়ে যাই। অনুবাদের প্রয়োজন হয় না; বরং শুধু পড়া মাত্রই তা বুঝে ফেলি এবং এমনকি শিক্ষিত নয় এমন ব্যক্তিও(২) যখন কারো বাংলা পড়তে শোনে তখন সে কেবল শ্রবণ করা মাত্রই অতি সহজে বুঝতে পারে। এটি কীভাবে সম্ভব হয়েছে? এর একমাত্র উত্তর হলো, বাংলা ভাষা তার ভালোভাবে জানা আছে। প্রায় সকল বাংলা শব্দের অর্থই তার জানা আছে এবং কোন বাক্যের কী অর্থ, কোন শব্দ কোনটির সাথে মিললে কী অর্থ প্রদান করে, বাক্যের কাঠামো ইত্যাদি সম্পর্কে বেশ ভালো জ্ঞান আছে। আর এই জ্ঞান অর্জন করতে তাকে বিদেশী ভাষার তো কষ্ট পোহাতে হয় নি। কেননা মাতৃভাষা তো একজন মানুষ সেই ছোট্টবেলা থেকেই শিখতে থাকে। পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, শিশুরা ভাষা শিখে শুনে শুনে। শিশুরা মায়ের কাছে শোনে,

---

(১) আরবি ভাষা পাঠদান পদ্ধতি, পৃ: ১২৩-১২৫

(২) এখানে 'অশিক্ষিত' শব্দটি ব্যবহার না করে লেখা হয়েছে 'শিক্ষিত নয় এমন ব্যক্তি'। কারণ, 'অশিক্ষিত' শব্দের মধ্যে তুচ্ছতার ভাব রয়েছে। আল্লাহর সৃষ্টি কোনো মানুষের ক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করা সম্ভবত উচিত নয়। প্রতিটি মানুষই সম্মানিত এবং প্রত্যেকেরই কোনো না কোনো বিষয়ে কিছু না কিছু জ্ঞান অবশ্যই আছে, যে জ্ঞান হয়তো আমরা যাদেরকে শিক্ষিত মনে করি বা বলে থাকি তাদের মাঝে নেই। তো এই দৃষ্টিকোন থেকে প্রকৃতপক্ষে কোনো মানুষই অশিক্ষিত নয়। তো 'শিক্ষিত নয় এমন ব্যক্তি' কথাটি দ্বারা এখানে উদ্দেশ্য হলো এমন ব্যক্তি, যে প্রাতিষ্ঠানিক কোনো পড়ালেখা করে নি। ফলে সে বাংলায় পড়তে ও লিখতে সক্ষম নয়।

বাবার কাছে শোনে, দাদা-দাদী, নানা-নানী, চাচা-চাচী সহ আরো অনেকের কাছে শোনে শোনে ভাষা শিখে।

সেই শৈশব থেকে ভাষা শিখতেই থাকে। একটু বড়ো হলে বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে পড়ার মাধ্যমে শিখতে থাকে। মোট কথা, একজন বাঙ্গালী দীর্ঘকাল যাবত মাতৃভাষা শিখে বাংলা ভাষাটাকে এত গভীরভাবে আয়ত্ব করে ফেলেছে যে, এখন সে যেকোনো বিষয়ে বাংলা ভাষায় লিখিত যেকোনো লেখা সে কেবল পড়লেই বা শ্রবণ মাত্রই বুঝে ফেলে।

ঠিক তেমনি ভাবে যদি আমরা আরবি ভাষাটাকে গভীরভাবে আয়ত্ব করতে পারি তাহলে বাংলা ভাষার মতো আরবি ভাষায় লিখিত যেকোনো কিতাব পড়া মাত্রই বুঝতে সক্ষম হব। অনুবাদ করার প্রতি মুখাপেক্ষী হতে হবে না ইনশাআল্লাহ।

কিতাবি ইসতিদাদ অর্জনের জন্য আরবি ভাষার দক্ষতা আবশ্যক

অনুবাদ করার প্রয়োজনবোধ ব্যতীত কেবল আরবি ইবারত পড়া মাত্রই মর্ম উদ্ধার করার যোগ্যতা অর্জন করা কিতাবি ইসতিদাদ অর্জনের জন্য আবশ্যক এবং এতটুকু যোগ্যতা করা প্রত্যেকের জন্য আবশ্যক। যে যেই ফন বা শাস্ত্রেই দক্ষ হতে চায় তাকে সর্ব প্রথম এই স্তরের যোগ্যতা অর্জন করতে হবে এবং এটা গভীরভাবে অর্জন করতে হবে। ভাসা ভাসা করে শিখলে চলবে না।

মনে করুন, আপনি ফিকহ-ফতোয়া পড়বেন। তো ব্যাপারটা যদি এমন হয় যে, ইফতা বিভাগে ভর্তি হয়ে বা ফিকহের কিতাব অধ্যয়ন করার সময় বারবার হোচট খেতে হচ্ছে। যেমন, ইবারত সঠিকভাবে পড়তে পারছেন না। অনুবাদ ও মর্ম গভীরভাবে উদ্ধার করতে সক্ষম হচ্ছেন না। এক পৃষ্ঠা পড়তে গেলে অসংখ্য অপরিচিত শব্দ আপনার চোখের সামনে ভেসে ওঠে, যেগুলোর অর্থ আপনার একদম জানা নেই। আর অভিধান খুলে অর্থ বের করতে করতে সারাদিন ব্যয় হয়ে যায় তাহলে দেখা যাবে যে, সারাদিন হয়তো চার-পাঁচ পৃষ্ঠা মুতালাআ করা সম্ভব হবে। তবুও অস্পষ্টভাবে, তাহলে আপনি কীভাবে ফিকহ বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করবেন? এরকম সমস্যা শত শত তালিবুল ইলমদের মাঝে আছে।

তদ্রূপ ইলমুল হাদিস বা ইলমুত তাফসির বিষয়ে যারা দক্ষতা অর্জন করতে চায় তাদের ক্ষেত্রেও একই কথা। সকলের জন্যই আরবি ভাষায় দক্ষতা অর্জন করা আবশ্যক। কারণ, তাফসির, হাদিস ও ফিকহের উৎস পর্যায়ের কিতাবগুলো আরবি ভাষায়ই লিখিত। যেমন তাফসিরের কয়েকটি কিতাব, তাফসিরে ইবনে কাসির, জামিয়ুল বায়ান লিততবারি, তাফসিরুত তবারি, মাআলিমুত তানজিল, আদদুররুল মানসুর লিসসুয়ুতি, মাদারিকুন তানযিল লিননাসাফি, রুহুল মাআনি, আহকামুল কুরআন, আল জামি লিআহকামিল কুরআন, তাফসিরু আয়াতিল কুরআন, আল কাশশাফ ইত্যাদি।

হাদিসের কিছু কিতাব যেমন: মুসান্নাফু আবদির রাজ্জাক, মুসনাদুল ইমাম আহমাদ, মুসানাদুশ শাফেয়ি, আততবাকতুল কুবরা, মুসান্নাফু ইবনে আবি শাইবা, আততবাকাত, সুনানুদ দারিমি, কিতাবুল আসার লিততহাবি, সহিহ ইবনে খুজাইমা, সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম, সুনানুত তিরমিজি, সুনানুন নাসাঈ, সুনানু আবি দাউদ, আল মুনতাকা, মুসনাদে আবি ইয়ালা, সহিহ ইবনে হিব্বান, মুসতাদরাকে হাকেম, সুনানে দারাকুতনি, আসসুনানুল কুবরা ওয়াস সুগরা ইত্যাদি।

মোটকথা উপরোল্লিখিত তাফসির ও হাদিসের কিতাবগুলো আরবি ভাষায় লিখিত। তো এগুলো পড়তে হলে অবশ্যই মজবুতভাবে আরবি ভাষা আয়ত্ব করতে হবে।

এখন প্রশ্ন হলো, এই স্তরের যোগ্যতা অর্জন করার পদ্ধতি কী? নিম্নে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

আরবি ভাষার কিতাব পাঠ করার পাঁচটি পদ্ধতি

যেকোনো আরবি কিতাব পড়ার সাথে সাথেই অনুবাদ করার প্রয়োজনবোধ ছাড়া গভীরভাবে ভাব ও মর্ম উপলব্ধি করার যোগ্যতাই মূলত কিতাবি যোগ্যতা। এই স্তরের কিতাবি যোগ্যতা অর্জন করতে হলে আরবি ভাষার কিতাব পড়ার ক্ষেত্রে পাঁচটি পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। এখন সেই পাঁচটি পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

প্রথম পদ্ধতি

যেকোনো আরবি কিতাব নির্বাচন করে সেখান থেকে একটি পৃষ্ঠা পড়ার জন্য বেছে নিতে হবে। তারপর প্রথমে ওই ইবারত পড়ে ফেলবে। এই প্রথমবার পড়ার ক্ষেত্রে অর্থের প্রতি মনোনিবেশ করার প্রয়োজন নেই। এমনকি ইবারত পড়া শুদ্ধ হচ্ছে নাকি ভুল হচ্ছে? ভুল হলে কোন ধরনের ভুল? নাহবি ভুল নাকি সরফি ভুল এসব কোনো কিছু ভাবার দরকার নেই। শুধু ইবারতটুকু পড়ে যাবে। হ্যাঁ, যদি কোনো শিক্ষার্থী প্রথমেই সঠিক ভাবে ইবারত পড়তে সক্ষম হয় এবং অর্থও বুঝে তবে তো সোনায় সোহাগা।

নমুনাস্বরূপ নিম্নে একটি আরবি ইবারত তুলে দেয়া হলো-

لا ريب في أنك تعرف هذا النجم المتألق من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل في أمة الإسلام أحد لا يعرف أبا هريرة؟ لقد كان الناس يدعونه في الجاهلية "عبد شمس"، فلمّا أكرمه الله بالإسلام وشرّفه بلقاء النبي عليه الصلاة والسلام قال له: ما اسمك؟ فقال "عبد شمس"، فقال عليه الصلاة والسلام: بل عبد الرحمن. فقال: نعم عبد الرحمن، بأبي أنت وأمي يا رسول الله! أما تكنيته بأبي هريرة فسببها أنه كانت له في طفولته هرة صغيرة يلعب بها، فجعل لداته ينادونه: أبا هريرية. وشاع ذلك وذاع حتى غلب على اسمه. فلما اتصل أسبابه بأسباب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه جعل يناديه كثيرا بأبي هريرة إيناسا له وتحببا، فصار يؤثر أبا هر على أبي هريرة ويقول: ناداني بها حبيبي رسول الله. والهر ذكر، والهريرة أنثى، والذكر خير من الأنثى. أسلم أبو هريرة على يد الطفيل بن عمرو الدوسيّ، وظل في أرض قومه "دوس" إلى ما بعد الهجرة بست سنين حيث وفد مع جموع من قومه على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وقد انقطع الفتى الدوسيّ لخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبته، فاتخذ المسجد مقاما، والنبيَّ معلما وإماما، إذ لم يكن له في حياة

النبي صلى الله عليه وسلم زوج ولا ولد، وإنما كانت له أم عجوز أصرّت على الشرك؛ فكان لا يفتأ يدعوها إلى الإسلام إشفاقا عليها وبرّا بها، فتنفر منه ونصده. فيتركها والحزن عليها يفري فؤاده فريا. وفي ذات يوم دعاها إلى الإيمان بالله ورسوله، فقالت في النبي عليه الصلاة والسلام قولا أحزنه وأمضه. فمضى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبكي. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما يبكيك يا أبا هريرة؟ فقال: إني كنت لا أفتر عن دعوة أمي إلى الإسلام، فتأبى عليّ. وقد دعوتها اليوم فأسمعتْني فيك ما أكره. فادع الله جل وعز أن يميل قلب أم أبي هريرة للإسلام. فدعا لها النبي صلوات الله وسلامه عليه. (صور من صياة الصحابة وروائع القصص الأدبية للدكتور عبد الرحمن الباشا، تحقيق، تعليق وتدريب: محمد عبد الأول عفا الله عنه).

প্রথমত ভুল-শুদ্ধ ও অর্থের প্রতি খেয়াল না করে শুধু উল্লিখিত ইবারতটি পড়ুন।

দ্বিতীয় পদ্ধতি

এবার দ্বিতীয়বারের মতো উল্লিখিত ইবারতটি পুনরায় পড়তে হবে। তবে এবার পড়ার সাথে সাথে অনুবাদ করবে এবং সাধ্য অনুযায়ী শুদ্ধ পড়ার চেষ্টা করবে। নাহবি ও সরফি জাতীয় কোনো ভুল যেন না হয় সেদিকে খেয়াল রাখবে। আর যেসকল শব্দের অর্থ জানা নেই সেগুলোর নিচে পেন্সিল দিয়ে চিহ্নিত করে রাখবে।

লক্ষ্য করুন, উপরোল্লিখিত ইবারতের মধ্যে বেশ কিছু শব্দের নিচে দাগ দেয়া হয়েছে। এসকল শব্দের অর্থগুলো তাৎক্ষণিক অভিধান থেকে বের করবেন না; বরং ইবারত পড়া শেষে অভিধান খুলে শব্দগুলোর অর্থ বের করে খাতায় লিখে ফেলবেন। এখানে একটা কথা মনে রাখা দরকার যে, আমরা অনেক সময় কিতাব পড়ার সময় কঠিন শব্দের সম্মুখীন হলে শব্দের অর্থ বের করে ইবারতটির অনুবাদ জেনে নিই। ওই শব্দের অর্থটা খাতায় লিখে রাখি না। ফলে ইবারত পড়ার সময় ওই শব্দার্থটি মনে থাকলেও পরবর্তীতে ভুলে

যাই। আর ভুলে যাওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। এজন্য উচিত হলো, পড়ার সময় একটি খাতা ও কলম সাথে রাখা। কঠিন শব্দের অর্থ যেটি অনেক কষ্ট করে অভিধান খুলে বের করা হয়েছে সেটি লিখে রাখা। এতে শব্দার্থ মুখস্ত হয়ে যাবে। পরবর্তীতে ভুলে গেলে এই খাতাটি একবার দেখে নিলেই যথেষ্ট হবে। আবার পাশাপাশি লেখার চর্চাও হয়ে যাবে।

যাই হোক, নিচে উল্লিখিত ইবারতের কঠিন শব্দগুলোর অর্থ উল্লেখ করা হলো–

তারকা	النجم	ভালোবেসে	تحببا
উজ্জ্বল	المتألق	প্রাধান্য দেয়	يؤثر
ধন্য করেছে	شرّف	নিবেদিত হয়েছে	انقطع له
আমার মাতা-পিতার জীবন উৎসর্গিত হোক	بأبي أنت وأمي	অনড়/সংকল্প থেকেছে	أصرّتْ على
উপনাম দেয়া	التكنية به	তার প্রতি স্নেহ স্বরূপ	إشفاقا عليها
শৈশব	الطفولة	তার সাথে সুন্দর আচরণস্বরূপ	برّا بها
তার সমবয়সীরা	لداته	বাধা দেয়, প্রতিরোধ করে	تصده
তারা তাকে ডাকাডাকি করে	ينادونه	বিদীর্ণ করে	يفري
ছড়িয়ে পড়েছে	شاع	ব্যথিত করেছে	أحزن
প্রচার হয়েছে	ذاع	যন্ত্রণা দিয়েছে, কষ্ট দিয়েছে	وأمض
তার প্রতি স্নেহস্বরূপ	إيناسا له	বিরত থাকি না	لا أفترعن

তৃতীয় পদ্ধতি

যেহেতু কঠিন শব্দের অর্থ অভিধান থেকে বের করা হয়েছে তাহলে নিশ্চয় এবার শিক্ষার্থীর জন্য ইবারতটির অনুবাদ করা অত্যন্ত সহজ হবে। অতএব, এখন পুনরায় ওই ইবারতটি পড়বে এবং সেই শব্দার্থগুলোর সাহায্যে অনুবাদ করবে। এই অনুবাদটি যেন শাব্দিক অনুবাদ হয়। কারণ শাব্দিক অনুবাদের মাধ্যমে জুমলার তারকিব ও প্রতিটি শব্দের প্রকৃত অর্থ বোঝা যায়।

চতুর্থ পদ্ধতি

এবার ইবারতটি পুনরায় পড়বে। তবে এখন আর মুখে অনুবাদ করবে না; বরং শুধু ইবারত পড়বে। আর অনুবাদ মনে মনে ভাববে। যেহেতু ইতোপূর্বে তিনবার ইবারত পড়া হয়েছে। তার মধ্যে দুইবার অনুবাদ করা হয়েছে। অতএব, এখন অনুবাদ না করলেও শুধু ইবারত পড়ার দ্বারাই অনুবাদ স্মৃতিতে ভেসে উঠবে।

পঞ্চম পদ্ধতি

ইবারতটি যেহেতু চারবার পড়া হয়েছে সেহেতু এখন আর সেই ইবারতে কোনো ধরনের অস্পষ্টতা অবশিষ্ট থাকার কথা না। অতএব, পঞ্চমবারের মত ইবারতটি আগের তুলনায় এমনভাবে দ্রুত পড়বে যেন স্মৃতিতে অনুবাদটি চলে আসে।

এই হলো মোট পাঁচ পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে নিয়মিত মেহনত করলে আশা করা যায় ধীরে ধীরে এই স্তরের যোগ্যতা অর্জন হয়ে যাবে যে, পৃথিবীর যেকোনো শাস্ত্রের যেকোনো কিতাব যেকোনো স্থান থেকে খুলে দিলেই তা দ্রুত বিশুদ্ধভাবে কেবল ইবারত পড়ার দ্বারাই বুঝতে সক্ষম হবে। অনুবাদ করার প্রয়োজন হবে না ইনশাআল্লাহ। যেমন, বাংলা বই পড়ার ক্ষেত্রে আমরা যেকোনো বাংলা বই যেকোনো জায়গা থেকে শুধু পড়ার দ্বারাই তার মর্ম বুঝে ফেলি। আরবি ভাষার ক্ষেত্রেও এমনটি হবে ইনশাআল্লাহ। তবে শর্ত হলো, উপরোল্লিখিত পাঁচটি পদ্ধতি অনুসরণ করে দৈনিক অব্যাহত মেহনত করতে হবে। অনেক বড়ো ইবারত পড়তে হবে তা জরুরি নয়। প্রতিদিন অন্তত চার-পাঁচ লাইন যেন এই পাঁচ পদ্ধতির অনুসরণে পড়া হয়।

অনুবাদ সম্পর্কে কিছু কথা

উপরে আরবি ইবারত পড়ে দ্রুত বোঝার উপায় সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। এখন অনুবাদ সম্পর্কে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

অনুবাদের পরিচয়

কোনো ভাব বা মর্ম এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় রূপান্তরিত করাকে অনুবাদ বলা হয়। আরবি ছাড়াও বিভিন্ন বিদেশী ভাষা হতে বাংলায় অনুবাদ করা যায় এবং বাংলা থেকেও অন্য ভাষায় অনুবাদ করা সম্ভব। তাই এক কথায় অনুবাদ হলো ভাষান্তর। এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় নিয়ে যাওয়া। কিন্তু এই নিয়ে যাওয়ার বিষয়টি সব ক্ষেত্রে সহজ নয়। কোনো বিষয়কে রূপান্তরিত করতে হলে উভয় ভাষার গঠনকৌশল, রীতি, প্রভৃতি সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। প্রত্যেক ভাষারই নিজস্ব গঠনরীতি, প্রকাশভঙ্গি ও বৈশিষ্ট্য আছে। অনুবাদে সেই বৈশিষ্ট্যেও যথাযথ প্রতিফলন দরকার। মোটকথা, অনুবাদে মূল মর্মটি কিছুতেই বিকৃত করা যাবে না। অনুবাদ হলো এক ধরনের শিল্প। অনুবাদ কর্মে যদি ভাষায় মুন্সিয়ানা আর মূলের রূপ, রস, স্বাদ ও সৌন্দর্য অক্ষুণ্ন থাকে তবে অনায়াসে তা শিল্পকে ছুঁয়ে যেতে পারে।

অনুবাদের মূল লক্ষ্য

অনুবাদের মূল লক্ষ্য হলো, অন্য ভাষার বক্তব্য, ভাব, মর্ম ও বিষয়বস্তু আরেক ভাষায় রূপান্তর করা। যদিও আরবি ভাষার অবিকল রূপান্তর যেমন বাংলা ভাষায় সম্ভব নয়, তেমনি বাংলা ভাষার হুবহু প্রতিরূপ আরবিতে ফুটিয়ে তোলা কঠিন কাজ। তারপরও যথাসম্ভব শব্দ ব্যবহার করে অনুবাদের মাধ্যমে মূল বক্তব্য তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়। তবে এক ভাষার শব্দের স্থলে অন্য ভাষার শব্দ বসিয়ে দিলেই অনুবাদ হয়ে যায় না। সুন্দর ও যথার্থ অনুবাদ করতে হলে সেই ভাষার গতিময়তা, গঠনরীতি, পদবিন্যাস ও বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারে সম্যক জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

অনুবাদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

অনুবাদ একটি সৃজনশীল কর্ম। ভাষা ও সাহিত্যেও পূর্বাপর উৎকর্ষ সাধনে অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। বিশ্বের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর ভাষা যেমন বিভিন্ন রকম তেমনি তাদের সাহিত্যও স্বমহিমায় ভাস্বর। বিভিন্ন ভাষায়

সাহিত্য, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও চিকিৎসা শাস্ত্রে লিখিত মূল্যবান বক্তব্য সর্বজনীন করার একটি উৎকৃষ্ট মাধ্যম হচ্ছে ভাষান্তর বা অনুবাদ। আরবি ভাষার পাশাপাশি অন্যান্য ভাষাতেও অনুবাদ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। কেননা, অন্য ভাষাতেও অনেক নতুন ও সমৃদ্ধ চিন্তা-চেতনা থাকে যা আমাদের ভাষার জন্য অপরিহার্য। তথ্যপ্রবাহকে অব্যাহত, সমৃদ্ধ ও যুগোপযোগী করার জন্য অনুবাদের গুরুত্ব অপরিসীম।

অনুবাদের প্রকারভেদ

অনুবাদ মূলত দুই প্রকার:

১. আক্ষরিক অনুবাদ।

২. ভাবানুবাদ।

আক্ষরিক অনুবাদের পরিচয়

মূল ভাষার প্রত্যেকটি শব্দের প্রতিশব্দ ব্যবহার করে যে অনুবাদ করা হয় তাকে আক্ষরিক অনুবাদ বলে। অথবা এটাকে এভাবেও বলা যায়, এক ভাষার শব্দের পরিবর্তে অন্য ভাষার শব্দ ব্যবহার করে অনুবাদ করাকে কিংবা যে অনুবাদে মূল ভাষার শব্দের অর্থের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে মূল অংশকে অনুসরণ করে ভাষান্তর করা হয় তাকে আক্ষরিক ও শাব্দিক অনুবাদ বলা হয়।

আক্ষরিক অনুবাদ মূলানুগ হয়ে থাকে। আক্ষরিক অনুবাদে ভাষার সৌন্দর্যের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয় না। এধরনের অনুবাদ প্রায় ক্ষেত্রেই কৃত্রিম ও লৌকিকতাপূর্ণ হয়ে থাকে। সাবলীল ও প্রাঞ্জল হয় না বলে এই অনুবাদ অনেক ক্ষেত্রে পরিহার করা হয়। তবে দলিল, বিজ্ঞান ও আইন বিষয়ের অনুবাদ অনেক সময় আক্ষরিক হয়ে থাকে।

ভাবানুবাদের পরিচয়

মূল ভাষার ভাব যথাযথ রেখে অপর ভাষার প্রয়োজনীয় শব্দে যে অনুবাদ করা হয় তাকে ভাবানুবাদ বলে। ভাবানুবাদের ক্ষেত্রে নিজের ভাষার রীতি অনুযায়ী স্বাধীনভাবে অনুবাদ করা হয়। এধরনের অনুবাদ মূলানুগ হয় না। কিন্তু সাবলীল, প্রাঞ্জল ও সুখপাঠ্য এবং হৃদয়গ্রাহী হয়ে থাকে। আক্ষরিক অনুবাদ মর্ম

উপলব্ধির ক্ষেত্রে বাধা হয় বলে সাহিত্যের অনুবাদ সাধারণত ভাবানুবাদ হয়ে থাকে। অনুবাদের ক্ষেত্রে আভাবনুবাদই শ্রেষ্ঠ বলে সর্বজন স্বীকৃত ও সমাদৃত।

অনুবাদ করার ক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয়সমূহ:

অনুবাদ মানে এক ভাষার শব্দের বদলে অন্য ভাষায় শব্দ সাজানো নয়; বরং মূল ভাব বা বক্তব্য অন্য ভাষায় প্রকাশ করা। তাই অনুবাদের সময় নিম্নোল্লিখিত কয়েকটি প্রধান দিকের প্রতি লক্ষ রাখা দরকার:

- অনুবাদের অংশটি বারবার পড়ে ভেতরের ভাবটুকু ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে।
- মূল বাক্যে যে ক্রিয়া থাকে অনুবাদেও সেই ক্রিয়াপদ অবশিষ্ট রাখতে হবে।
- একটি কথা সব সময় মনে রাখতে হবে, প্রত্যেক ভাষার নিজস্ব ব্যাকরণ, ব্যবহারনীতি, বাগধারা, রচনাশৈলী, বিন্যাস, অবকাঠামো রয়েছে। যে ভাষায় আমরা অনুবাদ করব সে ভাষার এই নিয়ম-নীতিগুলো অবশ্যই আমাদের অনুসরণ করতে হবে।
- কঠিন ভাষা এড়িয়ে সহজ, সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় অনুবাদ করা উচিত।
- ভাষার সৌন্দর্য রক্ষার জন্যে মূলের বড়ো বাক্যকে ভেঙে ছোট ছোট করে অনুবাদ করা উচিত।
- দুর্বোধ্য শব্দ বা বাক্যাংশের অনুবাদ করতে অসুবিধে হলে মূল বক্তব্য ও বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সম্ভাব্য কাছাকাছি বাংলা শব্দ ব্যবহার করতে হবে। অনুবাদ সম্ভব না হলে দুর্বোধ্য শব্দ বা বাক্যাংশটুকু হুবহু ব্যবহার করা যেতে পারে।
- অনুবাদ করার সময় বাক্যের ভাবের প্রতি লক্ষ রাখতে হবে।
- শব্দ ধরে অনুবাদ না করে বাক্য ধরে অনুবাদ করা চাই।
- ভাষার সৌন্দর্য ও রস অক্ষুণ্ন রেখে অনুবাদ করতে হবে।
- মূল অংশের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উক্তি অনুবাদের ক্ষেত্রেও একইভাবে রূপান্তরিত হবে।

- মূল রচনার ভাষারীতি অনুবাদেও প্রতিফলিত হওয়া দরকার।
- মূল ভাষার নামগুলো ওই ভাষার নাম রূপেই অনুবাদ করতে হবে।
- অনুবাদের সময় কোনো বাক্যের ব্যাখ্যা করা অপ্রয়োজনীয়। ভাষার চেয়ে ভাবের দিকে লক্ষ্য রাখা অধিক জরুরি।
- ব্যক্তি ও স্থান জাতীয় শব্দের অনুবাদ হয় না। এ ধরনের শব্দ হুবহু উল্লেখ করতে হয়।
- মূল পাঠে ব্যবহৃত শব্দের একাধিক অর্থ থাকলে অনুবাদে অধিকতর গ্রহণযোগ্য শব্দ বেছে নিতে হয়।
- অনুবাদ এক ধরনের শিল্প। এর ভাব ও ভাষায় সামঞ্জস্য থাকতে হবে।
- অনুবাদের একটি প্রধান স্বতঃসিদ্ধ মূলনীতি হলো, অনুবাদ শব্দে শব্দে নয়, বরং বাক্যে বাক্যে হতে হবে। অর্থাৎ, কোনো বাক্যের অন্তর্গত শব্দসমূহের অর্থ শব্দে শব্দে ও আভিধানিকভাবে না করে উক্ত বাক্যের মূল বক্তব্যকে আমাদের ব্যবহারিক ভাষা ও বাকরীতিতে যেভাবে ব্যক্ত করা হয় সেভাবে ব্যক্ত করতে হবে। এটাকে ভাবার্থ বা ব্যবহারিক অনুবাদ বলা যেতে পারে। এ নীতির সারকথা হলো, শুধু অভিধান নয়, বরং যে ভাষায় অনুবাদ করবে সে ভাষার ব্যবহারকেই মূলত সামনে রেখে অনুবাদ করতে হবে। অনুবাদের সময় ভাষার দিক যতটা নজর দিতে হবে, তার চেয়ে বেশি নজর দিতে হবে ভাবের দিকে।

এরূপ ব্যবহারিক ও পারিভাষিক অর্থ করতে গিয়ে অনুবাদে বেশ কিছু পরিবর্তন আসতে পারে। যেমন:

(ক) ব্যবহারিক অনুবাদে মূল ইবারতের কিছু কিছু শব্দের অর্থ বাহ্যত বাদ পড়তে পারে। যেমন:

جلست جلسة القاري বাক্যের শাব্দিক অনুবাদ হলো, আমি ক্বারী সাহেবের বসার মতো বসেছি। আর এর ব্যবহারিক অর্থ হলো, আমি ক্বারী সাহেবের মতো বসেছি। এখানে ব্যবহারিক অর্থে বাহ্যত جلسة শব্দের অর্থ বাদ পড়েছে।

(খ) মূল ইবারতের কিছু কিছু কথা বা শব্দ অনুবাদে আগপিছ হতে পারে। যেমন: كلوا واشربوا এই বাক্যের শাব্দিক অর্থ হলো, তোমরা আহার করো ও পান করো। আর এর ব্যবহারিক অর্থ হলো, তোমরা পানাহার করো। এখানে আগপিছ হয়েছে। কেননা, আমাদের ব্যবহারে আহার ও পান শব্দ দু'টোই একসাথে বলার সময় প্রথমে 'পান' তারপর 'আহার' শব্দটি ব্যক্ত করা হয়েছে।

একটি কথা প্রচলিত আছে যে, অনুবাদ বা তরজমা একসঙ্গে বিশ্বস্ত ও সুন্দর হয় না। হয় তা বিশ্বস্ত বা মূলানুগ হয় অথবা সুন্দর হয়। যিনি সাহিত্যের তরজমা করেন, তাকে কিন্তু বিশ্বস্ত এবং সৌন্দর্য দু'দিকেই সমান নজর রাখতে হয়। তার তরজমা হবে পুষ্পিত-স্বচ্ছন্দ এবং সাবলীল।

সেটা হবে যদি তার তরজমার ভাষাটা স্বাভাবিক বাগভঙ্গিমা ও প্রকাশরীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। অনেক ক্ষেত্রেই কিন্তু তা হয় না। তার একটা বড়ো কারণ এই যে, অনেক ক্ষেত্রেই যে তরজমা আমরা করি তা একেবারেই আক্ষরিক তরজমা। আক্ষরিক তরজমায় আরবি ভাষার বাগভঙ্গিমা ও প্রকাশরীতির বিশেষ পরিবর্তন ঘটে না। শুধু আরবি শব্দগুলো নিজ ভাষায় পরিবর্তন হয় মাত্র।

আরবি থেকে বাংলায় অনুবাদের নিয়মাবলি

আরবি ভাষা বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষা। এই ভাষার নিজস্ব সাহিত্য অত্যন্ত সমৃদ্ধ। আরবি ভাষা থেকে বাংলায় অনুবাদ কর্ম শেখা বাংলাভাষী তালিবুল ইলমদের জন্য একান্ত অপরিহার্য একটি বিষয়। এর জন্য আরবি থেকে বাংলায় অনুবাদ করার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত নিয়মাবলি অনুসরণ করা অত্যন্ত জরুরি:

- আরবি সাহিত্য সংশ্লিষ্ট অনুবাদে সাহিত্যেও নানা প্রকার মতবাদ সম্পর্কে ধারণা রাখা উচিত।
- আরবি ভাষার শব্দভাণ্ডার সম্বন্ধে সম্যক ধারণা রাখতে হবে।
- যেই বিষয়ের কিতাব থেকে অনুবাদ করা হবে সেই বিষয় সম্পর্কে যথেষ্ঠ ধারণা থাকতে হবে।

- আরবি প্রবাদ-প্রবচনের অর্থ জানা থাকতে হবে এবং এসব ক্ষেত্রে আক্ষরিক অনুবাদ না করে মূল ভাব অনুযায়ী বাংলায় প্রকাশিত ভাবের সঙ্গে তুলনামূলক বাক্যে প্রতিস্থাপন করতে হবে।

- আরবি জটিল বাক্যকে ভেঙে ছোট ছোট সরল বাক্যে অনুবাদ করলে ভাষা সহজ ও শ্রুতিমধুর হয়।

- আরবি অনেক শব্দের আক্ষরিক বাংলা অনুবাদ সম্ভব নয়। এমন ক্ষেত্রে ভাবানুবাদ করা ছাড়া উপায় থাকে না। তাই এক্ষেত্রে মূল মর্ম ঠিক রেখে ভাবানুবাদ করতে হবে।

- আরবি ভাষার গঠনগত বিভিন্নতার সঙ্গে সম্যক ধারণা রাখতে হবে। এক্ষেত্রে আন্তরিকতা ও বস্তুনিষ্ঠতা বজায় রাখতে হবে। নতুবা অনুবাদ হবে যান্ত্রিক বা বিকৃত।

- অনুবাদ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সামাজিক, রাজনৈতিক, ভৌগলিক এবং ঐতিহাসিক পটভূমি সম্বন্ধে ধারণা থাকাও অত্যাবশ্যক। তাহলে অনুবাদ মূলানুগ হবে না।

- বাংলা অনুবাদে যেন সাধু ও চলিত রীতির মিশ্রণ না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হয়।

- বাংলা অনুবাদের ভাষা যেন কৃত্রিম বা আড়ষ্ট না হয়। বাংলা ভাষার মাধুর্যতা, সরলতা, স্পষ্টতা, সাবলীলতা ইত্যাদি যেন বজায় থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। যেমন:

أعلم الرجل الذي مات أمس هو أخو صديقي شاهد এই বাক্যের দু'ধরনের অনুবাদ হতে পারে। আরষ্ট অনুবাদ ও সাবলীল অনুবাদ।

আড়ষ্ট অনুবাদঃ আমি ওই লোকটিকে জানি, যিনি গতকাল মারা গেছেন, তিনি আমার বন্ধু শাহেদের ভাই।

সাবলীল অনুবাদঃ গতকাল যিনি মারা গেছেন তাকে আমি চিনি। তিনি আমার বন্ধু শাহেদের ভাই।

- আরবি বাগধারা বা প্রবাদ-প্রবচন অনুবাদের সময় উপযুক্ত বাংলা বাগধারা বা প্রবাদ-প্রবচন ব্যবহার করা উচিত। যেমন: একটি দৃষ্টান্ত এমন হতে পারে যে, النحو في الكلام كالملح في الطعام অথবা النحو أم العلوم والصرف أبوها বাংলায় এর অনুবাদ "ভাষায় নাহু তেমন, খাবারে লবন যেমন"। অথবা "নাহু হলো সমস্ত জ্ঞানের মা, আর সরফ হলো তার বাবা" করার চেয়ে এভাবে অনুবাদ করলে অধিক সুন্দর ও মানানসই হবে, "যে জানে না ব্যাকরণ তার বিদ্যা অকারণ।"

  আরেকটি উদাহরণ লক্ষ্য করুন, كما تدين تدان বাংলায় এর সমার্থক প্রবচন হলো, "যেমন কুকুর তেমন মুগুর।" আরো সুন্দর অনুবাদ হলো, "যেমন কর্ম তেমন ফল।"

  অনুরূপ, يمطر كأفواه القرب এর সুন্দর অনুবাদ হলো, "মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে।" পক্ষান্তরে এর অনুবাদ যদি কেউ এভাবে করে যে, "বৃষ্টি হচ্ছে মশকের মুখের ন্যায়" তাহলে তার অনুবাদটা সুন্দর, সাবলীল ও গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে না।

- কঠিন ভাষা এড়িয়ে সহজ, সরল ও প্রাঞ্জল বাংলায় অনুবাদ করা উচিত।

- আরবি ভাষায় লিখিত ব্যক্তি, স্থান জাতীয় শব্দের অনুবাদ হয় না। এ ধরনের শব্দ হুবহু বাংলাতেই উল্লেখ করতে হয়।

- আরবি থেকে বাংলা অনুবাদে যেন আরবির ছাপ না থাকে সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। তাহলে অনুবাদ হবে আরো বিশুদ্ধ ও আরো মানসম্পন্ন।

- অনুবাদ করার সময় মূল ভাষার শব্দগুলোর যেমন অনুবাদ করতে হয় তেমনি মূল ভাষার বিন্যাস, কাঠামো, বাগধারা, বাকশৈলীর অনুবাদ করতে হয়। এজন্য প্রয়োজনীয় পরিবর্তন, পরিবর্ধন, পরিমার্জনও করা যেতে পারে।

- আরবি ভাষায় সাধারণত বাক্য হয় বড়ো বড়ো, আর বাংলায় বাক্য হয় ছোট ছোট। তাই একটি আরবি বাক্যের অনুবাদ বাংলায় দুই/তিন বাক্যে হতে পারে।

- আরবিতে প্রথমে فعل বা ক্রিয়া, তারপর فاعل বা কর্তা আসে। কিন্তু বাংলা অনুবাদের ক্ষেত্রে যে বিষয়টির কোনো পরিবর্তন হবে না তা হলো, প্রথমে فاعل বা কর্তার তরজমা আসে। আর সবার শেষে فعل বা ক্রিয়ার তরজমা করতে হয়। এ দুয়ের মাঝে অন্যান্য বস্তুর তরজমা করতে হবে। যেমন:

  يلعب خالد بكرة القدم বাক্যের অনুবাদ হলো, "খালেদ ফুটবল দিয়ে খেলছে।" تعلب خديجة بالزهرة এ বাক্যের অনুবাদ হলো, "খাদিজা ফুল দিয়ে খেলছে।" লক্ষ্য করুন, উভয় বাক্যের তরজমায় প্রথমে فاعل তারপর متعلق সবশেষে فعل এর তরজমা করা হয়েছে। এখানে যদি আরবি শব্দের ধারাবাহিকতার দিকে লক্ষ্য রেখে হুবহু অনুবাদ করা হয়। অর্থাৎ আরবিতে প্রথমে এসেছে فعل তারপর এসেছে فاعل তারপর এসেছে متعلق। অনুবাদের ক্ষেত্রে যদি ওই তারতিব অনুযায়ী এভাবে অনুবাদ করা হয় যে, "খেলছে রাশেদ ফুটবল দিয়ে" তাহলে অনুবাদটা সাবলীল ও প্রাঞ্জল হবে না; বরং শ্রুতিকটু হবে।

- বাংলা ভাষায় বহুবচনের দ্বিত্বব্যবহার পরিহার করতে হবে। অর্থাৎ আরবিতে পর পর দুটি বহুবচনসূচক শব্দ ব্যবহার হয়; কিন্তু বাংলায় এরূপ সম্ভব নয়। যেমন, سقطت الأزهار الكثيرة এখানে আরবিতে الأزهار নিজেই একটি বহুবচনসূচক শব্দ, আবার الكثيرة শব্দটিও বহুবচনসূচক শব্দ। এর অনুবাদ "অনেক ফুলগুলো/ফুলসমূহ পড়ে গেছে" এমন হবে না। কেননা "অনেক" শব্দটিও বহুবচনসূচক, আবার 'গুলো' শব্দটিও বহুবচন বাচক, এতে বহুবচনের দ্বিত্ব ব্যবহার হয়ে যায়। তাই উল্লিখিত বাক্যটির বিশুদ্ধ অনুবাদ হবে, 'অনেক ফুল পড়ে গেছে'।

- একটি গুরুত্বপূর্ণ ও লক্ষণীয় বিষয় হলো, বাংলা ভাষায় বিষয়টিকে কীভাবে উপস্থাপন করা হয় সে সম্পর্কে পূর্ণ ধারণা রাখা জরুরি। যেমন- يصح أولاد الفقراء وهم لا يأكلون إلا الخبز والبصل এই বাক্যের অনুবাদ

হলো, "দরিদ্র লোকদের সন্তানরা সামান্য নুন-ভাত খেয়ে সুস্থ থাকে"। এখানে الخبز والبصل শব্দ এসেছে আরবদের নিম্নমানের খাবার হিসেবে। আমাদের বাংলাদেশের নিম্নমানের খাবার যেহেতু নুন-ভাত। তাই 'নুন-ভাত' অনুবাদ করা হয়েছে। এখানে যদি শাব্দিক অর্থ অর্থাৎ 'রুটি ও পেঁয়াজ' দিয়ে অনুবাদ করা হত তাহলে মর্ম উদ্ধার হত না এবং অনুবাদ সুন্দর ও সঠিক হত না।



অনুবাদের বাক্য কাঠামোতে মূল ভাষার তুলনায় বেশ পরিবর্তন হতে পারে। যেমন: شهدت مدينة ديوبند حفلة এই বাক্যের অনুবাদ হলো- "দেওবন্দে একটি মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে"। এখানে مدينة শব্দটি ছিল ফায়েল। কিন্তু অনুবাদ হয়েছে ظرف এর। حفلة শব্দটি ছিল মাফউল। কিন্তু তা অনুবাদে ফায়েলে পরিবর্তিত হয়েছে।

- আরবি ভাষায় كان একটি বহু ব্যবহৃত শব্দ। একটি অনুচ্ছেদে একটু পরপরই كان ... كان আসলে আমরা كان এর অনুবাদ বারবার 'ছিল' না করে বাক্যকে তার স্বাভাবিক গতিতে রাখতে পারি। যেমন:

  كان الصيف وكانت الشمس ساطعة زرقاء এই বাক্যের অনুবাদ এভাবে করা যেতে পারে- "সময় ঠিক গ্রীষ্মকাল। নীল আকাশে প্রখর সূর্য"। এখানে আমরা যদি অনুবাদ করতাম, "সময়টি ছিল গ্রীষ্মকাল, নীল আকাশে প্রখর সূর্য ছিল" তাহলে অনুবাদটি শ্রুতিমধুর হত না; বরং অনুবাদে এক নিষ্প্রাণ ভাব চলে আসত। অনুরূপ كان الله غفورا رحيما এর অনুবাদ হবে, "আল্লাহ তাআলা অতি দয়ালু ও ক্ষমাশীল।"

- অনুবাদের ক্ষেত্রে লক্ষণীয়, বাক্যের শুরু অংশে 'যখন' আনলে শেষাংশে 'তখন' আনতে হয়। যেমন:

  أنزل الله المطر لما دعوا واثقين بالإجابة বাক্যটির অনুবাদ হলো, যখন তারা দুআ কবুলে আস্থাশীল হয়ে দুআ করল তখন আল্লাহ তাআলা বৃষ্টি বর্ষণ করলেন।

- কখনও কখনও সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য বাক্যের শুরু অংশের অনুবাদ শেষে করা হয়, আর শেষের অংশের অনুবাদ শুরুতে করা হয়। বাক্য বড়ো হলে শেষ দিক থেকে তরজমা শুরু করলে তরজমা সহজ ও সাবলীল এবং পরিভাষা অনুযায়ী হয়। জুমলায়ে ফেলিয়া হলে ফায়েলকে সবার আগে উল্লেখ করবে আর জুমালায়ে ইসমিয়া হলে মুবতাদা এর তরজমা করে শেষের দিকে চলে যাবে এবং ধীরে ধীরে শেষ দিক থেকে তরজমা করতে করতে শুরুর দিকে আসবে। যেমন-

وإنه يتصف بصفة خلقية خاصة من أمانة ونشاط في العمل وأداء مسؤولية واجبة

"সে সততা, কাজে প্রফুল্লতা এবং দায়িত্ব পালন ইত্যাদি বিশেষ নৈতিক গুণে গুণান্বিত।" এখানে লক্ষ্য করুন, صفة خلقية خاصة এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে من بيانية এর মাধ্যমে। এজন্য من এর পর থেকে অনুবাদ শুরু করা হয়েছে। আরেকটি উদাহরণ দেখুন-

العيوب التي يقع فيها التلاميذ في إنشائهم "ছাত্ররা তাদের প্রবন্ধ রচনায় যেসব ভুল-ক্রটিতে লিপ্ত হয়।"

- جمله فعليه এর অনুবাদ করার সময় মনে রাখতে হবে ফেয়েল এর অনুবাদ সবার পরে হবে। কিন্তু এ নিয়মটিও قاعده كليه নয়। অর্থাৎ সব জায়গায় এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে না। যদি جمله فعليه তে مفعول به টি إنّ، أنّ দ্বারা শুরু হয়, তাহলে প্রথমে ফেয়েল-ফায়েলের অনুবাদ করতে হবে, তারপর مفعول به এর অনুবাদ ভিন্নভাবে করবে। আর অধিকাংশ জায়গায় বাংলায় إنّ، أنّ এর অনুবাদ হয় "যে"। আমরা জানি, إنّ، أنّ এর তরজমা হলো "অবশ্যই, নিশ্চই"। কিন্তু এই অনুবাদ খুব কম হয়।

একটি বাক্য লক্ষ্য করুন-

ما كنت أحسب أن إنسانا مثقّفا مثلك يفعل هكذا এর অনুবাদ হবে, "আমি ধারণা করতাম না যে, তোমার মতো একজন শিক্ষিত মানুষ এমনটি করবে।" আরেকটি উদাহরণ দেখুন-

علم مندوب الأهرام أنه تقرر... অর্থ: "আহরাম পত্রিকার প্রতিনিধি অবগত হয়েছে যে, সিদ্ধান্ত হয়েছে..."। এখানে ফেয়েল-ফায়েল এর তরজমা আগে করা হয়েছে। أنه تقرر এর অনুবাদ পরে করা হয়েছে। এটি مفعول به হয়েছে। এই নিয়ম অনুবাদের ক্ষেত্রে সবসময় মনে রাখতে হবে এবং এ নিয়ম অনুযায়ী جمله فعليه এর অনুবাদ করবে।

- এদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, কোনো বাক্য যেন ফায়েল বা কর্তা ছাড়া না হয়।

একটি ভুল ধারণা

আরবি থেকে বাংলা ভাষায় অনুবাদের ক্ষেত্রে আমাদের একটি ভুল ধারণা হলো, একপৃষ্ঠা আরবির অনুবাদ করলে বাংলায় দু'পৃষ্ঠা হয়ে যায়। এ ধারণাটি সম্পূর্ণ ভুল ও ভিত্তিহীন। শাব্দিক ও আক্ষরিক অনুবাদ থেকে আমাদের এ প্রবণতা সৃষ্টি হয়েছে। অনেকের ধারণা, অনুবাদ শব্দে শব্দে করতে হবে। কোনো শব্দ বাদ দেয়া যাবে না। ব্যাকরণভিত্তিক ও পারিভাষিক অনুবাদ থেকে দূরে সরে পড়ার কারণে এবং অপ্রয়োজনীয় বাহুল্য শব্দবৃদ্ধি করার কারণে আমাদের মাঝে এ মানসিকতা সৃষ্টি হয়েছে।

এক পৃষ্ঠা আরবির বাংলা অনুবাদ দুই পৃষ্ঠা হবে তা জরুরি নয়; বরং তা নির্ভর করবে ভাষা ও বিষয়বস্তুর উপর। অনেক সময় কম বেশি হতে পারে। আবার সমানও হতে পারে। সবসময় এক হতে হবে তা নয়। কখনো এমনও হতে পারে যে, দুই লাইন আরবির তরজমা এক লাইনেই হচ্ছে। আবার এমনও হতে পারে যে, এক লাইন আরবির তরজমা দুই লাইনে করতে হচ্ছে।

প্রত্যেক ভাষার রয়েছে নিজস্ব প্রকাশভঙ্গি

অনুবাদ প্রসঙ্গে মাওলানা সফিউল্লাহ ফুআদ হাফি. তাঁর লিখিত 'কাইফা নাতায়াল্লামুল ইনশা (৩য় খণ্ড)' কিতাবে লিখেছেন- "প্রত্যেক ভাষার নিজস্ব

প্রকাশভঙ্গি আছে। কোনো ভাষায় কোনো ভাব প্রকাশ করার সময় সেই ভাষার নিজস্ব প্রকাশভঙ্গিতে যদি প্রকাশ করা হয়, তখনই উক্ত প্রকাশ গ্রহণযোগ্য হয়। তাই তুমি যে ভাষা থেকে অনুবাদ করবে এবং যে ভাষায় অনুবাদ করবে, উভয় ভাষায় তোমাকে পারদর্শী হতে হবে। অনুরূপভাবে যে ভাষায় অনুবাদ করবে সে ভাষায় পারদর্শী না হলে, গ্রহণযোগ্য প্রকাশভঙ্গিতে অনুবাদ করতে অক্ষম হবে।

মোটকথা, যে ভাষা থেকে তুমি অনুবাদ করবে এবং যে ভাষায় অনুবাদ করবে, উভয় ভাষা তোমার ভালোভাবে চর্চা করতে হবে। যেন তোমার অনুবাদে লেখকের ভাব অক্ষুণ্ন থাকে এবং তোমার অনুবাদ দেখে পাঠকের যেন একথা মনেই না হয় যে, তা কোনো অনুবাদ। হ্যাঁ, সেই অনুবাদই আদর্শ অনুবাদ, যার মধ্যে মূলের সকল বক্তব্য এমন প্রকাশভঙ্গিতে উপস্থাপিত হয় যে, তা যে অনুবাদ, পড়ার সময় পাঠকের তা মনেই হয় না।

আর বাংলাভাষা চর্চা অব্যাহত রাখো আদীব হুজুর মাওলানা আবু তাহের মিসবাহ দা. বা.-এর সম্পাদনায় প্রকাশিত 'পুষ্প' সমগ্রের প্রথম ভলিয়মের ভূমিকার দিকনির্দেশনার আলোকে এর পাশাপাশি হুজুরের লিখিত 'এসো কলম মেরামত করি' বইটিও পড়ো। এভাবে আশা করি আরবী-বাংলা উভয় ভাষায় একটি গ্রহণযোগ্য স্তর অর্জন হবে। আল্লাহ তাওফিক দান করুন। আমিন!

আরবি ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় এবং বাংলা ভাষা থেকে আরবি ভাষায় অনূদিত আদর্শ কোনো অনুবাদ যদি মূলের সঙ্গে মিলিয়ে পড়তে পারো, তা দ্বারাও বেশ উপকৃত হবে ইনশাআল্লাহ।

القراءة الراشدة তৃতীয় খণ্ডে সাইয়েদ আবুল হাসান আলি নাদাবি রহ.- এর একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ আছে। من النجوم إلى الأرض শিরোণামে 'তারার মেলা থেকে পৃথিবীর দিকে' শিরোণামে প্রবন্ধটির আমার লেখা বাংলা অনুবাদ বের হয়েছে। অনুরূপভাবে আমার মুহতারাম উসতাদ মাওলানা হেমায়েত উদ্দীন ছাহেবের 'ইসলামী আকীদা ও ভ্রান্ত মতবাদ' বইয়ে মাওলানা মওদুদী সাহেবের চিন্তাধারার পর্যালোচনা বিষয়ক একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ আছে। الأستاذ المودودي وحزب "الجماعة الإسلامية": أفكار ونظريات শিরোণামে প্রবন্ধটির আমার লেখা আরবি অনুবাদ বের হয়েছে। সুযোগ হলে মিলিয়ে দেখতে পারো।"

আর আরবি থেকে বাংলায় অনুবাদ করা প্রসঙ্গে উপরোক্ত কিতাবে উল্লেখ আছে- "আরবি ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করার ক্ষেত্রে প্রথম করণীয় হলো আরবি অনুচ্ছেদটি যথাযথ বোঝা এবং বাংলায় অনুবাদ করে আরবি অনুচ্ছেদের সবগুলো কথা বাংলায় এসেছে কি-না, সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া।

দ্বিতীয় কর্তব্য হলো, কোনো বিষয়ে বাংলা ভাষায় লিখিত অনুচ্ছেদ যেসকল সূত্র ধরে সমালোচনা করে পড়া উচিত, নিজের বাংলা অনুবাদটিকে সেসকল সূত্র ধরে সমালোচকের দৃষ্টিতে পাঠ করে সম্পাদনা করা।

'এসো কলম মেরামত করি' বইয়ের একটি প্রবন্ধে আদীব হুজুর কোনো লেখার ভাষাগত সমালোচনার এই সূত্রগুলোর আলোচনা করেছেন-

(ক) শব্দপ্রয়োগ।

(খ) শব্দের স্থান-কাল-পাত্রের উপযোগিতা।

(গ) শব্দের সমশ্রেণিতা।

(ঘ) শব্দের অপচয়।

(ঙ) শব্দসংখ্যার ভারসাম্য।

(চ) ছন্দ ও সুরছন্দ।

তারপর লেখার কাঠামোগত সমালোচনার এই সূত্রগুলোর আলোচনা করেছেন:

(ক) অপ্রাসঙ্গিকতা।

(খ) পাঠকের অংশগ্রহণ।

(গ) রহস্যময়তা।

(ঘ) বহুমখিতা।

এসকল সূত্র ধরে অনুবাদ সম্পাদনা করার দ্বারা এক দিকে যেমন লেখাটি আরবি ভাষার প্রকাশভঙ্গির ছাপ থেকে মুক্ত হবে, অন্যদিকে তা আত্মপ্রকাশ লাভ করবে বাংলা ভাষার গ্রহণযোগ্য প্রকাশভঙ্গিতে এবং হবে অনেক সাহিত্যসমৃদ্ধ ও মানোত্তীর্ণ।

মোটকথা, অনুবাদ হতে হবে অনুদিত ভাষার গ্রহণযোগ্য প্রকাশভঙ্গিতে। মূলের প্রতিটি শব্দ ও বাক্যের আভিধানিক প্রতিশব্দ ও প্রতিবাক্য অনুবাদে আনার মোটেও প্রয়োজন নেই। উপরন্তু সেভাবে আনার চেষ্টা করার দ্বারা সাধারণত অনুবাদের মান নষ্ট হয়। তাই প্রথমে উভয় ভাষায় মৌলিক লেখার চর্চা করবে। পৃথকভাবে উভয় ভাষায় যথেষ্ট ভাষাদক্ষতা অর্জন করবে। পর্যাপ্ত পরিমাণ সমার্থক শব্দ, বিপরীত শব্দ, নির্বাচিত শব্দ, বাচনভঙ্গি, এককথায় প্রকাশ, বাগধারা, প্রবাদ-প্রবচন ইত্যাদি সংগ্রহপূর্বক প্রয়োগ করে নিজস্ব বানিয়ে নিবে। লেখার কলকব্জা ও কলাকৌশল সম্পর্কে অবগত হতে হবে, যেন শব্দের প্রতিশব্দ দেখার জন্য অভিধান খোলার প্রয়োজন না হয়। প্রতিশব্দ, প্রতিবাক্য ইত্যাদি যেন অনুবাদে স্বতঃস্ফূর্ত আসে। প্রথমে লেখক হও। তারপর অনুবাদক হও। সফল লেখক হওয়ার পূর্বে সফল অনুবাদক হওয়ার বৃথা চেষ্টা করো না।"

অনুবাদকে মানোত্তীর্ণ করার নমুনা

একটি জুমলার অনুবাদ বিভিন্ন পদ্ধতিতে করা যায়। আক্ষরিক অনুবাদ করা যায়। ভাবানুবাদ করা যায়। আবার ভাবানুবাদও বিভিন্ন কৌশলে করা যায়। একটি বাক্যের পিছনে যত সময় ব্যয় করা হবে এবং সুন্দর থেকে সুন্দরতম করা হবে অনুবাদটি তত বেশি মানসম্পন্ন হবে। হজরত মাওলানা আবু তাহের মিসবাহ দা. বা. এর তালিককৃত শায়খ আবুল হাসান আলি নাদাবি রহ. লিখিত 'কাসাসুননাবিয়্যিন লিল আলতফাল' কিতাবের শেষে আদীব হুজুর আদর্শ অনুবাদের কিছু উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন এবং একটি অনুবাদকে কত ভাবে করা যায়, কত সুন্দর থেকে সুন্দরতম করা যায় তার চমকপ্রদ কিছু নমুনা উল্লেখ করেছেন। সেখান থেকে নির্বাচিত কয়েকটি দৃষ্টান্ত নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

وكان يوسف غلاما جميلا، وكان يوسف ذكيا

বাক্য দু'টির শাব্দিক ও তারকিবানুগ তরজমা তো বোঝাই যায়। বাংলায় সুন্দর তরজমা হবে এই- 'আর ইউসুফ ছিলেন সুদর্শন ও বুদ্ধিমান বালক।'

'সুন্দর' -এর পরিবর্তে সুদর্শন শব্দটি নির্বাচন করা হয়েছে। কারণ এখানে বিশেষভাবে দৈহিক সৌন্দর্যের কথা বলাই উদ্দেশ্যে। পক্ষান্তরে সুন্দর হতে পারে অনেক দিক থেকে, দেহের, চরিত্রের, মনের এবং ...। আর সুদর্শন মানে

যা দেখতে সুন্দর। অবশ্য এখানে সুন্দর শব্দটিও চলবে। তরজমায় সংক্ষেপণ করা হয়েছে।

رأى أحد عشر كوكبا ورأى الشمس والقمر، كل يسجد له

বাক্যটির শাব্দিক তরজমা হলো, 'তিনি এগারটি তারা দেখলেন এবং সূর্য ও চাঁদ দেখলেন; প্রত্যেকে তাকে সিজদা করছে।'

কিছুটা সুন্দর তরজমা হলো, 'তিনি দেখলেন, এগারটি তারা এবং চাঁদ ও সূর্য প্রত্যেকে তাকে সিজদা করছে।'

এখানে একটি فعل কর্তন করা হয়েছে এবং عطف এর বিন্যাস পরিবর্তন করা হয়েছে। আরবিতে গ্রহণযোগ্য বিন্যাস হলো, 'الشمس والقمر'। বাংলায় গ্রহণযোগ্য বিন্যাস হলো, চাঁদ ও সূর্য বা চাঁদ-সূর্য।

আরো সুন্দর তরজমা– 'তিনি দেখেন কী! এগারটি তারা ও চাঁদ-সূর্য সবাই তাকে সিজদা করছে!'

এখানে বক্তব্যের পরিবেশে বিস্ময় রয়েছে, বাংলা তরজমায় সেটাই শব্দে তুলে আনা হয়েছে।

وكان يوسف ولدا صغيرا، فحكى الرؤيا لإخوته

প্রথম বাক্যটির উদ্দেশ্য হলো ইউসুফ আ. এর পক্ষে কৈফিয়ত পেশ করা। অর্থাৎ, পিতার উপদেশ ভুলে যাওয়াটা তার দোষ ছিল না; বরং অল্পবয়স্কতার স্বাভাবিক পরিণতি ছিল। এই কৈফিয়তের ভাবটি তুলে ধরার জন্য তরজমায় একটি শব্দ বাড়িয়ে বলতে হবে, 'ইউসুফ তো ছিলেন ছোট্ট ছেলে, তাই তিনি স্বপ্নের কথা ভাইদের বলে দিলেন।'

শব্দানুগ তরজমা হলো, তাই তিনি স্বপ্নটি ভাইদের কাছে বর্ণনা করলেন। কিন্তু এ তরজমা সুন্দর নয়, কারণ তাতে ঘটনার আসল অবস্থাটি ফুটে ওঠে না। 'বলে দিলেন' দ্বারা দুর্ঘটনার ভাব এবং বড়ো একটা ক্ষতি হয়ে যাওয়ার ভাব উঠে আসে, আর সেটাই ছিল প্রকৃত অবস্থা।

'কথা' শব্দটি যোগ করায় তরজমাটি সুন্দর হয়েছে।

ولا تسأل عن فرحهما وسرورهما

বাক্যটির শাব্দিক তরজমা, 'আর তুমি তাঁদের খুশি ও আনন্দ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করো না।'

এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে আনন্দের আধিক্য প্রকাশ করা। বাংলায় এক্ষেত্রে এ বাক্যটি ব্যবহৃত হয়, 'তখন তাদের খুশি ও আনন্দ দেখে কে! কিংবা 'তখন তাদের সেকি খুশি ও আনন্দ।'

'খুশি ও আনন্দ' এর বিকল্পরূপে 'আনন্দ-উচ্ছ্বাস' বলা যায়।[১]

আদর্শ অনুবাদের নমুনা

এখন আমি আরবি থেকে বাংলা অনুবাদের আদর্শ কিছু নমুনা পেশ করব ইনশাআল্লাহ। সাইয়েদ আবুল হাসান আলি নাদাবি রহ. এর লিখিত 'আল কিরাআতুর রাশেদা (৩য় খণ্ড)' থেকে একটি নস উল্লেখ করে তার অনুবাদ তুলে ধরছি-

النص العربي

درست في المدرسة أمس أن النور يقطع مائة ألف وستة وثمانين ميلا في ثانية، وأنه يمكن له أن يطوف حول خط الاستواء سبعة أشواط في أقل من ثانية. وسمعت أن من النجوم ما لا يصل ضوؤه إلا في ألفي عام، ومنها ما لا يصل ضوؤه إلا في أكثر من ذلك، وأن ضوء بعض النجوم منذ طلعت لا يزال في طريقه إلى الأرض ولما يصل إليها. لي غرام شديد بالتاريخ، لا أزال أطالعه برغبة عظيمة، وأتمثله أمام عيني، كأن الحوادث واقعة والأشخاص في ساعتها، ومن زيارة رجال من عظماء التاريخ في زمانهم. ولم أزل منذ صباي أقول لوالدي وأصدقائي: يا ليتني ولدت في الزمن الماضي، فشاهدت كذا وكذا من

(১) কাসাসুননাবিয়্যিন লিল আতফাল, ১ম খণ্ড, মাওলানা আবু তাহের মিসবাহ দা. বা. এর তালিককৃত, পরিশিষ্ট-৪, পৃ: ১১৯-১৪৬

الوقائع، وزرت فلانا وفلانا من الرجال. لقد غاب عني طوفان نوح ومحنة إبراهيم، وخروج بني إسرائيل. وسبقتني بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام بأكثر من ألف عام. وفاتني عهد وفاتني الراشدة، وفاتني حضارة بغداد وعهد قرطبة وغرناطة وفاتني وفاتني وفاتني. (الجزء الثالث من "القراءة الراشدة")

অনুবাদ

গতকাল আমি মাদরাসায় পড়লাম, আলো প্রতি সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল পথ অতিক্রম করে এবং এক সেকেণ্ডেরও কম সময়ে বিষুব রেখার চারপাশে সাতবার প্রদক্ষিণ করতে পারে। শুনেছি, এমন কিছু নক্ষত্র আছে যেগুলোর আলো পৃথিবীতে পৌঁছতে সময় লাগে দু'হাজার বছর এবং এমনও কিছু তারা আছে যেগুলোর আলো পৌঁছতে এর চেয়েও বেশী সময় লাগে; বরং কোনো কোনো তারা এমন, যেগুলোর আলো সৃষ্টির শুরুলগ্ন থেকে পৃথিবীর পথেই রয়ে গেছে। আজও পৌঁছায় নি। ইতিহাসের প্রতি আছে আমার বেশ অনুরাগ। সর্বদা প্রবল আগ্রহ নিয়ে আমি ইতিহাস পাঠ করি এবং চোখের সামনে তা চিত্রায়িত করি; যেন অতীতের ঘটনাবলি ঘটমান এবং চরিত্রগুলো জীবিত। ঘটনাবলি সমকালে প্রত্যক্ষ করতে না পারায় এবং ইতিহাসের মহাপুরুষদেরকে তাঁদের সময়ে দেখতে না পারায় আমার সবসময় আফসোস হয়। শৈশব থেকেই পিতা ও বন্ধু-বান্ধবদের বলে আসছি– আমি যদি অতীতকালে জন্মগ্রহণ করতাম তাহলে অমুক অমুক ঘটনা প্রত্যক্ষ করতাম এবং অমুক অমুক ব্যক্তিদেরকে দেখতাম। নুহের প্লাবন, ইবরাহীমের পরীক্ষা ও বনী ইসরাঈলের প্রস্থানের সময় আমি অনুপস্থিত ছিলাম। আমার জন্মের হাজার বছরেরও আগে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাবের ঘটনা ঘটেছে। খেলাফতে রাশেদা, বাগদাদ সভ্যতা, কর্ডোভা ও গ্রানাডার যুগ আমি পাই নি। আরো কত কী?[১]

বাংলা থেকে আরবিতে অনুবাদ করার ক্ষেত্রে করণীয়

উপরে আরবি থেকে বাংলায় অনুবাদ করার আলোচনা ও কিছু নমুনা উল্লেখ করা হয়েছে। এখন আলোচনা করা হবে বাংলা থেকে আরবিতে

---

(১) كيف نتعلم الإنشاء-৩ : মাওলানা সফিউল্লাহ ফুআদ হাফিজাহুল্লাহ।

অনুবাদ সম্পর্কে। এ প্রসঙ্গে মাওলানা সফিউল্লাহ ফুআদ হাফিজাহুল্লাহ এর 'কাইফা নাতায়াল্লামুল ইনশা (৩য় খণ্ড)' কিতাবে উল্লেখ আছে– "বাংলা ভাষা থেকে আরবি ভাষায় অনুবাদ করার ক্ষেত্রে প্রথম কর্তব্য হলো, আরবিতে অনুবাদ সম্পন্ন করে বাংলা অনুচ্ছেদের সবগুলো কথা আরবিতে এসেছে কি-না, সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া।

দ্বিতীয় করণীয় হলো, আরবি ভাষার বরেণ্য লেখকদের উন্নত সাহিত্যসম্পন্ন লেখা অধ্যয়ন করা। অনুবাদ সমাপ্ত করার পর চিন্তা করে দেখ, তোমার শব্দচয়ন যথাযথ হয়েছে কি-না, লেখার صلات الأفعال والمصادر সঠিক হয়েছে কি-না, تعبيرات বা বাচনভঙ্গিগুলো উন্নত কি-না, বড়োদের বিভিন্ন আদর্শ জুমলার قوالب-এর অনুকরণ তোমার তৈরি জুমলাগুলোতে যথেষ্ট কি-না, আরবি বাগধারা, আরবি প্রবাদ প্রবচন, সমার্থ ও বিপরীতার্থ প্রভৃতি ভাষাসম্পদে তোমার অনুবাদটি কী পরিমাণ সমৃদ্ধ, ইত্যাদি দিক সামনে রেখে লেখাটি মানসম্মত করার চেষ্টা করো। এভাবে সম্পাদনা করলে লেখাটি একদিকে যেমন বাংলা প্রকাশভঙ্গি থেকে মুক্ত হবে, অপরদিকে লেখাটির আরবি ভাষা ও সাহিত্যমানও উন্নত হবে ইনশাআল্লাহ।"

বাংলা থেকে আরবিতে আদর্শ অনুবাদের নমুনা

কাইফা নাতায়াল্লামুল ইনশা (৩য় খণ্ড) কিতাব থেকে বাংলা থেকে আরবিতে অনুবাদের আদর্শ একটি নমুনা এখানে তুলে ধরা হলো।

النص البنغالي

গাছের যে ডালে ফল ধরে সে ডাল ফল-ভারে ঝুঁকে অবনত থাকে। আর যে ডালে ফল নেই সে ডাল মাথা উঁচিয়ে থাকে। এটাই প্রকৃতির নিয়ম। এটাই চিরন্তন সত্য। মানবসমাজেও এই সত্যের প্রতিফলন দেখতে পাই। আমরা দেখতে পাই, যিনি যত বড়ো জ্ঞানী, যত বড়ো গুণী তিনি তত বেশি বিনয়ী। পক্ষান্তরে যার জ্ঞানের পরিধি যত সংকুচিত তার অহংকার তত বেশি স্ফীত। প্রকৃত জ্ঞান মানুষকে অন্তরচক্ষু খুলে দেয়। জ্ঞানসমুদ্রের বিশালতা তাকে হতবাক করে। নিজের জ্ঞানের ক্ষুদ্রতা তার সামনে প্রকাশিত হয়। ফলে সে বিনয়ে অবনত হয়। পক্ষান্তরে যার অন্তরচক্ষুর সামনে থাকে মূর্খতার আবরণ

সে জানে না জ্ঞানসমুদ্রের বিশালতার কথা। তাই সে অল্পতেই জ্ঞানের বড়াই করে। নিজেকে মহাজ্ঞানী ভেবে অহংকার করে। হে তালেবে ইলম! এবার নিজেকে এই আলোকে বিচার করো।

الترجمة العربية

إن غصن الشجرة الذي يثمر ينحني من ثقل الأثمار؛ والغصن الذي لا يثمر يظل رافعا رأسه، وهذا هو قانون الطبيعة، وهذه هي حقيقة خالدة، ونرى هذه الحقيقة تنعكس على المجتمع البشري أيضا؛ فمن ازداد علمه ومنقبته ازداد تواضعه وابتعاده عن التكبر. ومن جانب آخر فإن من ضاق علما انتفخ كبرا. إن العلم الحقيقي يكشف الغطاء عن فراسة الإنسان، فتدهشه سعة بحر العلم، وتتبين له قلة علمه، فينحني تواضعا. ومن جهة أخرى فإن من يحجب فراسته غطاء جهله لا يدري سعة بحر العلم، فيتفاخر بالعلم مع قلته، ويحسب نفسه عليما ويتكبر. فيا طالب العلم! حاسب نفسك الآن في ضوء ما قدمناه.

ভাষা ও সাহিত্য শেখার উদ্দেশ্যে আরবি সাহিত্যের কিতাব পড়ার নিয়ম

ইতিপূর্বে আরবি কিতাব পড়ার যে পাঁচটি পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলো অনুসরণ করে আরবি কিতাবাদি পড়লে কিতাবী ইসতিদাদ ও মৌলিক যোগ্যতা অর্জিত হবে ইনশাআল্লাহ। তবে ভাষা ও সাহিত্য অর্জন করতে চাইলে আরবি সাহিত্যের কিতাব শুধু গড়গড় করে পড়ে গেলে চলবে না; বরং এর জন্যও রয়েছে স্বতন্ত্র কিছু নিয়ম। নিম্নে সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

আরবি সাহিত্যের কিতাব ধীরে-সুস্থে পড়া

ভাষা ও সাহিত্য শিখতে হলে অন্যান্য আরবি কিতাবের মত আরবি সাহিত্যের কিতাব দ্রুত গতিতে শুধু পড়ে গেলে চলবে না। দ্রুত পড়ার মাধ্যমে তথ্য আহরণ করা গেলেও ভাষা ও সাহিত্য অর্জিত হয় না। এর জন্য প্রয়োজন

ধীর গতিতে পড়া। স্বাদ নিয়ে নিয়ে পড়া। প্রতিটি শব্দ ও বাক্যের পরতে পরতে সাহিত্যের যে স্বাদ লুকিয়ে আছে তা গভীরভাবে আস্বাদন করা । রচনা, প্রবন্ধ, নিবন্ধ ইত্যাদির লাইনের ফাঁকে ফাঁকে সাহিত্যের যে ঘ্রাণ নিহিত আছে তা গভীরভাবে অনুভব করা। গড়গড় করে দ্রুত পড়ে গেলে সাহিত্যের এই স্বাদ ও ঘ্রাণ কিছুতেই পাওয়া সম্ভব নয়। এজন্য আরবি সাহিত্যের কিতাবের প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি বাক্য, প্রতিটি লাইন পড়তে হবে ধীর গতিতে।

একটি লেখাকে পঞ্চাশ বার পড়া

আরবি সাহিত্যের যেকোনো লেখা বারবার পড়া। এক দুই বার পড়ার দ্বারা যদি কারো মুখস্তও হয়ে যায় তবুও তা যথেষ্ঠ নয়; বরং প্রত্যেকটি লাইন পঞ্চাশবার করে পড়তে হবে। পক্ষান্তরে কেউ যদি একটি লেখা পঞ্চাশবার পড়েও মুখস্ত করতে সক্ষম না হয় তবুও সে সফল।

পঞ্চাশবার পড়া যদি কারো পক্ষে সম্ভব না হয় ত্রিশ বার পড়বে। সেটাও যদি সম্ভব না হয় তাহলে অন্তত বিশ বার পড়বে। এটাও যদি সম্ভব না হয় তাহলে শিক্ষার্থীর মাঝে আরবি ভাষা ও সাহিত্য শেখার আগ্রহ নেই বললে ভুল হবে না।

মাওলানা নুর আলম খলিল আমিনি রহ. এর উক্তি

একটি লেখা বারবার পড়া সম্পর্কে মাওলানা সফিউল্লাহ ফুআদ হাফিজাহুল্লাহ 'আরবি ভাষা পাঠদান পদ্ধতি' কিতাবের ১১৮ নং পৃষ্ঠায় লিখেছেন, "আমাদের উসতাদ মাওলানা নুর আলম খলিল আমিনি দা. বা. বলতেন– بچاس مرتبہ پڑہ لو (পঞ্চাশ বার পড়ে নাও), چالیس مرتبہ پڑہ لو (চল্লিশবার পড়ে নাও) تیس مرتبہ پڑہ لو (ত্রিশবার পড়ে নাও), کم یی کم بیس ھي مرتبہ پڑہ لو (কমপেক্ষে বিশবার পড়ে নাও)। আমি উসতাদে মুহতারামকে কখনো বিশ বারের কম বলতে শুনিনি। কারো যদি দু'একবার পড়লেই মুখস্ত হয়ে যেত, তিনি বলতেন- না, উদ্দেশ্য অর্জিত হয়নি। এর বিপরীত অনেকবার পড়ার পরেও কারো যদি মুখস্ত না হতো, তিনি বলতেন– উদ্দেশ্য অর্জিত হয়ে গেছে। অর্থাৎ, তিনি মুখস্ত করার উপর জোর দিতেন না; বরং শব্দপ্রয়োগ, বাক্যকাঠামো ইত্যাদি দিক লক্ষ রেখে বারবার পড়ার প্রতি গুরুত্ব দিতেন।

উসতাদে মুহতারামের উপদেশের সমর্থক অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ একটি কথা আমার মনে এসেছে। তা হলো, উঁচু স্তরের সাহিত্যসমৃদ্ধ কোনো লেখা মুখস্ত করাও ভাষা ও সাহিত্য শেখার ক্ষেত্রে উপকারী হয় না, যদি মুখস্তকারী সেই লেখার শব্দাবলি ও বাক্যসমূহের অর্থ না জানে এবং সংশ্লিষ্ট দিকগুলোর প্রতি লক্ষ্য রেখে ধীরে-সুস্থে না পড়ে। এর যথার্থতার অকাট্য প্রমাণ হলো, পবিত্র কুরআন। দেখুন, পবিত্র কুরআন আরবি ভাষার সর্বাধিক বাগ্মিতাপূর্ণ গ্রন্থ। পৃথিবীতে তার লক্ষ লক্ষ হাফেজ থাকা সত্ত্বেও ক'জন এমন পাওয়া যাবে, যারা তা থেকে আরবি ভাষা ও সাহিত্য সংক্রান্ত কিছু শিখেছেন। এর কারণ এছাড়া আর কি বলা যেতে পারে যে, তাঁরা শুধু মুখস্ত করেছেন; অর্থ শিখেন নি। শিখলেও সংশ্লিষ্ট দিকগুলোর প্রতি লক্ষ রেখে প্রচুর পরিমাণে পড়েন নি। তাই সাহিত্যের ক্ষেত্রে উপকৃত হতে পারেন নি।

সত্য বলতে কি, জ্ঞানের পরিধি ব্যাপক করার জন্য তো পড়ার كمية তথা পরিমাণ বাড়াতে হয়। কিন্তু ভাষা শেখার জন্য 'পরিমাণ' বাড়ানোর তেমন প্রয়োজন নেই। ভাষা শেখার জন্য দরকার হলো, كيفية তথা, পড়ার 'মান' বাড়ানো।"

একটি লেখা বারবার পড়ার রহস্য কী

ভাষা ও সাহিত্য শেখার জন্য একটি লেখাকে বারবার পড়তে হয়। এর ভেতর নিশ্চয় কোনো না কোনো রহস্য লুকিয়ে আছে। আসুন আমরা সেই রহস্যগুলো এখন জেনে নিই–

- ভাষা বিজ্ঞানীদের গবেষণা হলো, একটি নতুন শব্দ বা বাক্যকে আপন করে নেয়ার জন্য ওই শব্দটিকে অন্তত ত্রিশ জায়গায় ব্যবহার করে অনুশীলন করতে হবে।
- একটি বাক্যকে বারবার পড়ার দ্বারা বাক্যটির কাঠামো ও বাক্যের মাঝে অবস্থিত শব্দগুলো অন্তরে বসে যায়। পরবর্তীতে কোনো মাকালা তথা প্রবন্ধ লেখার সময় কিংবা আরবিতে কথা বলার সময় স্মৃতির পাতায় সেই বাক্য ও বাক্যকাঠামোটি ভেসে ওঠে। ফলে নিজের লেখার ও কথার মাঝে অনায়াসেই সেই বাক্যটিকে উপযুক্ত পরিবর্তন ও পরিমার্জন করে ব্যবহার করা যায়।

- একটি বাক্যকে বারবার পড়ার দ্বারা ওই বাক্যের কাঠামোটি অবচেতনভাবে এমনভাবে আয়ত্ব হয়ে যায় যে, ওই বাক্যের অনুরূপ আরো একাধিক বাক্য গঠন করা যায় অতি সহজেই।
- একটি বাক্য দু'য়েকবার পড়ে তাৎক্ষণিক মুখস্ত করে ফেললেও পরবর্তীতে ওই বাক্যটি ভুলে যাবে। যথাস্থানে তা ব্যবহার করতে সক্ষম হবে না। পক্ষান্তরে একটি বাক্যকে পঁচিশবার, ত্রিশবার, পঞ্চাশ বার পড়ে তাৎক্ষণিক মুখস্ত না হলেও উপযুক্ত সময়ে বাক্যটি ঠিকই স্মৃতির পাতায় ভেসে উঠবে। কারণ বাক্যটি এত অধিক বার পড়ার দ্বারা অবচেতনভাবে মনের মাঝে গেঁথে গিয়েছে।

বাক্যকাঠামো খেয়াল করে পড়া

আরবি সাহিত্যের কিতাব পড়ার সময় أسلوب العرض তথা উপস্থাপনশৈলী, উপস্থাপনরীতির প্রতি লক্ষ্য রাখা চাই। অর্থাৎ প্রতিটি বাক্যের কাঠামোর প্রতি লক্ষ্য করতে হবে যে, কোনো মর্ম প্রকাশের জন্য বাক্যটি লেখক কীভাবে উপস্থাপন করেছেন। কোন শব্দ ব্যবহার করেছেন। কোন শব্দ আগে এনেছেন, আর কোন শব্দ পরে এনেছেন। এই মর্মটি যদি আমি ব্যক্ত করতাম তাহলে কীভাবে ব্যক্ত করতাম। নমুনাস্বরূপ নিম্নে ড. আবদুর রহমান রাফাত পাশা এর সুয়ারুম মিন হায়াতিস সাহাবা কিতাব থেকে হজরত আনাস বিন মালিক রা. এর জীবনীর কিছু অংশ তুলে ধরা হলো–

كان أنس بن مالك في عُمر الورد حين لقّنتْه أمه الغميصاء الشهادتين، وأترعتْ فؤادَه الغَضَّ بحب نبي الإسلام محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. فشُغف أنس به حبا على السماع. ولا غروَ، فالأذن تعشق قبل العين أحيانا. وكم تمنى الغلام الصغير أن يمضي إلى نبيه في مكة، أو يفد الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم عليهم يثرب ليسعد برؤياه، ويهنأ بلقاءه. لم يمض على ذلك طويل وقت حتى سرى في يثرب المحفوظة المغبوطة أن النبي صلوات الله وسلامه عليه وصاحبه الصديق في طريقهما

إليها فغمرتِ البهجة كل بيت، وملأتِ الفرحة كل قلب. وتعلقت العيون والقلوبِ بالطريق الميمون الذي يحمل خطا النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه إلى يثرب. وأخذ الفتيان يشيعون مع إشارقة كل صباح: أن محمدا قد جاء. فكان يسعى إليه أنس مع الساعين من الأولاد الصغار؛ لكنه لا يرى شيئا فيعود كثيرا محزونا. وفي ذات صباح شذي الأنداء، نضير الرواء، هتف رجال في يثرب: إن محمدا وصاحبه قريبان من المدينة. فطفق الرجال يتجهون نحو الطريق الميمون الذي يحمل إليهم نبي الهدى والخير. ومضوا يتسابقون إليه جماعات جماعات، تتخللهم أسراب من صغار الفتيان تزغرد على وجوههم فرحة تغمر قلوبهم الصغيرة، وتترع أفئدتهم الفتية. وكان في طليعة هؤلاء الصبية أنس بن مالك الأنصاري.

উপরোল্লিখিত গল্পটি পড়ুন। এখানে প্রতিটি বাক্যে সাহিত্যের ছোঁয়া রয়েছে। প্রতিটি লাইনের পরতে পরতে সাহিত্যের সুবাস লুকিয়ে আছে। প্রতিটি বাক্য পড়ুন এবং বাক্য কাঠামোর প্রতি চিন্তা করুন।

পড়ার সময় নতুন শব্দ ও تعبير চিহ্নিত করা ও পর্যাপ্ত অনুশীলন করা

আরবি সাহিত্যের কোনো গল্প, প্রবন্ধ-নিবন্ধ, ফিচার, দিনলিপি, ভ্রমণকাহিনি, উপন্যাস পড়ার সময় একটি পেন্সিল, কলম, ও ডায়েরি সাথে রাখতে হবে। যখনই কোনো নতুন শব্দ বা সুন্দর তাবির আসবে সাথে সাথে পেন্সিল দিয়ে ওই শব্দ বা তাবিরের নিচে দাগ দিয়ে চিহ্নিত করে রাখতে হবে। পাশাপাশি সেই শব্দ ও তাবীর ডায়েরিতে লিখে ফেলতে হবে এবং প্রত্যেকটি তাবির অন্তত পঁচিশবার করে পড়তে হবে এবং ওই শব্দ ও তাবির দিয়ে একাধিক বাক্য গঠন করে প্রচুর পরিমাণ মৌখিক ও লিখিত তামরিন করতে হবে।

নিচে নমুনাস্বরূপ সাইয়েদ আবুল হাসান আলি নাদাবি রহ. এর বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ ما ذا خسر العالم بانحطاط المسلمين কিতাব থেকে একটি লেখা পেশ করা হলো-

الإنسانية في الاحتضار

كان القرن السادس والسابع (لميلاد المسيح) من أحط أدوار التاريخ بلا خلاف، فكانت الإنسانية متدلية منحدرة منذ قرون، وما على وجه الأرض قوة تمسك بيدها وتمنعها من التردي، فقد زادتها الأيام سرعة في هبوطها وشدة في إسفافها، وكأنَّ الإنسان في هذا القرن قد نسي خالقه، فنسي نفسه ومصيره، وفقد رشده، وقوة التمييز بين الخير والشر، والحسن والقبيح، وقد خفتت دعوة الأنبياء من زمن، والمصابيح التي أوقدوها قد انطفأت من العواصف التي هبت بعدهم أو بقيت، ونورها ضعيف ضئيل لا ينير إلا بعض القلوب فضلا عن البيوت فضلا عن البلاد، وقد انسحب رجال الدين من ميدان الحياة، ولاذوا إلى الأديرة والكنائس والخلوات، فرارا بدينهم من الفتن وضنا بأنفسهم، أو رغبة إلى الدعة والسكوت، وفرارا من تكاليف الحياة وجدها، أو فشلا في كفاح الدين والسياسة والروح والمادة، ومن بقي منهم في تيار الحياة اصطلح مع الملوك وأهل الدنيا، وعاونهم على إثمهم وعدوانهم، وأكل أموال الناس بالباطل ... على حساب الضعفاء والمحكومين. وإن الإنسانية لا تشقى بتحول الحكم والسلطان والرفاهية والنعيم من فرد إلى فرد آخر من جنسه، أو من جماعة إلى جماعة أخرى مثلها في الجور والاستبداد وحكم الإنسان للإنسان، وإن هذا الكون لا يتفجع ولا يتألم فقط بانحطاط أمة أدركها الهرم وسرى فيها الوهن، وسقوط دولة تآكلت جذورها وتفككت أوصالها، بل بالعكس تقتضي ذلك

سنة الكون، وإن دموع الإنسان لأعز من أن تفيض كل يوم على ملك راحل وسلطان زائل، وإنه لفي غنى ، وإنه لفي شغل عن أن يندب من لم يعمل يوما لإسعاده ، ولم يكدح ساعة لصالحه ، وإن السماء والأرض لتقسوان كثيرا على هذه الحوادث التي تقع ووقعت كل يوم ووقعت ألوف المرات { كَمْ تَرَكُوا مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ{٢٥} وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ {٢٦} وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ{٢٧} كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْماً آخَرِينَ{٢٨} فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ }.

بل إن كثيرا من هؤلاء السلاطين والأمم كانوا كلا على ظهر الأرض، وويلا للنوع الإنساني وعذابا للأمم الصغيرة والضعيفة، ومنبع الفساد والمرض في جسم المجتمع البشري، يسري منه السم في أعصابه وعروقه، ويتعدى المرض إلى الجسم السليم فكان لا بد من عملية جراحية، وكان قطع هذا الجزء السقيم وإبعاده من الجسم السليم مظهرا كبيرا لربوبية رب العالمين ورحمته، يستوجب الحمد والامتنان من جميع أعضاء الأسرة الإنسانية، بل من جميع أفراد الكون { فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُواْ وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ }، ولكن لم يكن انحطاط المسلمين ووال دولتهم وركود ريحهم- وهم حملة رسالة الأنبياء، وهم للعالم البشري كالعافية للجسم الإنساني- انحطاط شعب أو عنصر أو قومية، فما أهون خطبه وما أخف وقعه، ولكنه انحطاط رسالة هي للمجتمع البشري كالروح، وانهيار دعامة قام عليها نظام الدين والدنيا .فهل كان انحطاط المسلمين واعتزالهم في الواقع مما يأسف له الإنسان في شرق الأرض وغربها ، وبعد قرون مضت على الحادث؟ وهل خسر العالم حقاً- وهو غني بالأمم والشعوب- بانحطاط هذه الأمة شيئا؟ وفيم كانت خسارته ورزيته؟ وماذا آل إليه أمر الدنيا، وماذا صارت إليه الأمم بعدما تولت قيادها الأمم الأوروبية

حتى خلفت المسلمين في النفوذ العالمي، وأسست دولة واسعة على أنقاض الدولة الإسلامية؟ وماذا أثر هذا التحول العظيم في قيادة الأمم وزعامة العالم في الدين والأخلاق والسياسة والحياة العامة وفي مصير الإنسانية ؟ وكيف يكون الحال لو نهض العالم الإسلامي من كبوته وصحا من غفوته ، وتملك زمام الحياة؟[1]

উপরোল্লিখিত মাকালার কঠিন শব্দগুলোর অর্থ নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

الكلمات الصعبة	المعاني	الكلمات الصعبة	المعاني
الهرم	বার্ধক্য	الاحتضار	অন্তিম অবস্থা
تآكل	একে অপরকে খেল	أحط	নিম্নতর
تفكّك	পরস্পর আলাদা হলো	أدوار (جمع "دور")	যুগ
أوصال (جمع "الوُصْلُ" و"الوِصْلُ")	অংশ	متدلية منحدرة	নিম্নমুখী
الكون	জগত	أمسك بالشيء	অবল
قسا (ن) قسوا	নিষ্ঠুর হলো	التردي	অধঃপতন
المقام الكريم	সুন্দর বাড়ি	الإسفاف	অবনতি
فاكه	আনন্দিত	المصير	পরিণাম

(১) ما ذا خسر العالم بانحطاط المسلمين للشيخ أبي الحسن علي الندوي رح পৃ: ৩৩-৩৫, (দারু ইবনিল জাওযি, কায়রো, মিশর)

সুপথ হারিয়েছে	فقد رشده	বোঝা	كَلّ
আওয়াজ দুর্বল হয়েছে	خفت الصوت (ن) خفتا	অস্ত্রোপচার	العملية الجراحية
দুর্বল	ضئيل	দাবী করল	استوجب
পিছিয়ে এলো	انسحب	কৃতজ্ঞতা	الامتنان
মঠ, আশ্রম	أديرة (جمع "الدير")	থেমে যাওয়া	الركود
কৃপণতা করা	ضنّ بالشيء	জাতি	العنصر
নম্রতা ও নিরবতা	الدعة والسكون	জাতীয়তা	القومية
জীবনের দায়িত্বভার ও আন্তরিক চেষ্টা	تكاليف الحياة وجدها	অবস্থা	الخطب
লড়াই, সংগ্রাম	الكفاح	গুণকীর্তন বর্ণনা করল	ندب (ن) ندبا
বস্তু	المادة	বড়ো বিপদ	الرزية
জীবনের স্রোত	تيّار الحياة	গড়িয়েছে	آل إلى
বিবেচনায়	على حساب	বিশ্বজনীন কর্তৃত্ব	النفوذ العالمي
বিলাসিতা	الرفاهية	ধ্বংসাবশেষ	أنقاض (جمع "النقض")
জুলুম	الجور	হোঁচট	الكبوة
স্বেচ্ছাচার	الاستبداد	তন্দ্রা	الغفوة

এবার উল্লিখিত শব্দার্থের সাহায্যে মাকালাটি পড়ুন এবং লক্ষ্য করুন যে, তাতে বেশ কিছু তাবির ও এমন কিছু বাক্যের নিচে দাগ দেয়া হয়েছে

যেগুলোর কাঠামো অনেক চমৎকার ও আয়ত্ব করার মতো। তো ওই তাবিরগুলো ডায়েরিতে নোট করে রাখুন। সেগুলো হলো-

- فقد زادتها الأيام سرعة في هبوطها وشدة في إسفافها
- قد انطفأت من العواصف
- فضلا عن البيوت فضلا عن البلاد
- إن دموع الإنسان لأعز من أن تفيض كل يوم على ملك راحل وسلطان زائل، وإنه لفي غنى ، وإنه لفي شغل عن أن يندب من لم يعمل يوما لإسعاده
- ولكن لم يكن انحطاط المسلمين ووال دولتهم وركود ريحهم- وهم حملة رسالة الأنبياء، وهم للعالم البشري كالعافية للجسم الإنساني- انحطاط شعب أو عنصر أو قومية،
- فما أهون خطبه وما أخف وقعه، ولكنه انحطاط رسالة هي للمجتمع البشري كالروح، وانهيار دعامة قام عليها نظام الدين والدنيا
- وهل خسر العالم حقا -وهو غني بالأمم والشعوب- بانحطاط هذه الأمة شيئا؟ وفيم كانت خسارته ورزيته
- وكيف يكون الحال لو نهض العالم الإسلامي من كبوته وصحا من غفوته، وتملك زمام الحياة

তো এখানে মোট আটটি তাবির নির্বাচিত করা হয়েছে। এগুলো দিয়ে পরবর্তীতে আরো অনেক বাক্য বানানোর তামরিন করতে হবে। তাহলে এই তাবির ও বাক্যকাঠামোগুলো আয়ত্বে এসে যাবে এবং কোনো মাকালা বা

প্রবন্ধ-নিবন্ধ, দিনলিপি লেখার সময় খুব সহজেই ব্যবহার করতে সক্ষম হব। তদ্রূপ বলার ক্ষেত্রেও এই তাবিরগুলো ব্যবহার করতে পারব।

এভাবে কোনো লেখা পাঠ করার সময় নতুন ও সুন্দর শব্দ, বাক্য ও তাবীর নির্বাচন করে নোট করে রেখে দিতে হবে এবং পরবর্তীতে তা দ্বারা তামরিন করতে হবে।



تعبير সম্পর্কে কিছু কথা

تعبير এর পরিচয়

এখানে প্রসঙ্গত বলতে চাই যে, تعبير শব্দটি দু'টি অর্থে ব্যবহৃত হয়:

(ক) বাগধারা। (খ) প্রকাশভঙ্গি।

কোনো শব্দ বা শব্দ সমষ্টি জুমলায় ব্যবহৃত হয়ে যখন ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে, তখন সেসকল শব্দ বা শব্দ সমষ্টিকে পরিভাষায় تعبير বা محاوره বলা হয়। যেমন- جاء من ساعته (তিনি তৎক্ষণাৎ এসেছেন)। 'প্রকাশভঙ্গি' অর্থে تعبير -এর উদাহরণ হলো, كنت على وضوء (আমার অজু ছিল/আমি অজু অবস্থায় ছিলাম)।

فعل ও مصدر-এর صله সমূহও تعبير এর অন্তর্ভূক্ত। নির্দিষ্ট অর্থ প্রকাশের জন্য فعل ও مصدر এর সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে যেসকল حرف الجر ব্যবহৃত হয়, সেসকল حرف الجر কে পরিভাষায় صله বলা হয়। যেমন- ذهب إلى[১]

(১) আরবি ভাষা পাঠদান পদ্ধতি, পৃ: ১১৭

تعبير এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

تعبير একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আল্লামা নুর আলম খলিল আমিনি রহ. تعبير এর প্রতি অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করতেন। তিনি বলতেন, "একটি বাক্য থেকে বিভিন্ন বাক্য তৈরি করার জন্য تعبير হলো মেরুদণ্ডের মতো। আরবি-বাংলা-উর্দু সব ভাষায়ই বেশি বেশি বাক্য সেই ব্যক্তি তৈরি করতে সক্ষম হবে, যে তাবির ভালো করে বুঝতে পারবে। তাবিরের মাধ্যমে বাক্যের বাচনভঙ্গি ও মার-প্যাঁচ ভালোভাবে জানা যায়।"

তাবিরের বিষয়গুলো ভালোভাবে অনুধাবন করতে সক্ষম হলে একটি তাবির ব্যবহার করে নিজের থেকে আরও অনেক জুমলা গঠন করা যায়। কিন্তু আমাদের সবচেয়ে বড়ো দুর্বলতা হলো কোনো تعبير দিয়ে নতুন নতুন বাক্য তৈরি করতে পারি না। যেকোনো ফেয়েল বা বাক্য থেকে তাবির নির্গত করতে হলে, প্রথমে তার মাসদারটি জানতে হবে। তারপর গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, ওই মাসদারের সিলাহ অর্থাৎ কোন সিলাহ-র মাধ্যমে মাসদারটি ব্যবহার হয় তা জানা। সিলাহ জানার জন্য অভিধানের সহযোগিতা গ্রহণ করতে হবে।

تعبير এর উপকারিতা

দক্ষ কোনো আরবি সাহিত্যিকের লেখা পাঠ করার সময় নির্বাচিত তাবির খাতায় বা ডায়েরিতে সংগ্রহ করে রাখা চাই এবং সেগুলো বারবার পড়ে আয়ত্ব করে নিবে। এরপর সেগুলো দিয়ে বাক্য রচনা করবে এবং রোজনামচা বা মাকালা লেখার সময় সেইসব তাবির নিজের লেখায় ব্যবহার করার চেষ্টা করবে। এভাবে মেহনত করতে থাকলে ধীরে ধীরে লেখার মান উত্তীর্ণ হবে ইনশাআল্লাহ।

تعبير সংক্রান্ত লিখিত কিছু কিতাবের তালিকা

আরবি ভাষার প্রাচীন গ্রন্থাবলি কিংবা সমকালীন আরবি সাহিত্য পড়তে গেলে যেসব বাগধারা পাঠকের চোখে পড়ে সেগুলো বোঝার জন্য রয়েছে অংসখ্য গ্রন্থ ও অভিধান। কুরআনে কারিম থেকে শুরু করে হাদিসের

গ্রন্থাবলিতে যেসব বাগধারা ব্যবহৃত হয়েছে তাফসির ও হাদিসের ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থাবলিতে সেসব বাগধারার অর্থ খুঁজে নেয়া যেতে পারে।

প্রাচীন ও সমকালীন আরবি সাহিত্যিকগণ তাদের রচনায় যেসব বাগধারা ব্যবহার করেছেন, সেগুলোর সিংহভাগই খুঁজে পাওয়া যাবে আরবি বাগধারার বিভিন্ন গ্রন্থ ও অভিধানের মধ্যে। তবে প্রাচীন গ্রন্থগুলোর মধ্যে সরাসরি 'বাগধারা' শব্দটির প্রকৃত অর্থ না পাওয়া গেলেও প্রবাদ-প্রবচন ইত্যাদি সংবলিত বেশ কিছু কাজ পাওয়া যাবে। যেমন-

١. المجازات النبوية لأبي الحسن محمد الرضي

٢. كتاب الأمثال للسدوسي

٣. مجمع الأمثال لأبي الفضل الميداني

٤. الفاخر لابن سلمة

٥. ثمار القلوب للإمام الثعلبي

٦. أساس البلاغة للزمخشري

এছাড়া বর্তমান সমকালীন আরবিতে ব্যবহৃত বাগধারার ওপরেও আরবি ভাষায় বেশ কিছু কাজ হয়েছে। যেমন-

١. التعبير الاصطلاحي للدكتور كريم حسام الدين

٢. معجم التعابير الاصطلاحية في العربية المعاصرة للدكتور محمد داود

٣. معجم التعابير الاصطلاحية في العربية المعاصرة للدكتور كامل فائد وفى

٤. التعبير الاصطلاحي في اللغة العربية للدكتور هدى فتحي

٥. التعبير الاصطلاحي: دراسة في تاصيل المصطلح ومفهومه ومجالاته الدلالية وانماطه التركية للدكتور ذكي حسام الدين

٦. قاموس أطلس للتعبيرات الاصطلاحية للدكتور فاطمة شرف

٧. الفريد في المصطلاحات الحديثية

আরবি সাহিত্য চর্চার জন্য নিয়মিত পড়া

আরবি সাহিত্য চর্চার জন্য পূর্বোল্লিখিত পদ্ধতির আলোকে আরবি সাহিত্যের কিতাব পাঠ করার পাশাপাশি ধারাবাহিকভাবে নিয়মিত বিভিন্ন সাহিত্যিকের লিখিত কিতাব পাঠ করে যেতে হবে। এই স্তরের পাঠের ক্ষেত্রে **كَمِّيَة** তথা পরিমাণই অধিক প্রাধান্য পাবে। এভাবে অব্যাহত ও ধারাবাহিক পাঠের মাধ্যমে আরবি কিতাব পড়ে বোঝার যোগ্যতা বৃদ্ধি হতে থাকবে। একই সঙ্গে লেখকের লেখার أسلوب আয়ত্ব হয়ে যাবে। আর পড়ার সময় অবশ্যই পেন্সিল সঙ্গে রাখবে। যখনই কোনো নতুন শব্দ বা তাবির সামনে আসবে পেন্সিল দিয়ে তা চিহ্নত করে রাখবে। সম্ভব হলে পরে তা ডায়েরিতে নোট করে রাখবে।

এই পড়াটা যেন অব্যাহত থাকে। প্রতিদিন ১০/১২/১৫/২০ পৃষ্ঠা করে পড়বে। অন্তত পাঁচ পৃষ্ঠা তো পড়তেই হবে। পড়ার ধারাবাহিকতাটা এমন হতে পারে যে, একজন লেখককে নির্বাচন করে তার বেশ কিছু কিতাব পাঠ করা। তারপর আরেকজন লেখকের কিছু কিতাব পাঠ করা। উদাহরণ স্বরূপ বিশ্ববরেণ্য আরবি সাহিত্যিক প্রখ্যাত লেখক শাইখ আলি তানতাবি রহ. এর ১০টি কিতাব পাঠ করা। এরপর শাইখ আবুল হাসান আলি নাদাবি রহ. এর ১০টি কিতাব পাঠ করা। অতঃপর শাইখ মুস্তফা লুতফি আল মানফালুতির ১০ কিতাব পাঠ করা। তারপর শাইখ আহমদ আমিনের কিছু কিতাব পাঠ করা। এরপর আহমদ শাওকি, তহা হুসাইনসহ বিভিন্ন লেখকের কিতাবাদি পাঠ করা।

আবার এভাবেও হতে পারে যে, ছয়মাস শুধু নির্দিষ্ট একজন লেখকের লেখা পাঠ করা। এরপর ছয়মাস আরেকজন লেখকের বই পড়া। মোট কথা, ধারাবাহিকভাবে আরবি সাহিত্যের কিতাব পাঠ করে যেতে হবে।

কামুস বা অভিধান ব্যবহার করা

আরবি কিতাব পাঠ করার সময় অনেক নতুন শব্দ সামনে আসবে যেগুলোর অর্থ জানা থাকবে না, সে সকল শব্দের অর্থ কামুস বা অভিধান খুলে

বের করে জেনে নিবে। এক্ষেত্রে অনেক তালিবে ইলম অলসতা প্রদর্শন করে থাকে। আরবি কিতাব পড়ার সময় কঠিন শব্দ এলে সেটির অর্থ কামুস থেকে বের করার পরিবর্তে অন্য কাউকে শব্দটির অর্থ জিজ্ঞেস করে। অথবা নিজে নিজে ইজতিহাদ করে একটি অর্থ তৈরি করে অনুবাদ করে এবং অস্পষ্ট রেখে পড়ে যায়। ফলে ওই শব্দের সঠিক অর্থ তাহকিকের সাথে জানা হয় না এবং কিতাবও সঠিকভাবে বোঝা হয় না। আর অভিধান দেখার ক্ষেত্রে আরবি-আরবি অভিধানকে প্রাধান্য দেওয়া উচিত। এতে আরবি ভাষার সাথে আরো অধিক সম্পর্ক স্থাপিত হবে।

কামুস বা অভিধান ব্যবহারের উপকারিতা

একজন আরবি ভাষার শিক্ষার্থীর জন্য কামুস বা অভিধান ব্যবহার করা আবশ্যক। টেবিলের উপর সবসময় একটি কামুস বা অভিধান থাকা চাই। যখনই কোনো কঠিন বা অপরিচিত শব্দ সামনে আসবে সাথে সাথে কামুসের সাহায্যে তাহকিক করে নিবে। এতে ইসতিদাদ মজবুত হবে ইনশাআল্লাহ। আর কামুস বা অভিধান ব্যবহারের উপকারিতা অপরিসীম। তন্মধ্যে কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হলো–

- শব্দের সঠিক অর্থ তাহকিকের সাথে জানা যায়।
- শব্দের একাধিক অর্থ জানা যায় এবং কিতাবে ব্যবহৃত শব্দের অর্থ কোনটি হবে তা নির্ণয় করা যায়।
- শব্দের সঠিক প্রয়োগক্ষেত্র জানা যায়।

  এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অনেক সময় শব্দের অর্থ একটি হয়। কিন্তু তার প্রয়োগক্ষেত্র সুনির্দিষ্ট থাকে। সঠিক প্রয়োগক্ষেত্র জানা থাকার দরুণ আমরা তা অন্য জায়গায় শব্দটি ব্যবহার করে থাকি। ফলে বাক্যটি নির্ভুল হয় না।

- শব্দের বিস্তারিত তাহকিক জানা যায়। অর্থাৎ, শব্দটির মুজাক্কার, মুয়ান্নাস, ওয়াহিদ, তাসনিয়া, জমা, মুনসারিফ, গায়রে মুনসারিফ ইত্যাদি সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানা যায়।

- শব্দের সিলার ব্যবহার জানা যায়। অর্থাৎ, শব্দটি সিলা যুক্ত হলে তার সাথে কোন সিলা ব্যবহার হয়, কোন সিলা ব্যবহার করলে কী অর্থ প্রদান করে সে সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান অর্জিত হয়।

- নির্দিষ্ট শব্দ জানার পাশাপাশি কামুস ব্যবহারের সময় আরো অনেক শব্দ জানা হয়ে যায়।

  অনেক সময় এমন হয় যে, একটি শব্দ বের করার জন্য কামুস খোলা হয়েছে। তখন ওই শব্দটির সাথে সাথে আরো একাধিক শব্দের প্রতি দৃষ্টি গোচর হয়। তখন ওই শব্দগুলোর অর্থও মুখস্ত হয়ে যায়।

- স্মৃতিতে সংরক্ষিত থাকে দীর্ঘ দিন পর্যন্ত।

  কোনো শব্দ বের করার জন্য কষ্ট করে কিছু সময় ব্যয় করে কামুস বের করলে ওই শব্দটি স্মৃতিতে বসে যায়। পরবর্তীতে সেই শব্দটি সামনে এলে তার অর্থটি স্মৃতিতে ভেসে ওঠে।

কিছু কামুস বা অভিধানের তালিকা

١) معجم الجمهرة لصاحبه "ابن دريد" (ت ٣٢١هـ)

٢) معجم البارع لصاحبه "أبو علي القالي" (ت ٣٥٦هـ)

٣) معجم التهذيب لصاحبه" أبو منصور الأزهري" (ت ٣٧٠هـ)

٤) معجم المحيط لصاحبه "الصاحب بن عباد " (ت ٣٨٦هـ)

٥) معجم مقاييس اللغة و المجمل من تأليف صاحبهما" ابن فارس" (ت ٣٩٥هـ)

٦) معجم الصحاح من تأليف صاحبه "الجوهري" (ت حوالي ٤٠٠ هـ)

٧) معجم المحكم و المخصص من تأليف صاحبهما ابن سيده الاندلسي (ت ٤٥٨هـ)

٨) معجم أساس البلاغة من تأليف صاحبه الزمخشري (ت ٥٣٨هـ)

٩) معجم العباب من تأليف صاحبه الصاغاني (ت ٦٥٠ هـ)

١٠) معجم لسان العرب من تأليف صاحبه ابن منظور(ت ٧١١هـ)

١١) معجم القاموس المحيط من تأليف صاحبه الفيروز أبادي (٧١٨ هـ)

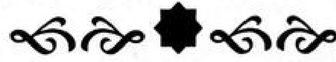
١٢) معجم تاج العروس لصاحبه الزبيدي (ت ١٢٠٥ هـ)

١٣) معجم المحيط و قطر المحيط لصاحبهما بطرس البستاني (ت ١٢٨٣هـ)

١٤) معجم أقرب الموارد في فصيح العربية و الشوارد من تأليف صاحبه الشرتوني (ت ١٩٠٧م)

١٥) معجم المنجد من تأليف صاحبه الأب لويس (سنة ١٩٠٨ م)

١٦) معجم الوسيط الذي صدر عن المجمع اللغوي (سنة ١٩٦٠ م)



لغة الصحف العربية বা মিডিয়া আরবি সম্পর্কে কিছু কথা

আরবি সাহিত্যের কিতাব পাঠ করার পাশাপাশি لغة الصحف العربية বা মিডিয়া আরবি তথা আরবি পত্রিকা দৈনন্দিন পাঠের অন্তর্ভুক্ত রাখা চাই। একজন আরবি প্রেমিকের জন্য কিছুতেই কাম্য নয় যে, সে আরবি পত্রিকার ভাষা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকবে। আরবি সাহিত্যের কিতাবাদি পড়তে অভ্যস্ত হলেই যে সবাই মিডিয়া আরবি অতি সহজেই বুঝে ফেলবে ব্যাপারটি কিন্তু ঠিক তেমন নয়। কেননা মিডিয়া আরবির ভাষার উসলুব একটু ভিন্ন। সেই উসলুবের সাথে যদি পরিচয় ও সম্পর্ক গড়ে না উঠে তাহলে একজন তালিবে ইলম যতই আরবি ভাষায় পারদর্শী হোক না কেন, আরবি পত্রিকা পাঠের ক্ষেত্রে তাকে হিমশিম খেতে হবে। নিচে আমরা লুগাতুস সুহুফ বা মিডিয়া আরবির সংজ্ঞা ও পরিচয়, সাধারণ আরবি ও মিডিয়া আরবির মাঝে পার্থক্য এবং মিডিয়া আরবির বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী এবং নমুনাস্বরূপ গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি আরবি সংবাদ অনুবাদসহ তুলে ধরব ইনশাআল্লাহ। এ বিষয়ে মাওলানা শহীদুল্লাহ ফজলুল বারী রহ. এর لغة الصحف العربية ও মাওলানা মীযান হারুন হাফিজাহুল্লাহ. এর 'মিডিয়া আরবি কীভাবে শিখব' বইয়ে অনেক

চমৎকার আলোচনা রয়েছে। কিতাব দুটি থেকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু অংশ প্রয়োজনীয় সংযোজন-বিয়োজন করে তুলে ধরছি।

لغة الصحف العربية বা মিডিয়া আরবির সংজ্ঞা ও পরিচয়

সাহিত্য কিংবা গবেষণাধর্মী সাধারণ আরবি ভাষার সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম উসলুবে গড়ে উঠেছে মিডিয়া আরবি। নির্দিষ্ট সংজ্ঞার বাইরে গেলে সাধারণ পাঠকও বুঝতে সক্ষম হবেন মিডিয়া আরবি কাকে বলে? এক কথায় বলা যায়, আরবি গণমাধ্যমে ব্যবহৃত ভাষাই হলো মিডিয়া আরবি। কেবল আরবি ভাষার সঙ্গেই মিডিয়ার ভাষার একচ্ছত্র সম্পৃক্ততা নয়; বরং পৃথিবীর মোটামুটি সকল ভাষাতেই 'মিডিয়ার ভাষা' বলতে একটি পরিভাষা রয়েছে। আর তাই মিডিয়ার ভাষা দেশ, সমাজ ও জাতি সর্বোপরি সভ্যতা বিকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার।

আরবি ভাষার নব জাগরণের ক্ষেত্রে মিডিয়ার রয়েছে ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব। 'মাজমাউল লুগাতিল আরাবিয়্যাহ' এর সদস্য ড. আবদুল্লাহ কানুন "الصحافة وتجديد اللغة" গ্রন্থে লিখেছেন, "বর্তমান সময়ে আরবি ভাষায় যে ব্যাপকতর উন্নতি ও বিকাশ সাধিত হয়েছে, এর সিংহভাগই সম্পন্ন হয়েছে সাংবাদিক ও লেখক-কলামিস্টদের হাতে।[১]

ব্যাকরণ ও নিয়ম-কানুনের সুরক্ষা নিশ্চিত করার সঙ্গে সঙ্গে ভাষায় নতুন নতুন অর্থ ও চিন্তা-চেতনা সৃষ্টির কাজটি যে কতটা দক্ষতা ও নিপুণতার সঙ্গে করা যায় এর সবচেয়ে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আধুনিক কালের আরবি সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের ভাষা। আর সে কারণেই আরবি ভাষার একজন সাধারণ পাঠক যখন সংবাদপত্র কিংবা ইন্টারনেট খুলে বসেন, তখন তার সামনে আরবি ভাষাটিকে অন্য আরেকটি ভাষা বলে মনে হয়।

সাধারণ আরবি ও মিডিয়া আরবির মাঝে পার্থক্য

সাধারণ আরবি ও মিডিয়া আরবির ভেতরে অনেক পার্থক্য রয়েছে। শব্দ চয়ন, বর্ণনাভঙ্গি, ভাষার সরলতা, সংক্ষিপ্ততা ও স্পষ্টতা ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্র জুড়ে এই পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হয়। তবে ব্যাকরণ ও নিয়ম-নীতির ক্ষেত্রে

---

(১) اللغة الإعلامية পৃষ্ঠা: ৩৩

মিডিয়া আরবি সাধারণ আরবির চেয়ে ভিন্নতর কিছু নয়। যদিও মিডিয়াতে অনেক সময় ব্যাকরণ-বিচ্যুতি আমাদের চোখে পড়ে।

নিম্নে সাধারণ আরবি ও মিডিয়া আরবির মাঝে কিছু পার্থক্য উল্লেখ করা হলো:

- বাক্যের অভ্যন্তরীণ নিষ্প্রয়োজনীয় সংযোজক অব্যয় তথা হরফে আতফ বর্জন। সাধারণ আরবিতে হরফে আতফ বা সংযোজক অব্যয় কেবল ভাষাগত সৌন্দর্যের জন্যও সচরাচর ব্যবহৃত হয়। কিন্তু মিডিয়া আরবিতে সেগুলো বর্জন করা হয়। যেমন: وقد قال في حديثه সাধারণ আরবির এই স্থানে মিডিয়া আরবিতে কেবল قد قال في حديثه ব্যবহৃত হয়।[১]

- সাধারণ আরবিতে বিভিন্ন ক্ষেত্রেই অনেক নিষ্প্রয়োজনীয় বস্তু উল্লেখ করা হয় কেবলই বাক্যের সৌন্দর্য বৃদ্ধি ও রচনার গুণগত মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে। পক্ষান্তরে মিডিয়া আরবিতে সেগুলো বর্জন করা হয় অনেকটা স্বাভাবিকভাবে। কারও কারও মতে, পাঠকের সময়ের সীমাবদ্ধতা ও অর্থনৈতিক কারণেও মিডিয়া আরবিতে সংক্ষেপণের প্রবণতা তুলনামূলক একটু বেশি। উদারহণত একটি সংবাদের একটি লাইন কমে গেলেও খরচের পরিমাণটা অনেক কমে যাবে। আর সে কারণে মিডিয়া আরবিতে বাক্য লম্বা করার পরিবর্তে খাটো রাখার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়। আর সেটা করা হয় কয়েকভাবে। যেমন: পরিচিত কোনো নিষ্প্রয়োজনীয় কারণ কিংবা পন্থা-পদ্ধতির উল্লেখ বর্জনের মাধ্যমে। যেমন সাধারণ আরবিতে বলা হবে, جاء من الإسكندرية في الوجه البحري কিন্তু মিডিয়া আরবিতে বলা হবে কেবল جاء من الإسكندرية।[২]

- একইভাবে মিডিয়া আরবিতে প্যাঁচ দিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কথা না বলে সরাসরি উদ্দেশ্য ব্যক্ত করা হয়। উদাহরণটি দেখুন মিডিয়া আরবিতে বলা হবে استغرقت المناشقة نحو ساعتين অথচ একই কথা সাধারণ আরবিতে

---

(১) ড. আবদুল আজিজ শরফকৃত المدخل إلى وسائل الإعلام পৃষ্ঠা: ২৩৪

(২) প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা: ২৩৪

বলা হবে এভাবে- استغرقت المناشقة مدة تقرب من ساعتين।[১] কেউ মারা গেলে সাহিত্যের ভাষায় বলা হয়, انتقل إلى الملأ الأعلى في شهر كذا। কিন্তু পত্রিকার আরবিতে সরাসরি বলা হবে- توفي في شهر كذا।

- আরব বিশ্বের সকল লেখক ও সাহিত্যিকের লেখা সমান নয়। কারও লেখা বহমান পানির মতো সরল ও সাবলীল। আবার অনেকের লেখা তুলনামূলক দুর্গম।

  উদাহরণস্বরূপ শাইখ মুস্তফা লুতফি মানফালুতি ও শাইখ আলি তানতাবির লেখা পড়ুন। আপনার মনে হবে যে, লেখকের কলমের সঙ্গে আপনার হৃদয়ের একটা সুনিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। আর সে কারণে লেখক ঠিক যেভাবে চাচ্ছেন আপনার মনও তাকে সেভাবেই সঙ্গ দিচ্ছে।

  আবার এর বিপরীতে অনেকের লেখা পড়তে গিয়ে দুর্বোধ্যতা, জটিলতা, শব্দের শক্ত ও উচ্চ গাঁথুনিতে বড়ো নাযুক অবস্থা বলে বিবেচিত হয়। আব্বাস মাহমুদ আল আক্কাদ, মুস্তফা সাদেক রাফেয়ি কিংবা ইবরাহিম নাসের আল হুমাইদান এর লেখা পড়লে বিষয়টি অনুভব করার কথা। যদিও অনেক ক্ষেত্রে এটা পাঠকের ভাষাগত যোগ্যতার ওপরও নির্ভরশীল।

  এটা দুনিয়ার সকল ভাষাতেই বিদ্যমান ও যুক্তিযুক্ত। কারণ সব বই সবার জন্য প্রযোজ্য নয়; সব লেখকের পাঠকশ্রেণী এক ও অভিন্ন নয়। কিন্তু মিডিয়া সবার জন্য। এখানে বিশেষ কোনো শ্রেণী নির্ধারণ করতে গেলে সেই মিডিয়া উঠে দাঁড়াতে পারে না। উদাহরণত একটি সংবাদপত্র এমন ভাষাতে লিখতে হয় যেটা উচ্চশিক্ষিত-নিম্নশিক্ষিত, অফিসার-পিয়ন সবাই বুঝতে পারে। আর তাই পত্রিকায় ব্যবহৃত শব্দগুলো সাধারণত সহজ-সরল, বহুল প্রচলিত ও সকলের বোধগম্য হয়ে থাকে। সেকারণে মিডিয়া আরবিতে أتون না বলে حريق বলা হয়, ظعن না বলে سافر বলা হয়।[২]

- সাধারণ আরবিতে প্রায় সময়ই আমরা ভাষাকে শ্রুতিমধুর করার জন্য অতিরিক্ত 'ক্রিয়া' ব্যবহার করে থাকি। এগুলো একেবারেই যে গুরুত্বহীন

---

(১) প্রাগুক্ত

(২) প্রাগুক্ত, পৃ: ২৩৫

তা কিন্তু বলা যায় না। তথাপি মিডিয়া আরবিতে এগুলো বর্জন করা হয়। উদাহরণত, মিডিয়া আরবিতে যেখানে বলা হবে: أعدّ بحثا (তিনি একটি থিসিস প্রস্তুত করেছেন), সেখানে একজন লেখক কিংবা সাহিত্যিককে আমরা বলতে শুনবো, قام بإعداد بحث।[১]

- একইভাবে মিডিয়া আরবিতে যেসব 'বিশেষণ (সিফাত) ক্রিয়া সংগঠনের স্থান বা কাল ও সম্বন্ধকারী অব্যয় ইত্যাদি যথাসাধ্য পরিহার করা হয়। সাধারণ আরবিতে যেগুলো যথাসাধ্য ব্যবহার করা হয়। সামনের উদাহরণগুলো দেখুন:

সাধারণ আরবিতে বলা হবে: دمّرت السيارتان تدميرا কিন্তু মিডিয়াতে বলা হবে কেবল دمرت السيارتان ব্যস এতটুকুই। কারণ ঐ বিশেষণটুকু যোগ না করলেও বাক্যের অর্থে কোনো ব্যত্যয় ঘটে না।

আবার দেখুন সাধারণ আরবিতে বলা হবে: عمارة عالية من ثمانية عشر طابقا (আঠারো-তলা ভবন)। কিন্তু মিডিয়া আরবিতে বলা হবে: عمارة من ثمانية عشر طابقا। আরও একটি উদাহরণ দেখুন– সাধারণ আরবিতে যেখানে ঘুরিয়ে বলা হবে, كان من بين الذين غادروا القطار (তিনিও অন্যদের সঙ্গে ট্রেন ছেড়েছেন) সেখানে মিডিয়া আরবিতে সরাসরি বলা হবে: كان من الذين غادروا القطار।[২]

মিডিয়া আরবির বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী

- মিডিয়া আরবির সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য হলো এর সরলতা, দ্ব্যর্থহীনতা ও ভাব প্রকাশে স্পষ্টতা। শব্দ ও বাক্যের দুর্বোধ্যতা, জটিলতা ও ভাষার মারপ্যাঁচ থেকে মিডিয়া আরবি অনেক দূরে। যেহেতু মিডিয়া মানুষের

---

(১) প্রাগুক্ত পৃ: ২৩৪
(২) প্রাগুক্ত

দৈনন্দিন জীবনের কথা বলে, মানুষের প্রাত্যহিক জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনাবলী মানুষের সামনে তুলে ধরে, তাই তাকে কথা বলতে হয় মানুষের জীবন ও বাস্তবতার ভাষায়। শব্দের বাগাড়ম্বর, ভাষার নিষ্ফল ফুলঝুরি, জটিল অলংকার শাস্ত্র টেনে আনা, চকচকে প্রাণহীন অন্তমিলযুক্ত ও শ্লেষবাক্যের অবতারণা থেকে মিডিয়া আরবিতে অনেক দূরে থাকতে হয়।[১]

- মিডিয়া আরবির ভাষা হলো বাস্তবমুখী ও প্রায়োগিক ভাষা। এটা নিছক গবেষণাধর্মী কিংবা বিনোদনমূলক ভাষা নয়। এটা বাস্তবতার সঙ্গে সম্পর্ক রেখে মানুষের মনের খোরাক যোগায়। আর সে কারণে মানবসমাজের সভা-সেমিনার, মিছিল-মিটিং, মজলিস ও বৈঠক, আচার-অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত শব্দ ও ভাষাই হলো মিডিয়ার প্রাণ।[২]

- মিডিয়া আরবি ব্যবহারে সূক্ষতা ও অধিকতর বাস্তবমুখিতা। যদিও ইদানিং অনেক ক্ষেত্রে এর ব্যত্যয় চোখে পড়ে। তথাপি মিডিয়া আরবিতে সাধারণত সেই সব দ্ব্যর্থবোধক শব্দের প্রয়োগ পরিহার করা হয় যা শ্রুতিমধুর ও মানের দিক থেকেও সাধারণ শব্দের চেয়ে উচ্চতর, কিন্তু শব্দের অর্থের সূক্ষ্মতার দিক দিয়ে যা পাঠকের মনে সন্দেহের সৃষ্টি করে। কারণ এক মনেও (রাগ করা, ক্রুদ্ধ হওয়া অর্থের জন্য) امتعض আর ثار কিংবা غضب কিন্তু এক নয়। (গাল কিংবা কপালের অর্থে) وجنة আর خد এক রকম মনে হলেও দুটি কিন্তু এক নয়। একইভাবেشحمة العين (চোখের সাদা ও কালো উভয়টিই, অক্ষিগোলক) আর حدقة العين (নয়ন-তারা, চোখের মণি) এক ও অভিন্ন নয়। جفن (চোখের পাতা) আর هُدْب (চোখের পাপড়ি, নেত্রলোম) এক নয়। আর সে কারণেই এসব শব্দ মিডিয়া আরবিতে প্রয়োগ করা হয় না।

- শব্দের গতানুগতিক ও ঐতিহ্যগত পুরনো অর্থ ছেড়ে নতুন নতুন অর্থ গ্রহণ। এটা মিডিয়া আরবির একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। পৃথিবীতে

---

(১) اللغة الإعلامية পৃ: ৩৮

(২) ড. জান জুবরান কারাম কর্তৃক مدخل إلى لغة الإعلام পৃ: ৭৮

নিত্য-নতুন বিভিন্ন প্রেক্ষাপট তৈরি হচ্ছে, মানুষের জীবনে নতুন নতুন সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে এবং তার সমাধানও বের করতে হচ্ছে। শব্দের পুরনো ও প্রথাগত অর্থ দিয়ে নিশ্চয়ই সেসব সমস্যা ও সমাধান প্রকাশ করা সম্ভব নয়। সেকারণে মিডিয়াতে ব্যবহৃত বিভিন্ন শব্দের জন্য নতুন নতুন সময়োপযোগী অর্থ খুঁজতে হয়। এটাকে আরবিতে বলা হয় التطور الدَّلالي তথা সিম্যান্টিক চেঞ্জ বা ভাষার অর্থগত বিবর্তন। তাই পাঠককে এ ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে। উদাহরণত السوق السوداء 'কালো বাজার' এর ক্ষেত্রে আপনাকে 'কালো' এর তাৎপর্য বুঝতে হবে। يناصره الشارع এর ক্ষেত্রে আপনাকে 'শরীয়ত প্রণেতা' আইনদাতা' এর জায়গায় 'আইনসভার সভ্য, বিধানমণ্ডলীর সদস্য' অর্থ জানতে হবে।

- بقي في الظل এর অনুবাদ 'ছায়ায় থাকা' করলে হবে না। এর অনুবাদ হবে بقي مجهولا অর্থাৎ অজ্ঞাত থাকা, অন্ধকারে থাকা। الاتجاه الأحمر বললে আপনাকে লাল দৃষ্টিভঙ্গির বদলে বুঝতে হবে কম্যুনিজম। الانقلاب الأبيض বললে সাদা কিছু বাদ দিয়ে আপনাকে বুঝতে হবে রক্তপাতহীন অভ্যুত্থানের কথা। আর যখন বলা হবে الانقلاب الفاشل তখন অর্থ হবে ব্যর্থ অভ্যুত্থান। الصحافة الصفراء বললে আপনি কোন হলুদ সাংবাদিকতা বোঝেন? الأسر النهري বলতে নিশ্চয়ই আপনি নদী বন্দী করা পরিবর্তে নদীর গতিরোধ কিংবা স্ট্রিম পাইরেসির কথা বুঝবেন।

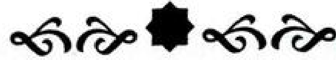
  الربيع العربي তথা আরব বসন্ত বললে রাজনীতি সম্পর্কে খোঁজখবর রাখেন না এমন মানুষ কী অনুবাদ করবেন? الثورة البرتقالية এর কেবল 'কমলা বিপ্লব' অনুবাদ করলে একজন সাধারণ পাঠক কী করে বুঝবেন যে এর দ্বারা ইউক্রেনের সরকার বিরোধী গণজাগরণ ও আন্দোলন উদ্দেশ্য?

সংবাদপত্রের শিরোনামের ভাষা ও গঠন কেমন হবে

- সংবাদ পত্রের শিরোনাম অধিকাংশ ক্ষেত্রে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ দ্বারা শুরু হয়।

- সংবাদ পত্রের শিরোনাম কখনও কখনও অসমাপিকা ক্রিয়া দ্বারা শুরু হয়।
- সংবাদ পত্রের শিরোনাম কদাচিৎ জুমলায়ে ফেলিয়্যাহ দ্বারা শুরু হয়।
- সংবাদ পত্রের শিরোনাম বর্তমানকাল সম্বলিত হয়।
- সংবাদপত্রের শিরোনাম ব্যক্তির বা সংস্থার নামের প্রথমাংশ বা শেষাংশ সম্বলিত হয়।
- সংবাদপত্রের কতেক শিরোনাম মন্ত্রণালয়ের নামের প্রথম অক্ষর সম্বলিত।

দ্বিতীয় অধ্যায়



مهارة الكتابة

লিখন-দক্ষতা

শুরুতেই আলোচনা করা হয়েছে যে, ভাষা দক্ষতা চারটি– পড়া, লেখা, শোনা, বলা। এতক্ষণ আমরা পঠন দক্ষতা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এখন লিখন-দক্ষতা সম্পর্কে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ। এক্ষেত্রে সর্বপ্রথম আমরা লিখন দক্ষতার গুরুত্ব নিয়ে কিছু আলোচনা তুলে ধরছি।

লিখন দক্ষতার গুরুত্ব

মানব সন্তানের আত্মপ্রকাশের বাহন হলো ভাষা। এর দুটি রূপ। ধ্বনিরূপ ও বর্ণ বা লিপিরূপ। ধ্বনি বলতে আমরা মানুষের মুখে উচ্চারিত ভাষাকেই বুঝি। মুখে বলার সাথে শোনার সম্পর্ক একান্ত ঘনিষ্ঠ। কারণ, আমরা কাছের ও দূরের শ্রোতার উদ্দেশ্যেই কথা বলে থাকি। অন্যদিকে ভাষার লিপিরূপ শিল্প ও সাহিত্যের সুন্দর সৃষ্টিকে ধরে রাখে আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য। কারণ বলার স্থায়িত্বের চেয়ে লেখার স্থায়িত্ব অনেক বেশি হয়ে থাকে। এ কারণে লেখার কাজটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভাষা দক্ষতা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। লিখন বা লেখা হলো যোগাযোগের একটা মাধ্যম যা চিহ্ন বা

প্রতীকের সাহায্যে ভাষার প্রতিনিধিত্ব করে। প্রায় সব ভাষায় কথ্যভাষা বা বক্তব্যের পরিপূরক হিসেবে লিখন প্রচলিত হলেও লিখন মূলত ভাষা নয় ভাষিক প্রযুক্তি। লিখন, ভাষিক সংঘটনের অন্যান্য উপাদান যেমন অভিধান, ব্যাকরণ ও শব্দার্থবিদ্যা ছাড়াও একটি নির্দিষ্ট ভাষার চিহ্ন বা প্রতীকের সাহায্যে প্রণীত আনুষ্ঠানিক বর্ণমালার উপরও নির্ভর করে থাকে। লিখনের ফলাফলকে পাঠ্য বা টেক্সট এবং যিনি লিখনের প্রাপক বা যিনি লিখাটি পাঠ করেন তাকে পাঠক বলা হয়। বিভিন্ন প্রকাশনা, গল্প, চিঠিপত্র এবং দিনলিপি লেখার প্রণোদনা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত এছাড়াও লিখন গণমাধ্যম এবং আইনি ব্যবস্থা গঠনের মাধ্যমে ইতিহাস ও জ্ঞান প্রচারে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে ।

লেখার কিছু উপকারী দিক

- লেখার মাধ্যমে মনের ভাব ধরে রাখা যায়।
- লেখার দ্বারা অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের মাঝে যোগসূত্র স্থাপন করা যায়।
- ব্যক্তিত্বের পূর্ণাঙ্গ বিকাশ সম্ভব হয় লেখার দ্বারা।
- বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের মাঝে যোগসূত্র স্থাপন সম্ভব হয় লেখার মাধ্যমে।

কী লিখব? কীভাবে লিখব?

অনেক তালিবে ইলম লিখতে চায়, কিন্তু প্রত্যেকের মনে প্রশ্ন কী লিখব? কীভাবে লিখব? এ প্রসঙ্গে 'এসো কলম মেরামত করি' বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণে মাওলানা আবু তাহের মিছবাহ দা. বা. লিখেছেন–

"অনেকে মৌখিকভাবে, অনেকে পত্রযোগে আমাকে প্রশ্ন করে, 'আমরা লিখতে চাই এবং লেখক হওয়ার 'আগ্রহও প্রচুর', কিন্তু সমস্যা হলো, কাগজ-কলম নিয়ে লিখতে বসি, লেখা আসে না। কী লিখব, কীভাবে লিখবো, বুঝতে পারি না। কী দিয়ে শুরু করবো, কী দিয়ে শেষ করবো কিছুই মাথায় আসে না। কোথাও কারো কাছে এ সমস্যার সমাধানও পাই না। সবাই এত গুরুগম্ভীর উপদেশ দেয় যে, মাথাটা আরো গুলিয়ে যায়। এ সম্পর্কে আপনি যদি আমাদের সঠিক পথ বলে দিতেন, আমরা উপকৃত হতাম। আল্লাহর ওয়াস্তে

আমাদের সঠিক দিকনির্দেশনা দান করুন, চিরজীবন আমরা আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবো।'

মাশাআল্লাহ! লিখতে না পারার উপর বড় সুন্দর একটি লেখা! ভাষা ও শরীর-কাঠামো সবই সুন্দর! ছোট্ট একটি লেখা, তারও সূচনাপর্ব, মধ্যপর্ব ও সমাপ্তিপর্ব সব ঠিক আছে। নাহ, এমন লেখা ও লেখকের তারিফ না করার অর্থ হবে প্রতিভার স্বীকৃতি না দেয়া! তাই শুরুতেই হে অদেখা বন্ধু, আমি অকুণ্ঠচিত্তে তোমাকে প্রশংসা নিবেদন করলাম।

এবার এসো তোমার সমস্যার সঙ্গে পরিচয় করি। গুরুতর সমস্যা সন্দেহ নেই। তবে কিনা সমাধানটা সমস্যার চেয়ে অনেক সহজ! এর দু'টো সমাধান, প্রথমটি তো একেবারে জলের মত সহজ। অর্থাৎ কলমটা আমাকে দান করো, তারপর গরমকাল হলে লেপমুড়ি দিয়ে, আর শীতকাল হলে খালি গায়ে ঘুমিয়ে থাকো। তবে মশারি টানাতে ভুল করো না। মশারা আজকাল জ্বালায় বড্ড! হাঁ ঘুমিয়ে থাকো, তোমাকে লিখতে হবে না। শুধু শুধু কে এত কষ্ট করা!

আগেই বলেছি, আজ আমি বড়ই খোশমেজাজে আছি। তাই কথা তরল তরল হচ্ছে। যাক, প্রথম সমাধানটা যদি তোমাদের পছন্দ না হয়, বাদ দাও। আমার চিন্তায় এ সমস্যার দ্বিতীয় সমাধানটি আছে সেটা শোনো, হয়তো কিছুটা হলেও তোমাদের কাজে লাগবে। একসময় আমিও এ সমস্যার ভুক্তভোগী ছিলাম। আল্লাহ মেহেরবান আমার মাথায় একটা সমাধান দিয়েছিলেন। সেটা অনুসরণ করে আমি খুব উপকৃত হয়েছি। তার আগে এই ঘরোয়া মজলিসে তোমাদের খোলামেলা দু'একটা কথা বলতে চাই। আমি কলমের সৈনিক টৈনিক নই, তোমাদেরই পরিবারভুক্ত সামান্য এক কলমসেবী, মানে কলমের খাদেম। তাই আশা করি, আমার কথাগুলোর সে অর্থই তোমরা গ্রহণ করবে যে অর্থটা আমি বোঝাতে চাই। কোন কথার 'হিন্দী কা চিন্দী' মতলব বের করতে যেয়ো না যেন। হিন্দী কা চিন্দী মানে বোঝো না! তোমরা তো আবার এ যুগের তালিবানে ইলম। যাক গে, সে তোমাদের বুঝে কাজ নেই। এবার আসল কথা শোনো এবং মন দিয়ে শোনো।

প্রথমত 'আমরা লিখতে চাই' কথা গ্রহণযোগ্য নয়। বলা উচিত, আমরা লেখা শিখতে চাই। হাঁ মিয়াঁ ভাই, আগে তোমাকে লেখা শেখার সাধনায়

আত্মনিয়োগ করতে হবে। তোমাকে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতে হবে যে, আমি শিখবো, যত দিন লেখা আয়ত্তে না আসে তত দিন আমি শিখেই যাবো।

দ্বিতীয়ত 'আমাদের আগ্রহ প্রচুর' এ দাবীর যথার্থতার বিষয়েও আমার 'কিঞ্চিৎ' সন্দেহ রয়েছে। হয়তো তোমার আগ্রহ আছে, কিন্তু সেটা যে পরিমাণে প্রচুর তা তুমি কীভাবে নির্ধারণ করলে? সফল লেখক হওয়ার জন্য তোমার মধ্যে কী পরিমাণ আগ্রহ থাকা দরকার তা কি তুমি জানো? এক ব্যবসায়ীকে জানি, শুক্রবারে জুমার জামাতে শরীক হওয়ার প্রচুর আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও অসুস্থতার ওজরে তিনি মসজিদে যেতে পারেননি; বাসায় জোহর পড়ে নিয়েছেন। এটা দোষের কিছু নয়। কিন্তু ঘটনাক্রমে সেদিনই তিনি টেলিফোনে লাখটাকার একটা ফরমায়েশ পেলেন। ফরমায়েশটা ধরতে হলে তাকে বন্ধের দিনে দোকান খুলে মাল সরবরাহ করতে হবে। তিনি কারো বাধা না শুনে ছেলের কাঁধে ভর করে দোকানে গেলেন, মাল সরবরাহ করলেন এবং গুণে গুণে লাখটাকা সিন্ধুকে রাখলেন, আর বাসায় ফিরে দিব্বি সুস্থ হয়ে গেলেন। (বলা যায়, টাকার তাপ শরীরের তাপকে শুষে নিলো।)

আগ্রহের তারতম্যের এই জীবন্ত উদাহরণ থেকে আমি আমার জীবনে অনেক বড়ো শিক্ষা লাভ করেছি। তোমারও নিশ্চয় অনেক কিছুর প্রতি আগ্রহ রয়েছে এবং আগ্রহ রয়েছে লেখক হওয়ার প্রতিও! আমি তোমাকে ছোট্ট একটি কাজ করতে বলবো, এই আগ্রহগুলোর মধ্যে একটু তুলনামূলক বিচার করো। লেখক হওয়ার আগ্রহটা যদি পরিমাণে সর্বোচ্চ না হয় তাহলে তোমাকে আগ্রহের পরিমাণ বাড়াতে হবে। আমার চারপাশে আমি লেখক হওয়ার বহু আগ্রহীকে দেখতে পাই এবং তাদের প্রতি আমার করুণা হয়।

শেখ সা'দী রহ. এর গল্প মনে পড়লো। পথে এক রূপসীকে দেখে এক যুবকের তার প্রতি 'আগ্রহ' হলো। যুবক রূপসীকে তার আগ্রহ নিবেদন করলো। রূপসী মৃদু হেসে বললো, 'আমাকে দেখেই! পিছনে আসবে আমার বোরকাওয়ালী বোন। আমি যদি হই তারা আসমানের, সে হবে সেতারা।'

সে যুগেও ছিলো এ যুগের যুবক। সে ছুটলো পিছনে। বোরকার ঘোমটা তুলে দেখে, দাঁত পড়া এক বুড়ী! ফিরে এসে ধরলো রূপসীকে, কেন মিথ্যা বললে? রূপসীর সহাস্য জবাব, তোমার আগ্রহের পরিমাণটা পরীক্ষা করলাম!

বন্ধু! মনে রেখো, সফলতার জন্য শুধু আগ্রহ যথেষ্ট নয়, প্রয়োজন হলো একাগ্রতা ও গভীর প্রেম, যা তোমাকে পথের সকল প্রতিকূলতা জয় করে এগিয়ে যেতে শক্তি যোগাবে এবং অসম্ভব থেকে অসম্ভব কোরবানি দিতে তোমাকে উদ্বুদ্ধ করবে। দু'একজন বামপন্থী লেখকের কথা জানি, যারা কলমের 'জাদুকর' হওয়ার জন্য অসম্ভব 'সাধনা' করেছেন। তাদের একজন একটি বাক্যের পরিমার্জনে পুরো একটি দিন ব্যয় করেও নাকি সন্তুষ্ট হতে পারেননি। রাতে স্বপ্নে তিনি বাক্যটির সুন্দর পরিমার্জন করতে সক্ষম হয়েছেন এবং ঘুম থেকে জেগে তা কাগজে টুকে নিয়েছেন। এটাকে বলে আগ্রহ! অথচ তাদের লেখা শুধুই লেখা, আর আমাদের লেখা হলো ইবাদত (ইনশাআল্লাহ)!

আমার তিন বোনকে 'এসো আরবি শিখি' পড়াতাম। ঘুমের মধ্যে তারা শব্দ করে সবক পড়তো। একদিন প্রায় মধ্যরাতে পড়ার আওয়ায পেয়ে আম্মাকে বললাম, এত রাতে পড়ছে, ঘোমাবে কখন! আম্মা মৃদু হেসে বললেন, 'দুনোটা এক সাথে চলছে!' এর নাম হলো আগ্রহ!

তৃতীয়ত 'লিখতে বসি, কিন্তু লেখা আসে না।' কথাটা আমি বিশ্বাস করি না। কারণ দু'জন বন্ধু গল্পের আড্ডায় বসেছো, আর গল্প আসছে না, এরকম অভিযোগ আমি কখনো শুনিনি। তাহলে লিখতে বসে লেখা আসবে না কেন? লেখা মানে তো কলমের জিহ্বা দিয়ে কাগজের সঙ্গে কথা বলা, বা গল্প করা। তো মুখের জিহ্বায় যদি কথার অভাব না হয়, কলমের জিহ্বায় কেন কথার অভাব হবে? হাঁ, এমন হতে পারে যে, বিশেষ কোনো বিষয়ের উপর লিখতে গিয়ে লেখা আসছে না। কারণ ঐ বিষয়ে তোমার পর্যাপ্ত জ্ঞান নেই। সে তো কলমের দোষ নয়, জ্ঞানের স্বল্পতার দোষ! লেখা মানে লেখকের সঞ্চিত জ্ঞান বিন্যস্ত করে পাঠকের সামনে পরিবেশন করা। এখন ঐ বিষয়ে তোমার যদি জ্ঞানের সঞ্চয় না থাকে তাহলে পরিবেশন করবেটা কী? যে বিষয়ে তোমার পর্যাপ্ত জ্ঞান আছে সে বিষয়ে বন্ধুদের সঙ্গে মুখে এবং কাগজের সঙ্গে কলমের মাধ্যমে কথা বলতে না পারার তো 'কথা' নয়! কিংবা বলতে পারো লেখাটা সুন্দর হয় না। সে তো একদিনে হয় না! আমার এক ছাত্রকে বলেছিলাম, আমি তো লেখা শিখছি পঁয়ত্রিশ বছর ধরে, তোমার লেখার বয়স কি পঁয়ত্রিশ মাস হয়েছে?! বরং তুমি যথার্থ চেষ্টা করো তাহলে তো ইনশাআল্লাহ তোমাদের গন্তব্য হবে অনেক দূরে, সেই আকাশের উচ্চতায়! কেননা তোমাদের সুযোগ-সুবিধা এবং উপায়-উপকরণ আমাদের সে যুগের তুলনায় অনেক বেশী। যেটা

কম সেটা হলো ঐকান্তিক আগ্রহ এবং নিয়মিত চেষ্টা। আসলে মোবাইল এবং এজাতীয় অন্য উপসর্গগুলো তোমাদেরকে তলানিতে নিয়ে যেতে চাচ্ছে। আল্লাহর শোকর, আমাদের যুগে 'এগুলো' ছিলো না। তখন গতি ছিলো না, কিন্তু জীবনটা ছিলো গতিময় এবং নদীর স্রোতের মতো বেগবান। তোমরা গতি পেয়েছো, কিন্তু জীবনটা হয়ে পড়েছে স্রোতবঞ্চিত মরা গাঙ্গের মতো। জীবনের বাইরের গতি ও চঞ্চলতা থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করো এবং চেষ্টা করো জীবনকে গতিশীল করতে, তাহলে সত্যিকারের স্বাদ পাবে সবকিছুতে, জ্ঞানসাধনায়, সাহিত্যসাধনায় এবং আমলের সাধনায়।

একটা কথা আমি ছাত্রদের বলি। কলমের সফরে যারা নতুন মুসাফির তাদের জন্য খুবই জরুরি কথা। আমরা শুরুতেই বিষয়ভিত্তিক লেখা লিখতে চাই এবং বেশ লম্বা চওড়া না হলে সেটাকে লেখা মনে করি না। আর যেহেতু সেটা আমাদের দ্বারা হয়ে উঠে না সেহেতু আমরা ধরে নেই, লেখা আমার কাজ নয়। এভাবে আমরা উদ্যম ও আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলি। অথচ **আল্লাহর মদদের উপর ভরসা করার পর উদ্যম ও আত্মবিশ্বাসই হলো একজন লেখকের পথচলার সবচে' মূল্যবান পাথেয়**। সুতরাং লেখার অঙ্গনে যারা 'শিশু' তাদের জন্য লেখা শেখার এটা সঠিক পদ্ধতি নয়। আমাদের মনে রাখতে হবে, লেখার যোগ্যতা এবং বিষয়-যোগ্যতা দু'টো ভিন্ন জিনিস। তদ্রূপ লেখা এবং লেখার সৌন্দর্য দু'টো সম্পূর্ণ আলাদা বিষয়। 'লিখনযোগ্যতা'র অংকুরোদগম ও বিস্তার এবং উন্মেষ ও বিকাশ ঘটে ছোট ও হালকা বিভিন্ন বিষয়ের উপর বিভিন্নভাবে লেখার মশক ও অনুশীলন থেকে। আর বিষয়বস্তুর যোগ্যতা অর্জিত হয় অব্যাহত জ্ঞান আহরণের মাধ্যমে। তো তুমি যদি নির্দিষ্ট কোনো বিষয়ের উপর লিখতে বসো, আর লিখতে না পারো তাহলে এর কারণ হবে বিষয়বস্তুর জ্ঞানের অভাব, লেখার যোগ্যতার অভাব নয়।

কোনো লেখা লেখা হওয়ার জন্য তার কলেবর বিচার্য নয়। লেখা দশ পৃষ্ঠার হোক বা দশ লাইন, পাঁচ লাইনের, গ্রহণযোগ্য লেখা সেটাই যা পাঠকের জন্য কোনো না কোনো বার্তা ধারণ করে এবং পাঠকের অন্তরের গভীরে সে বার্তা পৌঁছে দিতে পারে।

চারপাশের পরিবেশ-প্রকৃতি সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান ও পর্যবেক্ষণই যথেষ্ট, তবে যেটা দরকার সেটা হলো ভিতরের অনুভব-অনুভূতি, অন্তরের কোমলতা ও বিগলিত এবং হৃদয়ের পরিচ্ছন্নতা ও পরিশুদ্ধি। তখন আকাশ থেকে নেমে

আসা ভাবকে হৃদয় ধারণ করতে পারে, আর হৃদয় যখন কোনো ভাব ধারণ করে তখন কলম থেকে তা ঝরঝর করে ঝরে পড়ে। শুরুর দিকে লেখা হয়তো সুন্দর হবে না, তবে কলমের গতি স্বতঃস্ফূর্ত হবে। আর শুরুতে তোমার কাছে আমাদের কাম্য স্বতঃস্ফূর্ত লেখা: শুধু লেখা, সুন্দর লেখা নয়। লেখা সুন্দর হবে অব্যাহত অনুশীলন এবং সাহিত্য-অধ্যয়নের মাধ্যমে ধীরে ধীরে। উপমাটা সঙ্গত হবে কিনা জানি না, ক্রিকেটদলের কোচ তার খেলোয়াড়দের সবসময় খুব গুরুত্বের সাথে একটা উপদেশ দিয়ে থাকেন–

'হচ্ছে কি হচ্ছে না, এ দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে তুমি তোমার স্বাভাবিক খেলাটা খেলে যাও। স্বাভাবিক খেলা, সুন্দর খেলা নয়।'

লেখা ও খেলা, মিল আছে শব্দে ও স্বভাবে; সুতরাং লেখার ক্ষেত্রেও এ উপদেশ একশভাগ সত্য। সৌন্দর্যচিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে তুমি তোমার স্বাভাবিক লেখাটা লিখে যাও। দেখবে; তোমার লেখা ধীরে ধীরে সুন্দর-সুশ্রী হচ্ছে এবং বেশ উৎকর্ষ লাভ করছে।

স্বাভাবিক গতিতে লেখাটা তৈরী হওয়ার পর শুরু হবে আসল কাজ। অর্থাৎ প্রচুর সময় নিয়ে লেখার পরিচর্যা। লিখতে যদি একদিন লাগে, লেখার পরিচর্যায় লাগতে পারে তিনদিন, সপ্তাহ, মাস বা আরো বেশী। যতবার পরিচর্যা করবে, আগের চেয়ে সুন্দর হবে এবং একসময় পরিচর্যায়ও সময় কম লাগবে। কোনো এক মজলিসে বলেছিলাম, আমাদের মূল সমস্যা হলো, আমরা লিখতে বসে চিন্তা করি, তাই লিখতে পারি না, আবার লেখার পর চিন্তা করি না, তাই লেখা সুন্দর হয় না।

এটা ঠিক নয়। লেখার সময় তুমি শুধু লিখবে, চিন্তা ও পরিচর্যা যা করার তা করবে লেখাটা তৈরী হয়ে যাওয়ার পর এবং তা চলতে পারে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস। শুরু থেকে এভাবেই আমি কলমের অনুশীলন করে করে আসছি এবং আল্লাহর রহমতে কিছুটা ফলও পেয়েছি।"

লেখালেখির প্রাথমিক স্তর

লেখালেখির ময়দানে প্রাথমিক পর্যায়ে তো ছোট ছোট বাক্য গঠনের তামরিন আরবি ভাষা পাঠের একদম শুরু দিকেই হয়ে থাকে। যেমনটা দরসে নেজামি ও মাদানি নেসাবে 'আততামরিনুল কিতাবি' কিতাবের মাধ্যমে হয়ে

থাকে। এই স্তর উত্তীর্ণ হওয়ার পর আসবে রোজনামচা বা দিনলিপি লেখার স্তর। লেখালেখি শেখার ক্ষেত্রে রোজনামচার রয়েছে বিরাট ভূমিকা। প্রত্যেক লেখকই জীবনের শুরু দিকে রোজনামচা লেখার মাধ্যমেই লেখালেখির পথ চলা শুরু করে থাকে।

"রোযনামচা কী, কেন ও কীভাবে" শিরোনামে মাওলানা আবু তাহের মিছবাহ দা. বা. এর একটি লেখা আছে, যা এসো কলম মেরামত করি কিতাবে ৩২৫ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে। নিম্নে তার কিছু অংশ তুলে ধরছি–

"একটি কথা আমি অনেকবার অনেকভাবে বলেছি, কিন্তু খুব কম 'ছেলে-মেয়ে' তা গ্রহণ করেছে এবং আরো কম 'ছেলে-মেয়ে তা পালন করেছে। কথাটি আজ এখানে আবার বলছি। বলছি, কারণ এর মাধ্যমে আমি আমার জীবনে অপরিসীম সুফল লাভ করেছি। আমি চাই না, এর সুফল থেকে পুষ্পের কোনো বন্ধু বঞ্চিত থাকুক।

যদি তুমি লেখা শিখতে চাও এবং ভবিষ্যতে একজন বড়ো লেখক হতে চাও, যদি তুমি সাহিত্য অর্জন করতে চাও এবং আগামী দিনের 'সাহিত্যরত্ন' হতে চাও তাহলে নিয়মিত রোজনামচা লেখাই হলো এর সহজতম উপায়।

রোজনামচা মানে ডায়েরি। তো রোজনামচা বা ডায়েরি লেখার অর্থ কী? এক কথায় এর অর্থ হলো, তোমার জীবনে এবং তোমার চারপাশের পরিবেশে প্রতিদিন যা কিছু ঘটে, তুমি প্রতিদিন যা কিছু করো, যা কিছু দেখো, যা কিছু শোনো এবং যা কিছু চিন্তা করো সেগুলোর কিছু কিছু সেই দিনের সন-তারিখসহ খাতার পাতায় (কিংবা বাজার থেকে সংগ্রহ করা ডায়েরির পাতায়) লিখে রাখো। ব্যক্তিগত ও পারিবারিক ঘটনা, সামাজিক ও জাতীয় ঘটনা, এমনকি আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীও নিজের চিন্তা-ভাবনা ও অনুভব-অনুভূতির আলোকে লেখা যেতে পারে। এভাবে একজন মানুষের ডায়েরির পাতাগুলো হয়ে ওঠে তার হারিয়ে যাওয়া অতীত জীবনের সাক্ষী। অনেক বছর পর মানুষ যখন অতীতের ডায়েরি খুলে দেখে তখন নিজেই সে অবাক হয়ে যায়।

সুখ-দুঃখের, হাসি-আনন্দের কত বিচিত্র ঘটনা! বিভিন্ন চিন্তা-ভাবনা ও অনুভব-অনুভূতির কী আশ্চর্য প্রকাশ, যার অধিকাংশই হয়তো হারিয়ে গেছে স্মৃতির পাতা থেকে, কিন্তু রোজনামচার পাতা বিশ্বস্ত বন্ধুর মতো ধরে রেখেছে তার হারিয়ে যাওয়া অতীত জীবনকে।

আমার শৈশবের রোজনামচার খাতাগুলো ছিলো আমার কাছে। আমার স্ত্রী হাতে তুলে দিয়েছিলাম ভবিষ্যতের আমানত হিসাবে। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা, আটাশির বন্যায় সব নষ্ট হয়ে গেছে। যদি সেগুলো রক্ষা করা যেতো, অন্যকারো জন্য না হোক, আমার জন্য হতো অনেক মূল্যবান সম্পদ। সেগুলোর পাতায় আমি খুঁজে পেতাম আমার হারিয়ে যাওয়া শৈশব, কৈশোর ও যৌবনের বহু দিনের বহু স্মৃতি। কিন্তু তাই হয়েছে যা আল্লাহ ইচ্ছা করেছেন, তবে আল্লাহর শোকর, সেই বন্যার থাবা থেকে খুবই আশ্চর্যজনকভাবে বেঁচে গেছে আমার উনিশশ' আশি সনের ডায়েরিটি।

আশি সন মানে কিন্তু আজ থেকে ত্রিশবছর আগের ডায়েরি। তো সেই ডায়েরির পাতাগুলো যখন খুলে দেখি তখন একবার অবাক হয়ে ভাবি, আচ্ছা! এমন সুন্দর ঘটনাও আমার জীবনে ঘটেছিলো একসময়! এত সুন্দর চিন্তাও আমি করেছিলাম একসময়! তখন আল্লাহর শোকর আদায় করি। আবার কখনো লজ্জা ও অনুতাপের সাথে ভাবি, ছি! এমন কাজও করেছিলাম একদিন! এমন অসুন্দর, অসুস্থ চিন্তাও এসেছিলো আমার মনে! তখন তাওবা-ইস্তিগফার করি এবং সামনের জন্য সতর্ক হই।

তবে আমার দৃষ্টিতে ডায়েরি লেখার যেটা সবচে' বড়ো পাওনা সেটা এই যে, নিজের অজান্তেই একদিন দেখবে, তোমার লেখার হাত বেশ শক্তিশালী এবং তোমার কলম যথেষ্ট পরিপক্ব হয়ে উঠেছে। যে কোনো ঘটনা এবং যে কোনো চিন্তা তুমি স্বচ্ছন্দে ও সাবলীলভাবে প্রকাশ করতে পারছো।

মোটকথা, শৈশব থেকে নিয়মিত রোজনামচা লেখার অভ্যাস একদিকে যেমন সুস্থ চিন্তা-চেতনার বিকাশ ঘটায়, জীবন গড়ার উদ্যম, উদ্দীপনা ও অনুপ্রেরণা যোগায়, তেমনি অন্যদিকে তা ভবিষ্যত জীবনে সফল লেখক হওয়ার মজবুত ভিত্তি তৈরী করে দেয়।

এজন্যই দেখা যায়, মুসলিম-অমুসলিম বহু মনীষী ও কবি-সাহিত্যিক শৈশব থেকে রোজনামচা লেখার অভ্যাস করেছেন, এমনকি তাদের অনেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত রোজনামচা লিখে গেছেন। নব্বই বছর বয়সে মৃত্যুর মাত্র একঘণ্টা আগে কাঁপা কাঁপা হাতে (তথ্যটা যেখান থেকে সংগ্রহ করেছি সেখানে অবশ্য কাঁপা কাঁপা হাতে লেখার কথা নেই। কিন্তু কাঁপা কাঁপা হাত থেকে যে দৃশ্যটি কল্পনায় আসে তা তো হৃদয়কে খুব নাড়া দেয়, তাই না! তাই

আমি নিজের থেকে এটি যোগ করেছি এবং আশা করি, তা অবাস্তবও নয়। এ কৌশলও একজন লেখককে জানতে হয় এবং সতর্কতার সঙ্গে তা প্রয়োগ করতে হয়।) রোজনামচা লেখার ইতিহাসও আছে। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় এ ধরনের বহু বিখ্যাত রোজনামচা বই আকারেও প্রকাশিত হয়েছে। মানুষ নিজের জীবনে শিক্ষা ও চিন্তার খোরাক লাভের জন্য যথেষ্ট আগ্রহের সঙ্গে সেগুলো পাঠ করে থাকে।

এটা অবশ্য ঠিক যে, বিখ্যাত ব্যক্তিদের শৈশব ও কৈশোরের লেখা রোজনামচা ছাপার অক্ষরে তেমন একটা প্রকাশিত হয়নি। কারণ ঐ শিশু বা কিশোর নিজেও জানতেন না যে, তিনি হতে যাচ্ছেন আগামী দিনের বিখ্যাত কোনো ব্যক্তি। এই তুচ্ছ ও সামান্য লেখাগুলোই একদিন হতে পারে অনেক মূল্যবান সম্পদ। তিনি নিজেও তা জানতেন না, আর তা চারপাশের কেউ তো জানতেনই না। তাই তা সংরক্ষণ করার কোনো চেষ্টা হয়নি। তবে তোমাদের প্রতি আমার পরামর্শ, তোমরা তোমাদের ছোটকালের ডায়েরিগুলো যত্নের সঙ্গে রেখে দিও। কে জানে, হয়তো এগুলো আগামী দিনের কোনো বড়ো আলিমের, বরণীয় কোনো লেখক-সাহিত্যিকের এবং আল্লাহর রাস্তায় জান কোরবানকারী কোনো মুজাহিদদের শৈশব। হয়তো রোজনামচার পাতায় ধরে রাখা এ শৈশব ও কৈশোরই হবে আগামীদিনের শিশু-কিশোরদের জন্য সুন্দর জীবন গড়ার উপাদান।

আবার অনেক দূর চলে গিয়েছি, না! এটা আমার বড়ো দুর্বলতা, তবে আগেও বলেছি, হয়তো কল্যাণজনক দুর্বলতা। যাক আগের কথায় ফিরে আসি। বলছিলাম বড়োদের ছোট বেলার রোজনামচা তেমন একটা সংরক্ষিত হয়নি। তবে তোমাদেরই বয়সের একটি মেয়ে, এই ধরো মৃত্যুর সময় যার বয়স হয়েছিলো মাত্র তের বছর, তার নাকি নিয়মিত রোজনামচা লেখার অভ্যাস ছিলো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হিটলারবাহিনীর হাত থেকে জীবনরক্ষার জন্য কয়েকটি পরিবারের সাথে আত্মগোপন করা এই মেয়েটি যে রোজনামচা লিখেছিলো তা সারা দুনিয়ায় রীতিমত আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।

আশ্চর্য! মাত্র তের বছরের একটি মেয়ে, প্রতিমুহূর্তে মৃত্যুর আশঙ্কার মধ্যে বাস করেও রোজনামচা লেখার কথা ভুলেনি! প্রতিদিনের বিভিন্ন মর্মস্পর্শী ঘটনা এবং মনের বিচিত্র চিন্তা-ভাবনা ও অনুভব-অনুভূতি সবার অগোচরে রোজনামচার পাতায় সে লিখে রাখতো। একান্ত নিরালায় বসে মানুষ যেমন

প্রাণের বন্ধুর সাথে মনের সব গোপন কথা অকপটে খুলে বলে ঠিক তেমনি সে প্রতিদিনের সব ঘটনা, সব চিন্তা-ভাবনা লিখে যেতো, যেন প্রাণের বান্ধবীকে মনের কথা বলছে।

একবছর পর যখন সে শত্রুদের হাতে নিহত হয়, তখন তার রোজনামচাটি আশ্চর্য! শত্রুর নযর এড়িয়ে যায়। পরবর্তীকালে তার বাবা প্রাণপ্রিয় কন্যার স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যে রোজনামচাটি প্রকাশ করেন। আর এই একটি মাত্র রোজনামচা তের বছরের এক কিশোরীকে জগৎ-জোড়া খ্যাতি এনে দেয়। পৃথিবীর কত ভাষায় যে তার অনুবাদ হয়েছে, হিসাব নেই। বাংলা অনুবাদও পাওয়া যায়, তবে আমি আমার ছেলে ও ছাত্রদের তা পড়তে বলি না। আমি শুধু বলি, এখান থেকে প্রয়োজনীয় শিক্ষাটুকু গ্রহণ করতে। রোজনামচাটি পড়ে সমালোচকরা মন্তব্য করেছেন, মেয়েটি যদি বেঁচে থাকতো, পৃথিবীর একজন সেরা লেখিকা হতে পারতো।

তুমি যদি তোমার আজকের জীবনকে অতীতের গর্ভে হারিয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করতে চাও এবং নিজের চিন্তা-চেতনার উৎকর্ষ সাধন করতে চাও, সর্বোপরি যদি ভবিষ্যতে একজন শক্তিশালী লেখক হতে চাও, কিংবা তোমাদের ভাষায় হতে চাও 'কলমসৈনিক' তাহলে এখন থেকে নিয়মিত রোজনামচা লেখা শুরু করো।

পিছনে বারবার বলা সেই কথাটাই এখানে আবার বলবো, তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধুর সঙ্গে যেভাবে কথা বলো, গল্প করো ঠিক সেভাবে তোমার রোজনামচা বন্ধুর সঙ্গে মুখের জিহ্বার পরিবর্তে কলমের জিহ্বার সাহায্যে কথা বলে যাও। **তুমি কিছু লিখতে বসেছো এবং লেখাটা কেমন হচ্ছে, এসব মোটেই ভাবতে যেয়ো না। সুন্দর সুন্দর শব্দ, বা বাক্য খুঁজতে যেয়ো না; অনর্গল শুধু লিখে যাও, হোক না তা কাকের ছা', বকের ছা'!** আসল কথা হলো, **অবিচল প্রতিজ্ঞা নিয়ে আজই শুরু করে দাও।"**

মাকালা বা প্রবন্ধ লেখার স্তর

মাকালা বা প্রবন্ধ লেখার আগে শুরুতে ছোট ছোট জুমলা তৈরির অনুশীলন করা উচিত। ছোট থেকে বড়ো, এরপর সামান্য বড়ো, তারপর আরেকটু বড়ো-র দিকে অগ্রসর হওয়া উচিত। এটি স্বভাবসম্মত পদ্ধতি, সহজ, লাভজনক ও উৎসাহব্যঞ্জক। এভাবে অগ্রসর হলে মাঝপথে পদস্খলন হয় না।

এরপরের স্তরে ছোট ছোট অনুচ্ছেদ লেখার অনুশীলন করতে হবে।

অনুচ্ছেদের পরিচয়

কয়েকটি স্তবক সংবলিত যে কোনো বিষয়ের ইবারতের একটি অংশ বা খণ্ডকে অনুচ্ছেদ বলে।

অনুচ্ছেদ লেখার পদ্ধতি

নির্ভুল ও বিশুদ্ধ অনুচ্ছেদ লিখতে নিম্ন বর্ণিত পদ্ধতিগুলো অনুসরণ করতে হবে:

- অনুচ্ছেদের প্রধান বাক্যটি অনুচ্ছেদের অন্তর্গত স্তবকগুলোর ব্যাখ্যা হিসেবে গ্রহণ করবে। যাতে প্রধান বাক্যটি পড়লে ভিতরের লাইনগুলোতে কী আলোচনা করা হয়েছে তা বুঝতে সক্ষম হয়। একটি বাক্য অন্য বাক্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত হবে।
- কোনো অনুচ্ছেদের প্রারম্ভে التمهيد বা المقدمة কিংবা التقديم শব্দ লিখবে না; বরং শুধু অনুচ্ছেদের প্রধান বাক্যটি লিখবে।
- রচনা লেখার মতো অনুচ্ছেদকে পয়েন্ট করে লিখবে না।
- অনুচ্ছেদের পরিশিষ্ট লিখবে। তবে الخاتمة শব্দটি লিখবে না।
- অনুচ্ছেদের বাক্যগুলোর একে অপরের সাথে সম্পর্কযুক্ত অব্যয় দ্বারা করা হবে। যেমন, الفاء ثم এ শব্দদ্বয়কে ধারাবাহিকতা বর্ণনার ক্ষেত্রে ব্যবহার করবে। এমনিভাবে ولكن প্রতিবিধানের সম্পর্ক বোঝাতে, يضاف إليه অপ্রাসঙ্গিক বিষয় উল্লেখ করতে, والسبب في ذلك কারণ বর্ণনা করতে, بالرغم من ذلك ব্যক্তিক্রম বস্তু উল্লেখ করতে, والنتيجة هي অবদান বর্ণনা করতে, للإجابة عن هذا প্রশ্নোত্তর বোঝাতে, هكذا نرى সিদ্ধান্ত বোঝাতে, مثال ذلك উদাহরণ বোঝাতে, خلاصة ما قلنا সারসংক্ষেপ বোঝাতে, السؤال هو প্রশ্নবোধক বোঝাতে ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করবে।

অনুচ্ছেদের সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য করণীয়

অনুচ্ছেদ সুন্দর হতে হলে নিম্ন বর্ণিত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে:

- একটি অনুচ্ছেদের সকল বাক্য প্রধানত একটি বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকবে।
- অনুচ্ছেদের সকল বাক্য একটি অন্যটির সাথে সম্পর্কযুক্ত হবে।
- অনুচ্ছেদের সব বাক্য স্থানের ধারাবাহিকতা অনুযায়ী সাজাবে। যেমন ডান দিক থেকে বাম দিকে কিংবা তার বিপরীত হবে অথবা দূর থেকে নিকটে কিংবা তার বিপরীত হবে। অথবা সময়ের ধারাবাহিকতা অনুযায়ী সাজাবে। যেমন অতীত কাল থেকে বর্তমান কাল, কিংবা বর্তমান কাল থেকে অতীত কাল অনুযায়ী সাজাবে। অথবা বাক্যগুলো সূত্র অনুযায়ী সাজাবে, প্রথমে কারণ উল্লেখ করে পরে তার ফলাফল লিখবে।
- অনুচ্ছেদটি বিশ্লেষণাত্মক হবে। অনুচ্ছেদের অন্তর্গত পরিভাষা রয়েছে এমন শব্দাবলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিবে। বাক্যের সম্পর্ক ঠিক রাখার জন্য যথাস্থানে বিরাম চিহ্নের ব্যবহার নিশ্চিত করবে।
- বাক্যগুলো বিশুদ্ধভাবে লেখার প্রতি গুরুত্ব দিবে। আর বিশুদ্ধতা নিশ্চিত হবে যদি বাক্যগুলোকে আরবি ব্যাকরণের নিয়ম অনুসারে লেখা হয়।

এ সকল পদ্ধতি লেখকের লেখার সৌন্দর্য বর্ধনে সহায়তা করবে এবং অনুচ্ছেদকে সুন্দর করতে সাহায্য করবে।[১]

অনুচ্ছেদ লেখার নমুনা

ব্ল্যাকবোর্ড সম্পর্কে ছোট্ট একটি অনুচ্ছেদ–

هذه سبورة؛ هي سوداء؛ هي كبيرة؛ هي تقوم على أربع قوائم.

আরো দীর্ঘ করে এভাবে লেখা যায়–

يستعملها المدرس لشرح الدرس ولذكر الموضوعات الصعبة أمام التلاميذ، لولاها لقابلنا نحن التلاميذ مشقة عظيمة في فهم الدرس، ولوجد المدرس

---

(১) আরবি ভাষায় দক্ষতা ও শিক্ষাদান পদ্ধতি, প্রফেসর ড. মোহাম্মদ ইউছুফ, পৃষ্ঠা: ১৮৪-১৮৫

كذلك مشقة في تسهيل الموضوعات وتقريبها إلى إفهامنا وترسيخها في أذهاننا. فالسبورة كأنها مدرسة، وإحسانها إلينا كبير. والمدرسة مستحقة لشكرنا جميعا، حيث أعطتنا مثل هذه الأداة المفيدة جدًا.

একটি পরিবার সম্পর্কে ছোট্ট একটি অনুচ্ছেদ-

فاطمة ربة المنزل تسكن مع زوجها في مدينة داكا. وزوجها مدرس المدرسة، ولها بنت وابنان، هي تربي الأولاد وتجهز لهم الطعام، وتنظف البيت وتغسل الثياب وتعمل أعمالا أخرى، ابنها الكبير يدرس في الصف الثامن والابن الصغير يدرس في الصف الرابع، بنتها حميدة تدرس في الصف السادس، هي بنت شريفة وذكية، تذهب كل يوم إلى المدرسة في الميعاد يعني في الساعة التاسعة والنصف صباحا، وترجع في الساعة الرابعة عصرا، وتتناول الطعام وتستريح قليلا، ثم تصلي صلاة العصر وتمشي قليلا في الحديقة وتجري فيها، ثم تساعد أمها في أعمال البيت قبل صلاة المغرب، وفي يوم العطلة أيضا تساعد أمها.

ইসলামী ভ্রাতৃত্ব সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ-

إن بلاد الإسلام كلها وطن واحد، وأبناؤها جميعا إخوة في أسرة واحدة، يعمل كل منهم لعزة الإسلام، وخير المسلمين في كل مكان من لا فضل عنده لمسلم على مسلم إلا بالتقوى، ولا امتياز لبلد من بلاد الإسلام على آخر بسبب الموقع أو الجنس، أو اللون، أو اللغة أو غيرها. وعلى المسلمين أن يصبحوا وحدة متكاتفة، يضع كل منهم يده في يد أخيه، طلبا لعزة الدين وكرامة الدنيا.

বাংলাদেশের রাজধানী সম্পর্কে লিখতে পারেন-

عاصمتنا داكا، اسمها القديم جهانغير نغر، وهي في وسط البلاد، وهي تقع على شاطئ نهر بوري غنغا، هي مدينة كبيرة، مساحتها واسعة، يحتاج للمرور من أقصاها إلى أقصاها وقتا طويلا، أحياؤها متعددة، مبانيها مرتفعة وجميلة، والشوارع طويلة واسعة. وفيها الوزارات والسفارات والمؤسسات الكبيرة والفنادق والمصارف والحركة التجارية هنا كثيرة، وفيها الحدائق والبساتين الجميلة ذات أشجار كثيفة.

وفيها الأماكن التاريخية كحصن لال باغ، وأحسن منزل، ويوجد فيها منار الشهداء والمتحف الوطني ومنتزه الأطفال وحديقة الحيوانات ومتحف حرب الاستقلال. وفي مدينة داكا يسكن حوالي خمسة عشر مليونا نسمة، وفيها كثير من المساجد والمدارس والكليات والجامعات، وهي تتسع وتتطور تدريجيا.

আম গাছ সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ-

تكثر شجرة مانجو في بلادنا يوما فيوما، والحكومة تهتم بغرس أنواعها المختلفة وتكثير ثمراتها وتجويد فواكهها بالبحوث والاكتشافات الحديثة. نحن نحب أشجار مانجو ونأكل ثمارها ونستظل بظلها، المانجو له أنواع مختلفة، ولكل نوع لذة تختلف عن لذة نوع آخر. المانجو جميلة وفي ثمرها غذاء مفيد، طعمه حلو ولذيذ، يأكله الجميع، ويقال للمانجو ملك الفواكه في بلادنا. يجب على الحكومة أن تهتمّ بشجرة المانجو حق الاهتمام إضافة إلى اهتمامها بأشجار الفواكه الأخرى، حتى نستفيد بفواكها ونكسب بتصديرها عملة خارجية كثيرة.

এভাবে ধীরে ধীরে অনুচ্ছেদ লিখতে লিখতে এক সময় মাকালা লেখার চেষ্টা করতে হবে। প্রথমেই বড়ো ও গুরুগম্ভীর বিষয়ে মাকালা লিখতে হবে তা জরুরি নয়। সাদামাটা বিষয়ে লিখলেই হবে। নিম্নে সহজ কিছু মাকালা লেখার শিরোণাম উল্লেখ করা হলো। নিম্নে বর্ণিত শিরোণামগুলো দারুল উলুম দেওবন্দের আরবি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের সাবেক প্রধান মুশরিফ মাওলানা নুর আলম খলিল আল আমিনি রহ. এর লিখিত متى تكون الكتابات مؤثرة কিতাবে গৃহিত হয়েছে–

١. فقيه كتابي الذي لن أنساه
٢. معلم عبقري تعلمت منه
٣. زيارتي الأولى لمدينة "آجرا" و"التاج محل"
٤. انطباعي الأول عن كتاب القرية
٥. تجربتي الأولى مع المدرسة ذات السكن
٦. عندما كانت تصعب عليّ قراءة الصحف العربية
٧. حادث أليم هز كياني
٨. حادث سار جدا جعلني أهتزّ فرحا
٩. الرجل الذي طالما تمنيت أن أكون مثله
١٠. أجمل مدرسة أهلية شاهدتها
١١. أنفع نظام تعليمي جربته
١٢. مسؤولية الوالدين نحو الأولاد
١٣. مسؤولية الأولاد نحو الوالدين
١٤. قيمة التأسي بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العصر
١٥. هل الإسلام انتشر بالسيف؟
١٦. لماذا يحارب الغرب الحجاب الإسلامي؟

١٧. حيرة الإنسان في البحث عن الأمن في غياب الإسلام

١٨. جدوى مواظبة حضور الفصل

١٩. مضرة كثرة الغياب عن الفصل

٢٠. مشكلات المسلمين في الدول الأجنبية

٢١. طريقتي في مذاكرة الكتب واستظهارها

٢٢. تجربتي مع الحجة الأولى

٢٣. ذكريات العيد في طفولتي

٢٤. حديقة ما رأيت مثلها

٢٥. هل هناك صراع بين الإيمان والعلم

٢٦. ماذا تعني المدرسة بالنسبة للمسلمين في شبه القارة الهندية

٢٧. ماذا تعني حرية الرأي والتعبير في الغرب

٢٨. كيف تكسب الإتقان في العلم؟

٢٩. مكانة السنة النبوية في الإسلام

٣٠. السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي

٣١. لا تتكامل الشريعة إلا بالكتاب والسنة كليهما

٣٢. مزايا المنهاج الدارسي المتبع في دار العلوم، ديوبند

٣٣. دور دار العلوم، ديوبند في الإبقاء على الكيان الإسلامي في الهند

٣٤. التعليم في العهد الإسلامي في الهند

٣٥. ماذا تريد أن تكون؟

٣٦. الحياة في القرية في طفولتي

٣٧. الفرق بين الحياة في القرية والحياة في المدينة

٣٨. بين المدرسة الدينية والمدرسة الرسمية

٣٩. دور أبي في تربيتي

٤٠. رجل أحببته في الله

٤١. تجربتي الأولى مع السفر بالقطار

٤٢. تجربتي الأولى مع السفر بالطائرة

٤٣. دور الملوك المسلمين في النهوض بالهند

٤٤. الطريق إلى كسب الأهلية العلمية

٤٥. العالم من عمل بعلمه

٤٦. السياحة: فوائدها ومضارها

٤٧. العلم النافع والعلم الضار

٤٨. فائدة القراءة

٤٩. صلة الرحم

٥٠. الأمانة الثقة بالنفس

٥١. اختيار الأصحاب

٥٢. إتقان العمل

٥٣. الاتحاد قوة

٥٤. الصحة أغلى الثروات في الحياة

٥٥. كيف نحافظ على النظافة؟

٥٦. الإسلام وحرية الاعتقاد

٥٧. مدينة أعجبتني

٥٨. أخلاق المسلم

মাকালা বা প্রবন্ধের পরিচয়

প্রবন্ধ কয়েকটি প্যারাগ্রাফের সমষ্টি এমন আলোচ্য বিষয়কে বলে, যার দ্বারা কোনো অভিমত, দৃষ্টিভঙ্গি, মতামত, অথবা কোনো বাস্তব বিষয়কে প্রমাণ করা হয়।

যে আলোচনা কোনো দৃষ্টিভঙ্গি অথবা মতামতকে প্রমাণ করে এবং একে বিশ্লেষণ করার জন্য ভূমিকা, প্রারম্ভিকা এবং দলিল-প্রমাণের মাধ্যমে সংকলন করা হয়, এর ফলে পাঠক কোনো সূক্ষ্মজ্ঞান অথবা কোনো তাৎপর্যপূর্ণ তত্ত্ব বা তথ্য জানতে পারে তাকে মাকালা বা প্রবন্ধ বলে।

ড. মুহাম্মদ ইউসুফ নাজম বলেন, মাকালা বা প্রবন্ধ হলো:

هو نص يدور حول موضوع معين وله مقومات تتمثل في المقدمة والعرض والخاتمة.

"এমন গদ্য যা নির্দিষ্ট বিষয়ে রচনা করা হয় এবং এর মধ্যে তিনটি উপাদান থাকে, ভূমিকা, মূল বিষয়ের বর্ণনা ও পরিশেষ।"[১]

ড. ইবরাহিম ইমাম বলেন,

لا ينبغي أن يكون للمقال ضابط من نظام ولا تجري على نسق معين فكاتب المقال له حرية في صياغة أفكاره وتأملاته.

"প্রবন্ধ লেখার কিছু নিয়ম পদ্ধতি রয়েছে। নির্দিষ্ট নীতিতে লিখতে হবে না, বরং এক্ষেত্রে প্রবন্ধকারের পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে। তিনি স্বীয় চিন্তা-ভাবনার আলোকে এটাকে সাজাবে।"[২]

মাকালা বা প্রবন্ধ সম্পর্কে বিদগ্ধ লেখক ও গবেষক ড. হায়াৎ মামুদ 'ভাষা-শিক্ষা' গ্রন্থে বিস্তারিত লিখেছেন। সেখানে তিনি লিখেছেন, প্রবন্ধ শব্দের অর্থ

---

(১) ফান্নুল মাকালাহ, পৃষ্ঠা: ৯৪; আরবি ভাষায় দক্ষতা ও শিক্ষাদান পদ্ধতি, প্রফেসর ড. মোহাম্মদ ইউছুফ, পৃষ্ঠা: ১৮৫

(২) দিরাসাত ফিল ফান্নিস সাহাফি, পৃষ্ঠা: ১০০; আরবি ভাষায় দক্ষতা ও শিক্ষাদান পদ্ধতি, প্রফেসর ড. মোহাম্মদ ইউছুফ, পৃষ্ঠা: ১৮৬

'প্রকৃষ্ট বন্ধন'। প্রকৃতপক্ষে ভাব ও ভাষার বন্ধন। অর্থাৎ ভাষাকে অবলম্বন করে ভাব প্রকাশিত হয়। ভাবকে বহনও করে ভাষা। তাছাড়া ভাব অনুযায়ী ভাষা তার চেহারা ও রূপেরও পরিবর্তন ঘটায়। ভাব গুরুগম্ভীর হলে ভাষা সে অনুযায়ী গুরুগম্ভীর হয়। ভাব হালকা-চটুল হলে ভাষা হয় হালকা চটুল। হাসি, কান্না, ঘৃণা, রাগ যখন যেমন রসাশ্রিত ভাবের প্রকাশ হয়, ভাষাও হয় সেই মতো। ভাব-ভাষার বন্ধন যথাযথ হলে সে রচনাদেহে সাহিত্যগুণের বিকাশ ঘটে। তার সঙ্গে যথোপপুক্ত তথ্য, তত্ত্ব, দৃষ্টান্তের প্রয়োগে বক্তব্যের বিষয়টি সবিস্তারে সাজিয়ে নিলে প্রবন্ধের সুঠাম সুসংহত অবয়বটি গড়ে ওঠে।

কাজেই কোনো মননশীল ভাব কিংবা তথ্য বা তত্ত্ব উপযুক্ত ভাষার মাধ্যমে যুক্তি-পরম্পরায় সুসংহতভাবে প্রকাশ হয়ে শিল্পরূপ লাভ করলে, আমরা তাকে বলি 'প্রবন্ধ'। প্রবন্ধ যে মননশীল ও যুক্তিধর্মীই হতে হয় তা নয়, অনুভূতিপ্রধান, আবেগময়ী, বুদ্ধিদীপ্ত কিংবা অন্তরঙ্গ চিন্তাধর্মীও হতে পারে। ব্যক্তিভেদে প্রবন্ধের প্রকাশভঙ্গি, পরিবেশন-রীতি, যুক্তি প্রয়োগের পদ্ধতি, বিশ্লেষণী ক্ষমতা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন হওয়া স্বাভাবিক। একই বিষয়ের প্রবন্ধ বিভিন্ন লেখকের রচনায় ভিন্ন ভিন্ন শিল্প-শৈলীতে প্রকাশিত হয়। যেকোনো রচনায় রচয়িতার ব্যক্তি স্বাতন্ত্রই স্পষ্ট আকারে ধরা পড়ে।

উন্নতমানের শিল্পসৃষ্টি বাঁধা-ধরা নিয়ম-নির্দেশের অনুসারী হয় না। প্রতিভাবান প্রবন্ধকারেরা প্রথাগত নিয়ম-নির্দেশের তোয়াক্কা না করে আপন প্রতিভাশক্তির বলে অভূতপূর্ব শিল্প-সৃষ্টির নজির রেখে যান। তাঁদের দীর্ঘ অনুশীলনের ফলে অর্জিত নৈপুণ্যের স্বাক্ষর থাকে প্রবন্ধের প্রতিটি ছত্রে।

অনুশীলন চিন্তার গভীরতা আনে, যুক্তি-প্রয়োগের ক্ষমতা বাড়ায়, পরিমিত-বোধ অধিগত করায়, সুসংহতভাবে বক্তব্য-পরিবেশনের ক্ষমতা গড়ে, উপযুক্ত ভাষা-ব্যবহারের নৈপুণ্য এনে দেয়। সেজন্যে শিক্ষার্থীর প্রবন্ধ রচনায় নিয়মিত অনুশীলন অপরিহার্য।

মাকালা বা প্রবন্ধের অঙ্গ বিভাজন

মাকালা বা প্রবন্ধে সাধারণত তিনটি অংশ থাকে। ১. الافتتاح তথা ভূমিকা। ২. الموضوع বা মূল অংশ। ৩. الاختتام বা উপসংহার।

- الافتتاح তথা ভূমিকা: প্রবন্ধের প্রারম্ভিক অঙ্গ প্রস্তাবনা বা ভূমিকা। প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়ে প্রবেশের দরজা। সূচনা-পর্বটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেজন্য ভূমিকা অংশের ওপর মূল বিষয়গত ভাবের প্রতিফলন এমনভাবে হওয়া দরকার যে, প্রবন্ধের মূল বিষয়ে উত্তরণের দ্বার তো খুলেই যাবে, সেই সঙ্গে বিষয়টি হৃদয়গ্রাহী হয়ে পাঠকের কাছে আকর্ষণীয় হবে। ভূমিকা যাতে অপ্রাসঙ্গিক ও অনাবশ্যক বাহুল্য দোষে দুষ্ট না হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

- الموضوع বা মূল অংশ: ভূমিকার পর প্রবন্ধের মূল বিষয়ের আলোচনা শুরু হয়। মূল বক্তব্য পরিবেশনের আগে বিষয়টিকে প্রয়োজনীয় সংকেত পয়েন্টে ভাগ করে নিতে হয়। সংকেত-সূত্রের বিষয়টি রক্ষা করে প্রবন্ধের অবয়বকে সুসংহতভাবে গড়ে তুলতে হয়। প্রতিটি সংকেত কতটুকু বিস্তার হবে তা তার প্রকাশের পূর্ণতার ওপর নির্ভরশীল। কাজেই আয়তনগত পরিমাপ নির্দিষ্ট নেই। প্রতিটি সংকেতের ওপর প্রয়োজনীয় গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করতে হয়। যাই হোক, এভাবে আলোচনার বিস্তার হতে হতে মূল ভাবটি একটি সিদ্ধান্তমূলক সমাপ্তির দিকে এগোয়।

- الاختتام বা উপসংহার: সিদ্ধান্তমূলক সমাপ্তির অংশ মাকালা বা প্রবন্ধের উপসংহার। সূচনার মতো সমাপ্তিরও আছে সমান গুরুত্ব। নদী যেমন উৎস-দ্বার থেকে যাত্রা করে গতি পথের নানা বৈচিত্র্য পেছনে ফেলে, মোহনায় এসে বিশাল জলরাশির মধ্যে নিজেকে নিঃশেষ ও বিলীন করে দিয়ে দীর্ঘ পথ অতিক্রমকে সার্থক করে। প্রবন্ধের ভাববস্তু তেমনি ভূমিকার উৎস-দ্বার থেকে ক্রমাগতি ও ক্রমবিকাশের ধারা বহন করে উপসংহারে এসে একটি ভাবব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে সমাপ্তির ছেদ-রেখা টানে। প্রবন্ধে লেখকের ব্যক্তিগত অভিমত প্রকাশের যথেষ্ট অবকাশ থাকে। উপসংহারে একদিকে যেমন আলোচনার সিদ্ধান্তে উপনীত হন লেখক, অপরদিকে তেমনি লেখকের নিজস্ব অভিমতের আশা-আকাঙ্ক্ষার সার্থক প্রতিফলন ঘটে।

মাকালা বা প্রবন্ধের ভাষা কেমন হবে?

মাকালা বা প্রবন্ধের বিষয় ও ভাব অনুযায়ী ভাষা হয়। বলাই বাহুল্য, চিন্তাশীল মননধর্মী প্রবন্ধের ভাষা হয় সাধারণত গুরু-গম্ভীর, লঘু-আবেগধর্মী প্রবন্ধের ভাষা হয় আবেগপ্রবণ।

প্রবন্ধের বক্তব্য প্রকাশের ভাষা সহজবোধ ও প্রাঞ্জল হবে। পাঠক যেন লেখকের বক্তব্য বিনা আয়াসে ঠিক ঠিক বুঝতে পারেন। অনাবশ্যক বাহুল্য কথা প্রবন্ধের যাতে ক্ষতি না করে সে ব্যাপারে সতর্ক ও যত্নবান হতে হয়।

মাকালা বা রচনা লেখার ক্ষেত্রে কী কী বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা জরুরি

মিশরের তিনজন অত্যন্ত দক্ষ ও সফল উসতাদ এবং প্রতিষ্ঠিত লেখক মাহমুদ ওমর, আস-সাঈদ মাহজুব ও আলি উতাইবা যৌথভাবে একটি চমৎকার কিতাব লিখেছেন। কিতাবটির নাম হলো "معلم الإنشاء"।[১] মাকালা বা রচনা লেখার ক্ষেত্রে কী কী বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা জরুরি তাঁরা এই কিতাবে তার একটি দিক নির্দেশনা প্রদান করেছেন। তা হলো–

- শিরোনামের প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা এবং তার উদ্দেশ্য ভালোভাবে বুঝা জরুরি। যেন উদ্দেশ্য অনুধাবন করতে কোনো ভুলের স্বীকার হতে না হয়। কিংবা আলোচ্য বিষয়ের কোনো অংশ বাদ পড়ে না যায়। উদাহরণস্বরূপ, তোমাকে যদি মাদরাসার বিবরণ দিতে বা নদীর উপকারিতা সম্পর্কে একটি মাকালা বা প্রবন্ধ লিখতে বলা হয়, তাহলে তুমি মাদরাসার আঙ্গিনার বিবরণ দেওয়াকে আলোচনার প্রধান অংশ বানিয়ে ফেলো না। অথবা নদীর উপকারিতার আলোচনা পদ্মা নদীর উপকারিতা বর্ণনায় সীমাবদ্ধ করে ফেলো না।

  তোমাকে একথা জানতে হবে যে, আলোচ্য বিষয় কোনো জিনিসের শুধু বিবরণ দান, নাকি শুধু তার উপকারিতার বর্ণনা প্রদান, না উভয়টি একসঙ্গে। উদ্দেশ্য কি শুধু এক পক্ষের গৌরব প্রকাশ, না দুই পক্ষের গৌরব প্রতিযোগিতা, নাকি আত্মকথা।

---

(১) নাদওয়াতুল উলামা লাখনৌ থেকেও معلم الإنشاء নামে একটি কিতাব প্রকাশিত হয়েছে। আমাদের এখানে সেটি উদ্দেশ্য নয়।

- শিরোনামের শব্দাবলি পূর্ণ মনোযোগের সাথে দেখা আবশ্যক। কেননা, এমন হওয়ারও আশঙ্কা আছে যে, একটি নুকতা বা হরকতের কারণে তুমি উদ্দেশ্য বুঝতে ভুল করবে। লক্ষ্যচ্যুত হবে। অন্য এমন এক বিষয়ে লেখা তৈরি করে ফেলবে যা তোমার কাছে চাওয়া হয় নি। উদাহরণস্বরূপ السباحة (সাঁতার), السياحة (ভ্রমণ), النخلة (খেজুর গাছ), النحلة (মৌমাছি), البحار (সাগর), البخار (বাষ্প), العَلَمُ (পতাকা), العِلْمُ (জ্ঞান), الدَّين (ঋণ), الدِّين (ধর্ম) ইত্যাদি ক্ষেত্রে তোমার ভুল হওয়ার আশঙ্কা আছে।

  সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দ অনুধাবনেও তোমার ভুল হওয়ার আশংকা রয়েছে। যেমন ধর, প্রধান (বড়ো), প্রদান (দেওয়া), দীপ (প্রদীপ), দ্বীপ (চারদিকের পানি বেষ্টিত স্থান), উপাধান (বালিশ), উপাদান (উপকরণ), দিন (দিবস), দীন (দরিদ্র) ইত্যাদি একটির স্থলে আরেকটি বুঝলে।

- শিরোনামের উদ্দেশ্য ভালোভাবে বোঝার পর সব দিক থেকে আলোচ্য বিষয়ে চিন্তা করো। অন্বেষণ ও অনুসন্ধানে তোমার কল্পনাশক্তিকে উন্মুক্ত করে ছেড়ে দাও। সংশ্লিষ্ট সব বিষয় একত্র কর। উদাহরণস্বরূপ 'বাদলা দিন' এর বিবরণ দানের ক্ষেত্রে বৃষ্টি নামার পূর্বে আবহাওয়ার অবস্থা, এরপর বৃষ্টির পূর্বক্ষণে প্রকৃতির তাণ্ডব, তারপর বৃষ্টিবর্ষণ ইত্যাদি তোমার মনে উদিত হওয়া জরুরি। মানুষের অবস্থা, যানবাহন ও রাস্তাঘাটের অবস্থা এবং বৃষ্টি পরবর্তী জন-জীবনের কর্ম-তৎপরতা ইত্যাদি তোমার স্মরণ হওয়া জরুরি।

- কৃষি, ব্যবসা, শিল্প, স্বাস্থ্য, সমাজ, চরিত্র ইত্যাদির সঙ্গে তোমার প্রবন্ধের বিষয়টির কতটুকু সম্পর্ক আছে, তদ্রুপ তোমার পঠিত বিভিন্ন বিষয়ের সাথে আলোচ্য বিষয়ের সম্পর্ক কতটুকু, নিজেকে তোমার এ কথা জিজ্ঞেস করতে হবে। তাহলে তা তোমার আলোচনার অনেক উপাদান সংগ্রহে সহায়তা করবে।

- মনে যখন যে ভাব উদিত হয়, তা তৎক্ষণাৎ নোট করে নিবে। কারণ, পরে হয়তো তুমি ভুলে যাবে। এভাবে মনের সব কথা খাতায় টুকে নেয়ার পর, অস্তিত্ব লাভের ধারাবাহিকতা অনুসারে সেগুলোকে বিন্যস্ত করবে।

যেমনটি তুমি 'বাদলা দিন' শিরোনামের উপরোক্ত বিশ্লেষণে লক্ষ্য করেছো। অথবা অধিক গুরুত্বপূর্ণ অংশকে সাধারণ গুরুত্বপূর্ণ অংশের পূর্বে উল্লেখ করবে। যেমন, কাঁঠাল গাছের উপকারিতা লিখতে গিয়ে প্রথমে কাঁঠালের উপকারিতা, তারপর বীচির উপকারিতা, এরপর লাকড়ির উপকারিতার কথা লিখলে।

- তারপর প্রতিটি উপাদানকে একেকটি স্বতন্ত্র আলোচ্য বিষয় ধরে প্রত্যেকটির আবার কয়েকটি পার্শ্ব তৈরি করবে। এরপর বিন্যাস অনুসারে সেগুলোর পর্যাপ্ত ব্যাখ্যা করবে।

- الواو، الفاء، ثم، وكذلك، هذا إلى أن، وأيضا، ومما هو جدير بالذكر، وغير خاف، كما أن ইত্যাদির মাধ্যমে বিষয়ের অংশগুলোর মধ্যে সংযোগ রক্ষা করে প্রতিটি উপাদানকে নতুন অনুচ্ছেদে লিখবে।

- মুখস্ত অংশসমূহ মনে উপস্থিত রাখবে এবং উপাদানগুলো ব্যাখ্যা করার সময় সেসব নির্বাচিত শব্দ ও বাক্য উপযোগী স্থানে প্রয়োগ করবে।

রচনায় অগ্রসর হওয়ার সহায়ক কিছু নির্দেশিকা

এই معلم الإنشاء কিতাবের একেবারে শুরুতে রচনায় অগ্রসর হওয়ার সহায়ক কিছু সাধারণ নির্দেশিকা রয়েছে, যেগুলো স্মরণ রাখা শিক্ষার্থীদের জন্যে জরুরি। সেগুলোর মধ্যে কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হলো–

- সর্বদা বিশুদ্ধ ভাষায় কথা বলা জরুরি। যেন মনের ভাব সঠিকভাবে ব্যক্ত করার অভ্যাস গড়ে উঠে। এই অভ্যাস রচনা লেখার ক্ষেত্রে তোমাকে সহায়তা করবে। কেননা, রচনা তো লিখিত কথা-ই।

- পত্র-পত্রিকা, ম্যাগাজিন-সাময়িকী ইত্যাদিতে গুরুত্বপূর্ণ অনেক তথ্য থাকে। আগ্রহের সঙ্গে সেগুলো পড়বে। তাহলে সেগুলো তোমার রচনায় প্রভাব ফেলবে। তখন তোমার রচনা সমৃদ্ধ হবে এবং সংশ্লিষ্ট যেকোনো বিষয়ে চিন্তা করার সময় রচনার উপাদান পর্যাপ্ত পাবে।

[আল কলম পত্রিকার এক জায়গায় এ উপদেশটি আছে– "লেখার জন্য প্রধান শর্ত হলো সঞ্চয় ও সরবরাহ। অর্থাৎ নিয়মিত পঠন ও অধ্যয়নের

মাধ্যমে মস্তিষ্কে ভাব ও ভাষার বিপুল পরিমাণ সঞ্চয় গড়ে তোলা, যাতে প্রয়োজনের সময় মস্তিষ্ক তোমার কলমকে ভাব ও ভাষা সরবরাহ করতে পারে। লেখার অনুশীলন যতবেশি হবে, মস্তিষ্ক থেকে ভাব ও ভাষার সরবরাহ তত সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত হবে।"]

- নির্দিষ্ট কোনো বিষয় অধ্যয়নের উপকারিতা শুধু ঐ বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকে না। অতএব, যেকোনো বিষয়ের কোনো লেখা তোমার পড়া থাকলে, তা দ্বারা অন্য বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রেও উপকৃত হতে চেষ্টা কর। যেমন ধর, স্বাস্থ্য-পরিচর্যা বিষয়ে একটি লেখা তোমার পড়া আছে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে লিখতে গিয়ে তুমি তা দ্বারা উপকৃত হতে পারো। অথবা ভূগোল বিষয়ে একটি লেখা কখনো তুমি পড়েছো। তাহলে নদী, সূর্য ও সাগর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে তা দ্বারা উপকৃত হতে পারো। ইতিহাস বিষয়ক কোনো লেখার অধ্যয়ন তোমার জন্য প্রাচীন নিদর্শন ও সামাজিক বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে সহায়ক হতে পারে।

  [জ্ঞান অন্বেষণের একটি অন্যমত মাধ্যম হলো অধ্যয়ন করা। আরেকটি মাধ্যম হলো জীবন ও জগত থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়। বিখ্যাত ভাষাবিজ্ঞানী প্রয়াত লেখক হুমায়ুন আজাদ ছোটদের একটা উপদেশ দিয়ে বলেছেন- "তোমরা এখন ছোট। এখন থেকেই তোমাদের চারপাশের পরিচিত অপরিচিত সবকিছু দেখ, যত পারো দেখ এবং দেখ। সবকিছু নিয়ে চিন্তা করো। যত পারো চিন্তা করো। বুকের মধ্যে জমা করো। দেখা, শোনা ও জানার পরিমাণ যত পারো বৃদ্ধি করো। এগুলোই হবে তোমার লেখার মাল-মশলা। যারা দেখে না, শোনে না, চিন্তা করে না এবং বুকের মধ্যে জমা করে না, তারা লেখক হতে পারে না।]

লেখালেখি বিষয়ে মাওলানা নুর আলম খলিল আমিনি রহ. এর কিছু উপদেশ

মাওলানা নুর আলম খলিল আমিনি রহ. লেখালেখি বিষয়ে কিছু উপদেশ প্রদান করেছেন। তন্মধ্যে হতে নিম্নে কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ উল্লেখ করা হলো-

- যা কিছু অধ্যয়ন করবে তা নিজের কৃত্রিমতামুক্ত ভাষায় লিখে ফেলবে। অধ্যয়ন করা বই বা প্রবন্ধের শব্দ ও বাক্য যদি মাঝে মধ্যে কোথাও এসে যায়, তাহলে অসুবিধে নেই। আর যদি না আসে, তাহলেও কোনো ক্ষতি নেই। মনের ভাব নিজের ভাষায় প্রকাশ করা উচিত।

- দৈনিক এক পৃষ্ঠাই হোক, অবশ্যই রোজনামচা লিখবে। কারো মেহমানদারী করা, কোথাও ঘুরতে বের হওয়া, কারো সঙ্গে সাক্ষাৎ করা, বাজার থেকে কোনো সদায় করা, কোনো ঘটনা ঘটা, আনন্দের বা বেদনার কোনো পৌরাণিক নিদর্শন দেখতে যাওয়া, মোট কথা যে ধরনের ঘটনাই হোক, নিজস্ব ভঙ্গিতে, নিজের জ্ঞান, ভাষা ও অধ্যয়নের আলোকে অকৃত্রিমভাবে লেখার চেষ্টা করা উচিত।

  আমি [মাওলানা নুর আলম খলিল আমিনি রহ.] পূর্ণ নিশ্চয়তার সঙ্গে বলছি– "দৈনিক অধ্যয়ন ও উপরোক্ত নিয়মে লেখার অনুশীলন একজন ছাত্রের মধ্যে, অল্প সময়ে সৃজনশীল লেখার যোগ্যতা সৃষ্টি করতে পারে। এরপর অন্বেষণের রুচি ও সফরের কৌতূহল তাকে একজন প্রাবন্ধিক, কলামিষ্ট, স্বতন্ত্র বাক-রীতির অধিকারী সাহিত্যিক এবং লেখক ও গবেষক বানাতে পারে।

- যথাযথ লেখার চেষ্টা করবে। অর্থাৎ ভাবের আবেশে না জড়িয়ে যে জিনিস যেমন, তা সেভাবেই চিত্রায়ণ করার প্রতি মনোযোগ দিবে।

- মনে যেসব ভাব ও চিন্তা উদিত হয়, নিজের ভাষায় অবশ্যই সেগুলো লিখে নিবে। নিজের কথা নিজের ভাষায় প্রকাশ করা অত্যন্ত সহজ। সুতরাং এই সহজ ব্যবস্থাপত্র হাতছাড়া করা উচিত নয়।

- কোনো বিষয়ে লিখিত একটি প্রবন্ধ পড়ে, কমিয়ে বাড়িয়ে অনুরূপ আরেকটি প্রবন্ধ লিখতে চেষ্টা করবে। এই গ্রহণ ও বর্জন দ্বারাও লেখার যোগ্যতা অর্জন হয়। এর পদ্ধতি এই যে–

  প্রবন্ধটি বারবার পড়ে দেখা উচিত, তাতে কীসের অভাব আছে। কোন দিকটি রয়ে গেছে। এ অবস্থায় অসম্পূর্ণতার দিকসমূহ দূর করা যায়। উদ্ধৃতির দুর্বলতাসমূহের প্রতিকার করা যায়।

কিংবা প্রবন্ধটি দীর্ঘ, মানুষ তা পড়ে বিরক্তি বোধ করে। তাহলে মূল গতি ঠিক রেখে, অতিরিক্ত আলোচনা বাদ দিয়ে, দৈর্ঘ্য কমিয়ে, শিরোনাম পরিবর্তন করে এবং বিন্যাস পূর্ব থেকে আরো সুন্দর করে, একটি সুন্দর প্রবন্ধ তৈরি করা যায়।

দশ-বিশটি প্রবন্ধে গ্রহণ ও বর্জনের এই চর্চা দ্বারা, কলম আশাতীত গতিশীল ও শক্তিশালী হয়ে উঠবে ইনশাআল্লাহ।

- লেখার যোগ্যতা যখন এসে যায়, কলমটাও যখন কিছুটা সচল হয়ে যায় এবং পরিবর্তন-পরিবর্ধনের তেমন দরকার হয় না, তখন নির্দিষ্ট কোনো একজন লেখকের লেখাই বেশী বেশী পড়া উচিত। তাঁর রীতি-নীতি, নিয়ম-পদ্ধতি, রুচি-অভিরুচি ও চিন্তা-চেতনা বুঝার ও গ্রহণ করার চেষ্টা করা উচিত। তাঁর লেখার ঋতু ও পরিবেশে বসবাস করা এবং তার সাথে মন মিলানোর পদ্ধতি শেখা দরকার।[১]

প্রবন্ধ রচনায় উন্নতি সাধনে যে বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক

মাওলানা সুলতান যওক নাদাবি দা. বা. তাঁর লিখিত "আততরিক ইলাল ইনশা (৩য় খণ্ড)" কিতাবে প্রবন্ধ রচনায় উন্নতি অর্জনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কিছু নির্দেশনা উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন–

- সর্বদা আরবি ভাষায় কথা বলা তোমার জন্য আবশ্যক। যাতে তুমি বিশুদ্ধভাবে মনের ভাব ব্যক্ত করতে অভ্যস্ত হও। কেননা, তা প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে তোমাকে সাহায্য করবে। কেননা প্রবন্ধ বা রচনা একটি লিখিত কথা ছাড়া কিছু নয়।

- অধ্যয়নের পাঠগুলোতে তুমি যা পড়েছো, সেগুলো নিজের পক্ষ থেকে বানানো আরবি বাক্যের মাধ্যমে ব্যক্ত করা তোমার জন্য একান্ত জরুরি। নতুন নতুন আভিধানিক শব্দ এবং ভালো ভালো বচনপদ্ধতির প্রতি তোমাকে আগ্রহী হতে হবে; যেন তোমার রচনার সাথে মুনাসিব জায়গায় ব্যবহার করতে পারো। এতে রচনা মনোমুগ্ধকর, সূক্ষ্ম ও সুন্দর হবে।

---

(১) আরবি ভাষা পাঠদান পদ্ধতি, পৃ: ১৪২-১৪৭

- তদ্রুপ অধ্যয়নকৃত পাঠগুলোতে বড়ো উপকারী বিভিন্ন জ্ঞানপূর্ণ বিষয় রয়েছে সেগুলো অর্জন করার প্রতি তুমি আগ্রহী হবে। এতে রচনার মূল উপাদানসমূহ বৃদ্ধি পাবে এবং সেসব জ্ঞানগত বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত যে কোনো বিষয়বস্তু লেখার ব্যাপারে চিন্তা করার সময় তুমি অধিক পরিমাণ মূল উপাদান পাবে।

- প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে মুখস্ত পাঠসমূহের অনেক প্রভাব রয়েছে, তাই সর্বদা লেখার সময় তোমাকে সেগুলো মনে রাখতে হবে। যাতে তুমি এগুলোর বচনভঙ্গি ও ভাবার্থ থেকে উপকৃত হতে পারো এবং তোমার আলোচ্য বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিষয়গুলো থেকে পাথেয় অর্জন করতে পারো।

- তোমার অধ্যয়নকৃত মৌলিক বিষয়সমূহ, যেমন, সুস্থতার প্রতি মনোযোগ প্রদান, বিভিন্ন জ্ঞানের প্রাথমিক বিষয়সমূহ এবং ভূগোল শাস্ত্র ভালোভাবে জানা আবশ্যক। তাহলে তুমি এসব মৌলিক বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ের প্রতিবেদন তৈরি করার সময় এ থেকে উপকৃত হতে পারবে। যেমন, সুস্বাস্থ্য সম্পর্কিত জ্ঞান তোমাকে "পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা" বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে সহাযোগিতা করবে। আর ইতিহাস বিষয়ক জ্ঞান "প্রাচীন নিদর্শন সমূহ" সম্পর্কে লেখায় এবং সমাজ-বিষয়ক বিষয়বস্তু লিখতে তোমাকে সাহায্য করবে।

- দৈনিক পত্রিকা, মাসিক ম্যাগাজিন ও অন্যান্য পুস্তকে অনেক জ্ঞানগর্ভ বিষয় এবং সুন্দর সুন্দর বচনভঙ্গি ও বাকপদ্ধতি রয়েছে। তুমি যদি এগুলো অধ্যয়নের প্রতি মনোযোগী হও তাহলে অনেক উপকৃত হতে পারবে। তাই এগুলোর প্রতি তোমার বিশেষ মনোযোগ নিবদ্ধ করতে হবে, যেন বিষয়টি তোমার প্রবন্ধ রচনায় প্রভাব সৃষ্টি করে।

- তোমার সম্মুখে সময়-সুযোগে প্রকাশ পায় এমন অনুষ্ঠানপর্ব থেকে কোনো বিষয়ের উপর লিখতে আগ্রহী হওয়া বাঞ্ছনীয়। যেমন, বন্ধুর নিকট পত্র লেখা, অথবা তুমি কোনো ভ্রমণ করেছ, বা তুমি কোনো সভা-অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছ তার বর্ণনা লিখবে।

প্রবন্ধ রচনায় যেসব ভুল-ত্রুটি হয়ে থাকে

এখন আলোচনা করব এমন কিছু ভুল সম্পর্কে, যে ভুলগুলো প্রবন্ধ লেখার ক্ষেত্রে অধিকাংশ তালিবুল ইলম করে থাকে।

- মূল আলোচ্য বিষয় থেকে দূরে সরে যাওয়া, অথবা তার কোনো অংশ ভুলে যাওয়া। অনেক সময় আমরা যে বিষয়ে প্রবন্ধ লেখা শুরু করি সে বিষয়টি ভুলে যাই এবং মূল আলোচ্য বিষয় থেকে সরে গিয়ে অন্য বিষয়ে আলোচনা করতে থাকি। যেমন, কেউ গ্রাম সম্পর্কে প্রবন্ধ লিখতে ইচ্ছে করল। আলোচনার একপর্যায়ে গ্রামের মসজিদের কথা এলো। তখন গ্রাম নিয়ে আলোচনা করার পরিবর্তে শুধু মসজিদ নিয়েই আলোচনা করতে লাগলো। এমন ভুল করা যাবে না। নতুবা প্রবন্ধের মান নষ্ট হয়ে যাবে।

- শব্দ বা অর্থের পুনরাবৃত্তি। প্রবন্ধের মূল উপাদানসমূহের বিন্যাসকে ধীরে ধীরে পর্যবেক্ষণ করার মাধ্যমে, অর্থের পুনরাবৃত্তি থেকে বাঁচা সম্ভব। আর اسم ظاهر কে বারবার উল্লেখ করার পরিবর্তে اسم ضمير ব্যবহার করার মাধ্যমে শব্দের পুনরাবৃত্তিকে এড়িয়ে চলা সম্ভব। যেমন- তুমি বলবে, للسفن فوائد كثيرة، فإنها تنقل البضائع (অর্থাৎ, স্টিমারের উপকারিতা অনেক। কেননা তা বাণিজ্যিক পণ্যসামগ্রী এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বহন করে নিয়ে যায়) এখানে فإن السفن না বলে فإنها বলবে। তবে হ্যাঁ কোথাও কোথাও اسم ظاهر এর পুনরাবৃত্তিই উত্তম হবে। কোথায় اسم ظاهر কে পুনরাবৃত্তি গ্রহণযোগ্য হবে আর কোথায় হবে না এ ব্যাপারে বালাগাত শাস্ত্রে বিশদ বিবরণ রয়েছে।

- اسم الإشارة، اسم موصول، ضمير ব্যবহারের ক্ষেত্রে ভুলের শিকার হওয়া। অর্থাৎ এগুলোর মুজাক্কার, মুআন্নাস, একবচন ও বহুবচনের মাঝে কোনো ব্যবধান না করে সব জায়গায় একই ধরনের শব্দ ব্যবহার করা। এজাতীয় ভুল-ত্রুটি থেকে বাঁচার জন্য অবশ্যই 'নাহু' তথা আরবি ব্যাকরণ শাস্ত্রে নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে।

- বাক্য সামঞ্জস্যহীন, দুর্বোধ্য ও অস্পষ্ট হওয়া এবং এমন নিষ্প্রয়োজনীয় লম্বা-চৌড়া বাক্য ব্যবহার করা, মূল উদ্দেশ্য ও ভাব প্রকাশ করতে যার কোনো প্রয়োজন নেই।

- কাব্য পংক্তিমালা, উদাহরণ এবং তত্ত্বপূর্ণ বাণীকে সামঞ্জস্যহীন জায়গায় উল্লেখ করা। তোমার জন্য আবশ্যক হলো, এগুলোকে সামঞ্জস্যপূর্ণ উপাদানে অর্থাৎ এগুলোর অর্থের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ আলোচনার পর তা ব্যবহার করা।

- যে বিষয়টি লেখার বিষয়বস্তুর মান ক্ষুণ্ন করবে তা হলো, ইরাব সংক্রান্ত এবং ইমলা সংক্রান্ত ভুল-ত্রুটি।

ইরাব সংক্রান্ত ভুল-ত্রুটি: যেমন, তুমি مرفوع শব্দকে مجرور লিখলে। অথবা مجرور এর জায়গায় مرفوع লিখলে। উদাহরণস্বরূপ, তুমি নিম্নোক্ত বাক্যটিতে إن الإخوان المواطنين এর পরিবর্তে إن الإخوان المواطنون লিখলে। অনুরূপ المسلمون في الهند এর পরিবর্তে المسلمين في الهند লিখলে।

ইমলা সংক্রান্ত ভুল-ত্রুটি, যেমন: ناقص واوي এর فعل ماضي কে ياء দিয়ে লিখা। অথচ তা লিখতে হবে আলিফ দ্বারা। সুতরাং دعا সঠিক। আর دعى ভুল। عفا সঠিক। আর عفى ভুল। অথবা ناقص يائي কে ألف দিয়ে লেখা। অথচ তা লিখতে হবে ياء দ্বারা। সুতরাং مشى সঠিক। আর مشا ভুল। অনুরূপভাবে ألف এবং همزه কে সংশ্লিষ্ট رسم الخط এর নিয়মনীতির পরিপন্থী লেখা।

আরবিতে ভ্রমণ কাহিনি কীভাবে লিখব

আমরা সবাই কোথাও না কোথাও ভ্রমণ করি। ভ্রমণ শেষে সেই ভ্রমণ কাহিনি আরবিতে খাতায় লিখে রাখতে পারি। এতে ভ্রমণের স্মৃতিটি ইতিহাসের পাতায় সংরক্ষিত থাকবে। অপরদিকে আরবিতে লেখার যোগ্যতাও বৃদ্ধি পাবে। প্রতি মাসে অন্তত একটি করে ভ্রমণ কাহিনি লেখা

উচিত। এখন প্রশ্ন হলো, ভ্রমণ কাহিনি কীভাবে লিখব? ভ্রমণ কাহিনি লেখার ক্ষেত্রে অনেক বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হয়। যেমন, ভ্রমণটা কী উদ্দেশ্যে হচ্ছে, কোথায় হচ্ছে, প্রস্তুতি, যানবাহনের ভ্রমণের চিত্র, রাস্তায় সুখ-দুঃখের কোনো স্মৃতি, সফরের ক্লান্তি, আনন্দ, বিশেষ কোনো দৃশ্য, যেখানে ভ্রমণ করা হয় সেখানের পরিবেশ, মানুষ, কীভাবে সফরের সময়টা কাটানো হলো, কোন কোন জায়গায় যাওয়া হলো, সফরসঙ্গীদের বিবরণ, খাওয়া-দাওয়া, ফেরা, ভ্রমণ সম্পর্কে মনের অনুভূতি, ভ্রমণকালীন অতীতের ফেলে আসা কোনো স্মৃতি মনের আয়নায় ভেসে ওঠা ইত্যাদি।

একটি ভ্রমণ কাহিনি পাঁচশত পৃষ্ঠায়ও লেখা যায়। আবার পাঁচ পৃষ্ঠায়ও লেখা যায়। প্রাথমিক অবস্থায় বড়ো আকারে না লিখে ছোট আকারে লেখার অনুশীলন করা চাই।

চিঠিপত্রের পরিচয় ও পত্রের প্রয়োজনীয়তা

কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে মানবমনের কোনো ভাব, সংবাদ, তথ্য, আবেদন ইত্যাদি অপরের কাছে লিখিতভাবে জানানো হলে তাকে সাধারণভাবে পত্র বা চিঠি বলে। চিঠি লেখার রীতি আমাদের সংস্কৃতির এক অনুষঙ্গী উপাদান। কাগজ আবিষ্কারের পূর্বে মানুষ গাছের পাতায়, ছালে, চামড়ায়, ধাতব পাতে লিখত। পাতায় লিখত বলেই এর নাম হয় 'পত্র'।

চিঠিপত্র একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রাত্যহিক জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চিঠিপত্র। যোগাযোগের সবচে সহজ মাধ্যম হলো চিঠি। চিঠি শুধু যোগাযোগেরই সহজ মাধ্যম নয়, বরং স্বল্প সময় ব্যয়ে যোগাযোগ স্থানে চিঠির কোনো বিকল্প নেই। বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-পরিজন ও সমাজের দায়িত্বশীল পদাধিকারী মানুষের কাছে ব্যক্তিগত ও সামাজিক নানা প্রয়োজনে চিঠি লিখতে হয়। চিঠিপত্রের দ্বারা আমরা দূর-দূরান্ত থেকে একে অন্যের কুশলাদি জানতে পারি। চিঠিপত্রের ব্যবহারকে প্রাতিষ্ঠানিক সকল কাজে সর্বাধিক গুরুত্ব সহকারে দেখা হয়। এমনকি প্রাতিষ্ঠানিক আদেশ-নিষেধ চিঠি-পত্রের উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভরশীল।

চিঠির মাধ্যমে তথ্য আদান প্রদান করা অত্যন্ত প্রাচীন একটি প্রথা। যা এখনো পর্যন্ত চলমান রয়েছে। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, অয়্যারলেস, টেলেক্স, ফ্যাক্স, মোবাইল ইত্যাদির মাধ্যমে মুহূর্তের

মধ্যে প্রয়োজনীয় খবরাখবর অপরের কাছে খুব সহজেই পৌঁছানো যায়, তদুপরি সুপ্রাচীন মাধ্যম এই চিঠির গুরুত্ব এতটুকু কমেনি। এর মূলে যে কারণ তা হলো, 'চিঠি' এই কথাটি শুনলেই পাঠকের মন হঠাৎ কেমন চনমন করে ওঠে। অর্থাৎ, 'চিঠি' যেভাবে বিনিময় করে তা আর অন্য কোনো কিছু দিয়ে সম্ভব নয় বলে চিঠির গুরুত্ব সর্বজনীন। লেখক চিঠিতে নিজেকে উজাড় করে উপস্থাপন করে আর পাঠক তা অনুভব করে।

হৃদয়ের এমন কিছু কথা থাকে, যা শুধু চিঠিতে লিখেই জানানো সম্ভব। আবার এমন কিছু কথা থাকে যা পাঠক সরাসরি শুনতে যতটা না স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে তার থেকে সে কথাগুলো যদি চিঠির মাধ্যমে জানে তাহলে অনেক বেশি আনন্দ অনুভব করে। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক, আমরা অনেক সময়ই প্রিয়জনের সঙ্গে ভাব বিনিময় করতে গিয়ে এমন দু'একটি কথা বলি, যার অর্থ শ্রোতাকে বা প্রিয়জনকে বের করে নিতে হয়; যেমন- 'আমি যে তোমাকে কী রকম ভালোবাসি তা ঠিক বোঝাতে পারছি না। আমার এমন কোনো ভাষা নেই যা দিয়ে তা বোঝানো যায়।'

এখানে বক্তা তার ভাষার অভাবে যা বোঝাতে পারল না, শ্রোতার কিন্তু সে ভাষাটি বুঝতে কোনো অসুবিধা হলো না। এই উভয়ের না বলা অংশটুকু যে কী, তা ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। কেননা, তা কখনো কথা দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না, শুধু হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে হয়। চিঠির ব্যাপারটাও ঠিক তেমন। চিঠি পাওয়ার মাঝে এবং চিঠি পড়ার মধ্যে হৃদয়ে যে রস, যে ভাব, আনন্দ, অনুভূতি জাগে তা যে কী, তা বলা যায় না, ব্যাখ্যা করা যায় না, তা শুধু অনুভব করা যায়।

তবে এই পত্র লেখার মাধ্যমে আমরা যে দূর-দূরান্তে বিভিন্ন সংবাদ ও খবরাখবর প্রেরণ করে স্বীয় কুশলাদি অন্যকে অবহিত করে থাকি, তা অনেকটা নির্ভর করে লেখার পদ্ধতির উপর। যদি চিঠির ভাষ্য অন্যের বোধগম্য না হয়, তাহলে চিঠি লেখার উদ্দেশ্যই বৃথা হয়ে যাবে।

আরবিতে চিঠিপত্র লেখার নিয়ম

আরবিতে চিঠিপত্রে প্রধানত অংশ থাকে:

- عنوان المرسل، وتاريخ الرسالة، الافتتاح، الغرض من الرسالة، ختام الرسالة، اسم المرسل.

তথা প্রেরকের ঠিকানা ও পত্রের তারিখ। আরবিতে পত্রের বাম দিকের উপরের অংশে ঠিকানা ও তারিখ লেখা হয়।

- الخطاب তথা সম্বোধন।

প্রাপকের উপযোগী শব্দাবলী ব্যবহার করে সম্বোধন করবে। যেমন–

- পিতার জন্য লিখবে–

حضرة والدي المحترم/ والدي الشفيق/ سيدي الوالد/ والدي الكريم/ والدي العطوف

- মায়ের জন্য লিখবে–

والدتي الحنون/ والدتي الحبيبة/ والدتي المحترمة/ والدتي الغالية

- ভাইয়ের জন্য লিখবে-

حضرة الأخ الفاضل/ أخي الكريم/ أخي المحترم/ أخي الحبيب/ أخي الوفي

- বন্ধুর জন্য লিখবে-

صديقي العزيز/ صديقي الوفي/ صديقي الكريم/ صديقي الحميم/ صديقي المخلص/ عزيزي.../ حبيبي...

- (আত্মীয়দের মধ্যে) ছোটদের ক্ষেত্রে লিখবে–

عزيزي.../ ولدي الحبيب/ ولدي العزيز/ أخي العزيز/ أبتي الغالي

• শিক্ষকের জন্য লিখবে-

فضيلة الأستاذ الجليل/ حضرة المربي الكبير/ حضرة الأستاذ فاضل/ سيدي الأستاذ المبجّل/ سيدي الأستاذ المكرم/ سعادة الأستاذ/ فضيلة الشيخ

• উলামায়ে কেরামের জন্য লিখবে- فضيلة الشيخ

• বিদগ্ধ আলেমগণের জন্য سماحة শব্দ ব্যবহার করবে। যেমন: سماحة المفتي العامّ

سعادة السفير/ سعادة الأمين/ سعادة السكريتير/ سعادة المدير/ سعادة المدير العامّ

• রাষ্ট্রদূত, সচিব/সেক্রেটারি, পরিচালক, মহাপরিচালক প্রমুখের জন্য سعادة শব্দ ব্যবহার করবে। যেমন: سعادة السفير/ سعادة الأمين/ سعادة السكريتير/ سعادة المدير/ سعادة المدير العام

মহাসচিব/ জেনারেল সেক্রেটারী, মন্ত্রী প্রমুখের জন্য معالي শব্দটি ব্যবহার করবে। যেমন: فخامة

• প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির জন্য فخامة শব্দ লিখবে। যেমন: فخامة رئيس الوزراء/ فخامة رئيس الجمهورية

স্মর্তব্য, فخامة، معالي، سعادة، سماحة، فضيلة প্রতিটি শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হলো- মাননীয়, মহামান্য।

• الإفتتاح তথা ভূমিকা।

খিতাব বা সম্বোধনের পর মুখাতাব বা সম্বোধিত ব্যক্তির অবস্থা উপযোগী সংক্ষিপ্ত ভাষায় একটি ভূমিকা থাকবে। তাতে তার প্রতি অভিবাদন জানানো হবে।

যেমন- বড়োদের ক্ষেত্রে লিখবে- تحية واحتراما/ سلاما وإجلالا

বন্ধু-বান্ধব ও সমবয়স্কদের ক্ষেত্রে লিখবে- تحيات وأشواقا/ تحية مزاجها الحبّ

- الغرض من الرسالة তথা পত্রের উদ্দেশ্য।

এ অংশের জন্যই মূলত চিঠি লেখা হয়। অতএব এর প্রতিটিই পূর্ণ চিন্তা ও মনোযোগ নিবিষ্ট রাখতে হবে। উদ্দেশ্যের বিভিন্ন দিকে গভীরভাবে চিন্তা করে প্রতিটি কথা খুলে খুলে বলতে হবে।

- ختام الرسالة তথা পত্রের উপসংহার।

প্রাপকের জন্য কল্যাণ কামনা করে এবং পত্রের উদ্দেশ্যের উপযোগী কথা বলে পত্র শেষ করতে হবে।

- পত্রের শেষে নীচে নাম লিখতে হবে।

চিঠি লেখার ক্ষেত্রে লক্ষণীয় কিছু বিষয়

চিঠি লেখার ক্ষেত্রে কিছু সাধারণ নিয়ম মেনে চলতে হবে। যেমন-

- চিঠির মাধ্যমে মানুষের রুচি ও ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটে। চিঠির প্রকাশভঙ্গি আকর্ষণীয় হতে হবে। এর জন্যে সহজ-সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় চিঠি লিখতে হবে। অস্পষ্ট এবং কাটাকাটি যেন না হয়, সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে।

- ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা চাই। নির্ভুল বানান, যথাযথ শব্দ এবং বাগাড়ম্বরহীন বাক্য ব্যবহারের ওপর চিঠির মান নির্ভর করে। ভুল বানান, এলোমেলো বাক্য, অনেক সময় বিভ্রান্তি তৈরি করে। তা পত্রলেখক সম্পর্কে বিরূপ ধারণা জন্ম দিতে পারে।

- চিঠি নিজের হওয়া চাই। অর্থাৎ নিজস্ব অভিজ্ঞতা, অনুভূতি, অভিরুচি, ব্যক্তিত্বের সুস্পষ্ট ছাপ থাকতে হবে।

চিঠিপত্রের প্রকারভেদ

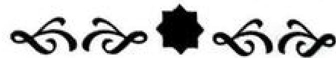
পত্রের অনেক প্রকার রয়েছে। সেগুলোর মধ্যে একটি প্রকার হলো الطلب তথা আবেদনপত্র। তো 'আবেদনপত্র' পত্রেরই একটি বিশেষ প্রকার। পত্র সম্পর্কে এতক্ষণ যে আলোচনাগুলো করা হয়েছে আবেদনপত্রের ক্ষেত্রেও সেগুলো সমানভাবে প্রযোজ্য। চিঠিপত্রের আরো কয়েকটি প্রকার নিচে উল্লেখ করা হলো–

- **الرسائل الذاتية তথা ব্যক্তিগত চিঠিপত্র:** পিতার কাছে পুত্রের পুত্র, পুত্রের কাছে পিতার পত্র, ছোট ভাইয়ের কাছে বড়ো ভাইয়ের পত্র, বন্ধুর কাছে পত্র, ছোট ভাই-বোনদের আদেশ বা উপদেশমূলক পত্র, পরীক্ষায় ভালো ফলাফলের জন্য কিংবা পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য অভিনন্দন জানিয়ে পত্র ইত্যাদি।

- **الرسائل الإدارية তথা দাপ্তরিক চিঠিপত্র:** কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বা অন্য কোনো অফিসিয়াল কাজে যে চিঠিপত্র লেখা হয়ে থাকে।

- **الرسائل التجارية তথা বাণিজ্যিক বা ব্যবসায়িক চিঠিপত্র:** বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি ব্যাংক, বীমা ও অন্যান্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়িক লেনদেনের জন্য এ ধরনের চিঠির আদান-প্রদান হয়ে থাকে।

- **الرسائل الذاتية الخاصة তথা একান্ত ব্যক্তিগত চিঠিপত্র:** এধরনের চিঠি সাধারণত একান্ত প্রিয়জনের কাছে লেখা হয়ে থাকে। তাতে একান্ত ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ, হাসি-আনন্দের কথা তুলে ধরা হয়।



ব্যক্তিগত পত্র সম্পর্কে কিছু কথা

ব্যক্তিগত পত্র মূলত ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে থাকে। নিতান্ত ব্যক্তিগত প্রয়োজনে কিংবা ব্যক্তিগত ভাব-ভাবনা প্রকাশের তাগিদে বাবা-মা, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু বান্ধব, আপনজনের কাছে লিখিত চিঠিকে ব্যক্তিগত চিঠি বলে। সাধারণত ব্যক্তিগত প্রয়োজনে, ব্যক্তিমনের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ-বেদনা এবং ব্যক্তিজীবনের নানাধরনের সমস্যা ইত্যাদি ব্যক্তিগত পত্রের মূল উপজীব্য। যেমন- পিতার কাছে পুত্রের পত্র, পুত্রের কাছে পিতার পত্র, ছোট ভাইয়ের কাছে বড়ো ভাইয়ের পত্র, বন্ধুর কাছে পত্র, ছোট ভাই বোনদের আদেশ বা উপদেশমূলক পত্র, পরীক্ষায় ভালো ফলাফলের জন্য কিংবা পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য অভিনন্দন জানিয়ে পত্র ইত্যাদি ব্যক্তিগত পত্রের অন্তর্ভুক্ত।

ব্যক্তিগত চিঠিপত্রের বৈশিষ্ট্য

ব্যক্তির সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, ব্যক্তিগত চিন্তা-ভাবনা বা অভাব-অভিযোগ ব্যক্তিগত পত্রে স্থান পায়। কাজেই ব্যক্তিগত পত্রে যেমন ব্যক্তিগত আলাপনের সুযোগ আছে, অন্য পত্রে তা নেই। আবার, ব্যক্তিগত পত্রের কোনোটিতে থাকে কেবল তথ্য-বিনিময়, কোনোটিতে থাকে ভাব-বিনিময় বা চিন্তা-বিনিময়। পত্রগুলো সে অনুযায়ী সংক্ষিপ্ত বা দীর্ঘ তথ্যমূলক বা ভাবমূলক হবে। কাজেই, ব্যক্তিগত চিঠির দৈর্ঘ্য ও বৈশিষ্ট্য হবে তার বর্ণিতব্য অনুগামী।

ব্যক্তিগত চিঠিপত্রের ভাষা বিন্যাস কেমন হবে?

ব্যক্তিগত পত্র বাবা, মা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের কাছে লিখিত হয়। এই সব পত্রে মনের কথাগুলোকে সুন্দর করে গুছিয়ে সুবিন্যস্তভাবে লিখিত হয়। মনের কথাগুলোকে এ রকম সুন্দর করে গুছিয়ে সুবিন্যস্তভাবে লিখতে পারলে যিনি পাবেন এবং পাঠ করবেন, আপনার মনের কথাগুলো তার মনেও একটি প্রভাব বিস্তার করবে এবং তিনি মনে মনে মুগ্ধ হবেন। এরূপ ক্ষেত্রে, যাকে চিঠি লিখছেন, মনে মনে তাকে আপনার সামনে কল্পনা করে কল্পনায় তার সঙ্গে বাক্যালাপ শুরু করলে, চিঠির বক্তব্যটি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠবে। তাকে যে কথাগুলো বলতে চান, তা ভেবে নিন। তারপর কাগজ-কলম নিয়ে সেই কথাগুলোকে মনোযোগ সহকারে লিপিবদ্ধ করুন। তার ফলে ব্যক্তিগত স্পর্শে পত্রখানি মনোজ্ঞ, হৃদয়গ্রাহী ও আন্তরিকতাপূর্ণ হয়ে ওঠবে।

লিখিত পত্র অনেক সময় সাহিত্যের মর্যাদা পেয়ে থাকে। পৃথিবীতে বড়ো বড়ো লেখক, সাহিত্যিক, রাজনীতিবিদ এবং মহাপুরুষেরা কত সুন্দর মূল্যবান চিঠি লিখে গিয়েছেন। চিঠি সুন্দর এবং সুচিন্তিত হলে যার জন্যে চিঠি লেখা হয়েছে সে স্বযত্নে তা সংরক্ষণ করে রাখবে। ইংরেজিতে জর্জ বার্নাড শ-ও পত্রগুলো বরং বাংলা রবীন্দ্রনাথের পত্রগুলো সাহিত্যের মূল্যবান সম্পদরূপে স্বযত্নে রক্ষিত আছে।[১]

আরবিতে দরখাস্ত লেখার নিয়ম

আরবিতে দরখাস্ত লেখার অধ্যায়ে আমরা পাঁচটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব:

- تعريف الطلب তথা দরখাস্তের সংজ্ঞা।
- أنواع الطلب তথা দরখাস্তের প্রকার।
- أجزاء الطلب তথা দরখাস্তের অংশ।
- ألقاب الطلب তথা দরখাস্তের সম্বোধন।
- تعابير الطلب তথা দরখাস্তের প্রচলিত গদ।

تعريف الطلب তথা দরখাস্তের সংজ্ঞা

هو عرض حاجة كتابة والسؤال لتحقيقها

লিখিত আকারে কোনো প্রয়োজন উত্থাপন করা এবং তা বাস্তবায়নের অনুরোধ করা।

أنواع الطلب তথা দরখাস্তের প্রকার

দরখাস্তের বিভিন্ন প্রকার রয়েছে। এখানে তিনটি প্রকার উল্লেখ করা হলো:

- طلب الإجازة তথা ছুটির আবেদন।
- طلب المساعدة তথা সাহায্যের আবেদন।

---

(১) ভাষা শিক্ষা: ড. হায়াৎ মামুদ

- طلب التعيين والترقية তথা নিয়োগ ও পদন্নোতির আবেদন।

أجزاء الطلب তথা দরখাস্তের অংশ

দরখাস্ত লিখতে কয়েকটি অংশের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে যেন তা কিছুতেই না ছুটে যায়:

- لقب অর্থাৎ সম্মানসূচক শব্দ ব্যবহার করে সম্বোধন করা তার কোনো পদবী উল্লেখসহ। এটি পৃষ্ঠার উপরে ডান পাশে লিখবে।
- الموضوع অর্থাৎ আলোচ্য বিষয়। এটি পৃষ্ঠার উপরে ডান দিকে লিখবে।
- التحية অভিবাদন। এটি আলোচ্য বিষয়ের নিচে একটু ফাঁকা রেখে শুরু করবে। কিংবা পৃষ্ঠার মাঝামাঝিতেও লেখা যেতে পারে।
- الختام বা উপসংহার। এটি সর্বশেষ অনুচ্ছেদ। এতে এক লাইনের ভেতরে পুনরায় কৃতজ্ঞতা জানানো।
- التوقيع والتاريخ তথা নিজের নাম ও তারিখ। এটি পৃষ্ঠার বাম দিকে লিখতে হবে।

ألقاب المرسل إليه

ألقاب المرسل إليه অর্থাৎ যার নিকট দরখাস্ত লিখবে তাকে কী বলে সম্বোধন করা হবে। এটি ব্যক্তি ভেদে একেক রকম শব্দ ব্যবহার করতে হয়। যেমন:

- ✓ রাজা বাদশাহদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়- صاحب الجلالة
- ✓ রাষ্ট্রের কর্ণধারদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়- صاحب الفخامة
- ✓ মন্ত্রী বা বড়ো কোনো সংস্থার প্রধান দায়িত্বশীলদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়- صاحب المعالي

- ✓ নেতাবর্গের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়- صاحب السمو
- ✓ প্রধানমন্ত্রীর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়- دولة
- ✓ বড়ো আলেমের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়- سماحة
- ✓ কোনো প্রতিষ্ঠানের পরিচালকদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়- سعادة/سيادة
- ✓ যেকোনো আলেমের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়- فضيلة

تعابير الطلب

تعابير الطلب তথা দরখাস্তের প্রচলিত গদ। এগুলো দরখাস্তের শুরু ও শেষের দিকে লিখতে হয়। নিচে কিছু تعابير উল্লেখ করা হলো-

শুরুতে ব্যবহৃত হয়-

- أتقدم إلى سعادتكم بتحياتي الطيبة وتقديراتي المخلصة وأفيدكم بأنني...
- أقدم إلى مقام سعادتكم أطيب التحيات المقرونة بالاحترام والتبجيل اللائقين بشأنكم وأتشرف بأن أقدم هذا الطلب إلى مقام سعادتكم العالي وأفيدكم فيه ...
- أهدي إلى مقام سموكم/معاليكم العالي أطيب التحيات المقرونة بأمسى آيات التقدير والاحترام اللائق بشأنكم...
- أهدي إلى مقام سعادتكم الكريم أطيب التحيات المقرونة ببالغ الاحترام والتقدير...
- مع بالغ الحزن والأسى أفيد سعادتكم بأن ...

- أقدم إلى سعادتكم تحياتي البالغة وتقديراتي اللائقة....
- أقدم إلى مقام سعادتكم أسمى آيات التهنئة والترحيب...
- مع بالغ الاحترام والتقدير أودّ أن أسترعي انتباهكم الكريم...

শেষের দিকে ব্যবহৃত হয়:

- وعليه أرجو من سعادتكم التكرم بالموافقة على الإتاحة لي ...
- فأرجو التكرم بالنظر في طلبي هذا، وتشريفي بإصدار موافقتكم الكريمة على الإتاحة لي ...
- نظرا إلى هذه الحقيقة أطلب من سعادتكم التكرم بتخصيص...
- وعليه فإنني أرجو من الله أولا ثم من كرم وإنسانية سعادتكم...
- نظرا إلى ما ذكر أعلاه يرجى من سعادتكم التكرم بتقديم...
- نظرا إلى الحقائق المبنية أعلاه أرجو من معاليكم التكرم بتزويد...
- في مثل هذا الوضع المأسوي أتوجه إلى الله أولا ثم إلى مقام سعادتكم الكريم أملا في أن أحظى باللفتة الإنسانية الكريمة من الصدر الرحب بصورة حل واقعي...

আরবিতে كلمة الترحيب তথা মানপত্র কীভাবে লিখব

কোনো বিখ্যাত ও সম্মানিত ব্যক্তির কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে আগমন উপলক্ষ্যে তার সম্মানে তাকে শুভেচ্ছা জানানোর জন্য যে

বাণী লেখা হয় তাকে كلمة الترحيب বলে। আর এর মাধ্যমেই সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ছাত্র ও শিক্ষকবৃন্দ তাকে অভ্যর্থনা জানায়।[১]

শাইখ শহীদুল্লাহ ফজলুল বারী রহ. الإنشاء الوظيفي গ্রন্থে লিখেছেন–

كلمة الترحيب هي عبارة عن خطاب ترحيبي يلقى بمناسبة قدوم أي ضيف أو مسؤول كبير مكتوبا أو شفهيا بأسلوب أدبي وعاطفي يحرك الوجدان ويهز المشاعر.

মানপত্র হচ্ছে অভিনন্দনসূচক ভাষণ যা কোনো সম্মানিত অতিথি অথবা কোনো বড়ো কর্মকর্তার উদ্দেশ্যে এমন সাহিত্য ও আবেগধর্মী ভঙ্গিমায় উপস্থাপন করা হয়, যা হৃদয়কে উদ্বেলিত করে এবং অনুভূতিকে নাড়া দেয়।[২]

আরবিতে كلمة الترحيب তথা মানপত্র লেখার ক্ষেত্রে কিছু লক্ষণীয়

- প্রথম স্তরে আগন্তুক মেহমানের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও দায়িত্বের উল্লেখসহ তার কিছু প্রশংসা তুলে ধরবে।
- দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে আগত মেহমানের অভ্যর্থনা সম্বন্ধনীয় নির্দিষ্ট কতক বাক্যে তার আগমনে আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে।
- তৃতীয় অনুচ্ছেদে তার শিক্ষা বিস্তার ও সমাজ সংস্কারমূলক ভালো ভালো কর্মের উল্লেখ করবে। তারপর দেশ জাতি ও শিক্ষা সম্প্রসারণে স্বীয় প্রতিষ্ঠানের অবস্থান, অবদান ও ভূমিকা তুলে ধরবে এবং বর্তমানে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিরাজমান সমস্যার কথা তার সামনে পেশ করবে এবং আর্থিক সাহায্যের প্রয়োজন থাকলে আবেদন জানাবে।
- আবেদনের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের বুদ্ধিমত্তার আশ্রয় নিবে না, বরং এ কথাগুলো নম্রভাবে বিনয়ের ভাষাতে পেশ করবে, যাতে তার উপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়।

---

(১) আরবি ভাষায় দক্ষতা ও শিক্ষাদান পদ্ধতি, প্রফেসর ড. মোহাম্মদ ইউছুফ, পৃষ্ঠা: ১৮২
(২) আল ইনশাউল ওয়াজিফি, শাইখ শহীদুল্লাহ ফজলুল বারি রহ., পৃষ্ঠা: ১৫১

- শেষ অনুচ্ছেদে তার প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করতে সক্ষম হয়নি–এই বলে তার কাছে ওজরখাহি করবে। তাকে সম্মান প্রদর্শনে যে সমস্ত ভুলক্রটি পরিলক্ষিত হয়েছে বা সম্মানের ঘাটতি হয়েছে তার জন্য তার কাছে ক্ষমা চাইবে।
- বাণীগুলো এতো সংক্ষিপ্ত হবে না যে, অর্থ বুঝতে সমস্যা হয়। আবার এত দীর্ঘও হবে না যে, ভুলক্রটি পরিলক্ষিত হয়; বরং সংক্ষেপ ও দীর্ঘের মাঝামাঝি পরিসরে লিখবে।
- শেষ পৃষ্ঠার বাম দিকে শুভেচ্ছা প্রদানকারীদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিখবে।
- আর পৃষ্ঠার ডান পাশে তারিখ উল্লেখ করবে।[১]

আরবিতে التقرير বা প্রতিবেদন কীভাবে লিখব

التقرير মূলত এক প্রকার লেখা যা নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তি, বিষয়বস্তু কিংবা অবস্থা সম্পর্কে বাস্তবসম্মত কতগুলো তথ্যকে অন্তর্ভুক্ত করে থাকে, যা কোনো উদ্দেশ্য সাধনের জন্য গঠন করা হয়ে থাকে।

আল ইনশাউল ওয়াজিফি কিতাবে التقرير এর সংজ্ঞা এভাবে লেখা হয়েছে–

التقرير هو بيان خطي عن موضوع خاص أو قضية هامة طارئة

"কোনো বিশেষ বা কোনো গুরুত্বপূর্ণ জরুরি ঘটনা সম্পর্কিত লিখিত বিবরণকে প্রতিবেদন বলা হয়।"

التقرير في الاصطلاح الدولي هي وثيقة تثبت واقعة معينة وتشرح عواملها وتفصيلاتها وتقدم الحلول المقترحة لها

"আন্তর্জাতিক পরিভাষায় প্রতিবেদন এমন একটি দলিল বা ডকুমেন্টকে বলা হয় যা নির্দিষ্ট কোনো ঘটনাকে প্রমাণ করে এবং তার কারণ ও বিবরণ ব্যাখ্যা করে এবং এর প্রস্তাবিত সমাধান পেশ করে।"[১]

---

(১) আরবি ভাষায় দক্ষতা ও শিক্ষাদান পদ্ধতি, প্রফেসর ড. মোহাম্মদ ইউছুফ, পৃষ্ঠা: ১৮২-১৮৩

التقرير বা প্রতিবেদনের প্রকারভেদ

- নির্দিষ্ট বিষয়ের প্রতিবেদন। যেমন তাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অন্যান্য বিষয় হতে পারে।
- নির্দিষ্ট কোনো অবস্থার প্রতিবেদন। যেমন রোগ সংক্রান্ত বা আইন বিষয়ক কোনো প্রতিবেদন ইত্যাদি।
- নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে প্রতিবেদন। যেমন, চাকরিজীবি, বৈজ্ঞানিক, নেতা, ধর্মপ্রচারক সম্পর্কে।
- কোনো বিষয়ের সন্দেহ দূর করতে প্রতিবেদন, কোনো ঘটনাকে তাকিদ করতে প্রতিবেদন, কোনো কাজের সমাপন সম্বন্ধে প্রতিবেদন, নির্দিষ্ট কোনো দুর্ঘটনা বর্ণনা করতে প্রতিবেদন দেওয়া।

এছাড়াও التقرير এর আরো কিছু প্রকার রয়েছে। যেমন:

- التقرير العام বা সাধারণ প্রতিবেদন।
- التقرير عن التحقيقات বা তদন্ত রিপোর্ট।
- التقرير الإداري বা প্রশাসনিক রিপোর্ট।
- التقرير التحليلي বা বিশ্লেষণধর্মী রিপোর্ট।
- التقرير المالي বা আর্থিক প্রতিবেদন।
- التقرير الفني বা কারিগরি প্রতিবেদন।
- التقرير عن الأداء বা কর্মদক্ষতাগত প্রতিবেদন।
- التقرير الصحفي বা সংবাদ প্রতিবেদন।[২]

---

(১) আল ইনশাউল ওয়াজিফি: ১৬৯

(২) আরবি ভাষায় দক্ষতা ও শিক্ষাদান পদ্ধতি, প্রফেসর ড. মোহাম্মদ ইউছুফ, পৃষ্ঠা: ১৭৫; আল ইনশাউল ওয়াজিফি: ১৬৯-১৭০

التقرير বা প্রতিবেদন লেখার পদ্ধতি

التقرير বা প্রতিবেদন লেখার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে-

- মূল বিষয়বস্তুর মৌলিক ধারণাকে নির্দিষ্ট করে নিবে। যে উদ্দেশ্যে সে প্রতিবেদনটি লেখার ইচ্ছা করছে তা ঠিক করে নিবে।
- তথ্যাবলিকে একত্র করে এবং তথ্যগুলো বিশুদ্ধ হওয়ার বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে। আর বিশুদ্ধ হওয়া নিশ্চিত হতে হলে তথ্যসূত্রের প্রতি প্রত্যাবর্তন করতে হবে।
- তথ্যগুলো একত্র করার পর সুন্দর করে সাজাবে ও বিষয়ভিত্তিক রচনা করবে।
- প্রয়োজন মাফিক তথ্যগুলো একত্র করবে এবং নির্দিষ্ট আঙ্গিকে প্রশ্ন ও উত্তরের আলোকে তা গঠন করবে।
- প্রতিবেদন লেখার পূর্বে ভূমিকা লিখবে। ভূমিকার মধ্যে প্রতিবেদনের মৌলিক বিষয়গুলো তুলে ধরবে। যেমন মাদরাসা বিষয়ে প্রতিবেদন তৈরি করতে প্রতিবেদনের ভূমিকাতে নিম্নে উল্লিখিত বিষয়গুলো উল্লেখ করবে:
  - মাদরাসার প্রধান কার্যালয় ও মাদরাসার নীতিমালা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবে।
  - মাদরাসার বিভাগসমূহ ও প্রত্যেক বিভাগের পাঠদানের পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করবে।
  - নির্দিষ্ট কোর্সসমূহ এবং প্রত্যেক কোর্সের জন্য উপযুক্ত সময়ের পরিমাণ বর্ণনা করবে।
  - পাঠ পদ্ধতি এবং তাতে ব্যবহৃত মাধ্যমসমূহ ও কার্যালয়ের বর্ণনা দিবে।
  - ছাত্রদের মান নির্ধারণ করবে।
  - পাঠ কার্যক্রম ও তার অবস্থার বর্ণনা দিবে।

- ফলাফলের বর্ণনা ও বিভিন্ন বিষয়ে পাসের হারের বর্ণনা দিবে।[১]

আরবিতে ব্যক্তিগত ডায়েরি লেখার নিয়ম

মানুষের জীবনে হাসি-কান্না, ব্যথা-বেদনার কত ঘটনা থাকে। তা কাউকে না কাউকে বলে থাকে। আবার অনেক সময় তা ডায়েরিতে লিপিবদ্ধ করে রাখে, যাতে তা সংরক্ষিত থাকে ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় হিসেবে কাজ করে।

ব্যক্তিগত ডায়েরি লেখার ক্ষেত্রে যেসব বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে:

- তারিখ ও সময় উল্লেখ করে জীবনের ঘটনা ও বিষয়াবলি লিখবে।
- একেবারে সংক্ষিপ্ত করবে না এবং অনর্থক বিষয়ও উপস্থাপন করবে না।
- বিচক্ষণতার সাথে বরাত ও সূত্র উল্লেখ করবে।
- গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো লিখবে। তবে বারবার উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। অস্বাভাবিক বিষয় পরিহার করবে।[২]

সফল লেখক হওয়ার অনুশীলনের রুটিন

সফল লেখক হওয়ার অনুশীলনের জন্য আদীব হুজুর মাওলানা আবু তাহের মিসবাহ হাফি. কয়েকটি পরামর্শ দিয়ে থাকেন। তা নিম্নরূপ: ক. নিয়মিত রোজনামচা লেখা।

খ. ছোট ও হালকা বিষয়ের উপর মাসে অন্তত তিন চারটে ছোট ছোট লেখার অনুশীলন করা।

গ. মাসে অন্তত একটি ভ্রমণকাহিনি লেখা।

ঘ. মাসে অন্তত একবার কোনো বিষয়ের উপর একটি দু'টি লেখা সামনে রেখে নিজের পক্ষ থেকে ঐ বিষয়ে একটি লেখা তৈরীর অনুশীলন করা।

ঙ. প্রতিদিন নিয়মিত কিছু সময় মানসম্মত সাহিত্য অধ্যয়ন করা।

---

(১) আরবি ভাষায় দক্ষতা ও শিক্ষাদান পদ্ধতি, প্রফেসর ড. মোহাম্মদ ইউছুফ, পৃষ্ঠা: ১৭৫-১৭৬

(২) আরবি ভাষায় দক্ষতা ও শিক্ষাদান পদ্ধতি, প্রফেসর ড. মোহাম্মদ ইউছুফ, পৃষ্ঠা: ১৮২

চ. এবং জ্ঞান ও তথ্য আহরণের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন বিষয়ের উপর নিয়মিত সাধারণ অধ্যয়ন চালিয়ে যাওয়া।

তাহলে একজন সফল লেখক তৈরী হওয়ার পথে ইনশাআল্লাহ আর কোনো বাধা থাকবে না।"

লেখালেখির জন্য কিছু করণীয়

- প্রতিদিন কিছু না কিছু লেখা। এক লাইন হলেও লেখা। আরবি সাহিত্যের গল্পের বই সেটা যারই হোক। সময় পেলেই বসে পড়া। লেখালেখিতে ভালো করতে হলে প্রচুর পড়তে হবে। এর কোনো বিকল্প নেই। বলতে পারেন, যা পড়েন তা ভুলে যান। আসলে ভুলে যান না। অবেচেতন মন শব্দগুলো মাথায় রাখে। যখন লিখবেন তখন যুতসই শব্দ চলে আসবে।

- কোথাও লেখা ছাপা হোক বা না হোক লিখে যেতে হবে। কেউ কেউ সমালোচনা করবে। গঠনমূলক সমালোচনা উপকারী। সমালোচনা শুনে থেমে গেলে চলবে না।

- ছোট বাক্য ও সহজ শব্দে লিখুন। নিজের লেখা বারবার পড়ুন। কেটে ছেঁটে ঠিক করুন।

- লেখার শুরুটা যেন আকর্ষণীয় হয়। লেখার মাঝে বাহুল্য পরিহার করতে হবে। যতটুকু না বললেই নয় ততটুকু বলতে হবে।

- নিজের লেখা আশপাশের মানুষদের পড়তে দিন। তাদের মতামত শুনুন।

- মনে করুন আপনাকে এক বস্তা বালু আর সিমেন্ট দেয়া হলো। এখন আপনাকে জানতে হবে যে, এগুলো কোনটা কী পরিমাণে মেশালে গাঁথুনি মজবুত হবে। লেখার বিষয়টিও ঠিক তেমন। কোথায় আবেগ থাকবে। কোন শব্দ কোথায় যুতসই এটা বুঝতে হবে।

- সবসময় পকেটে কাগজ কলম রাখুন। যখনই মাথায় কোনো সুন্দর চিন্তা আসবে লিখে ফেলুন। এমনও হয় বাথরুমে বসে একটা লাইন মাথায় এলো। বাথরুম থেকে বের হয়ে সাথে সাথে আপনি লিখে রাখলেন। পরে এক লাইনের লেখা ১০০ লাইন হয়ে গেল। কলম চলতেই থাকল।

- মনের ওপর জোর খাটাবেন না। যে বিষয় লিখে আনন্দ পান সেটা নিয়েই লিখুন।

- লেখালেখি কঠিন সাধনা এবং লেগে থাকার বিষয়। একসময় আপনার একটি লেখাও ছাপা হবে না। আবার এমন একসময় আসবে সম্পাদকরা ও প্রকাশকরা ফোন করে আপনার কাছ থেকে লেখা চেয়ে নিবে। এটাই বাস্তবতা।

- নিজের ওপর বিশ্বাস রাখুন। একদিন না একদিন আপনি পারবেনই ইনশাআল্লাহ।

صلات الأفعال বা অনুসর্গ

আরবি ভাষায় লিখিত কিতাবাদি মুতালাআ করার সময় আমরা প্রায় ফেয়েলের পর সিলাহর ব্যবহার দেখতে পাই। গভীর দৃষ্টি দিয়ে মুতালাআ করলে এই সিলাহ ব্যবহার করার দ্বারা নসটি কতটা দারুণ হয়েছে তা অনুমান করা যায়। সিলাহ ব্যবহার কেবল আরবি ভাষাতেই নয়; বরং সকল ভাষাতেই এর ব্যবহার রয়েছে। এই সিলাহ বা অনুসর্গ ব্যবহারের সঠিক নিয়ম জানা না থাকলে বাক্যগঠন কিংবা নস বুঝার ক্ষেত্রে বেশ বিপাকে পড়তে হয়। কারণ, আরবি বাক্যের মাঝে সিলাহর যথার্থ ব্যবহার ও প্রয়োগ না হলে অর্থের মাঝে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। কখনও আবার ভুল অর্থ প্রদান করে। তাই সিলার সঠিক প্রয়োগ যথাযথভাবে আয়ত্ব করা ব্যতীত এর বিকল্প কোন পদ্ধতি নেই।

একটি উদাহরণ লক্ষ্য করুন:

ذهبت بالمدرسة إلى السيارة (ভুল)

ذهبت إلى المدرسة بالسيارة (সঠিক)

ذهبت إلى المدرسة بالسيارة এই বাক্যের بالسيارة এর ب কে استعانة এর অর্থে ব্যবহার করা যায়, আবার সিলাহ হিসেবেও ব্যবহার করা যায়। প্রথম সুরতে অর্থ হবে, "আমি গাড়ির সাহায্যে তথা গাড়ি দিয়ে গেলাম"। আর দ্বিতীয় সুরতে

অর্থ হবে, "গাড়িটিকে নিয়ে গেলাম"। পক্ষান্তরে উক্ত বাক্যে إلى সর্বাবস্থায় সিলাহ হিসেবেই থাকবে। যদিও তারকীবে حرف الجر হিসেবে ধরা হবে।

صلات الأفعال এটি একটি শ্রুত বিষয়। তাই এর কোনো বিশেষ নিয়ম-কানুন নেই; বরং আরবি ভাষাভাষীদের ব্যবহার ও المعاجم العربية যেমন معجم الأفعال المتعدية بحرف (المؤلف: موسى بن محمد الملياني الأحمدي نووات)، المورد، المعجم الوسيط، المنجد في اللغة العربية المعاصرة، لسان العرب ইত্যাদী আরবি অভিধান থেকেই শিখতে হবে।

صلة এর পরিচয়

- فعل কিংবা شبه الفعل কিংবা فعل এর অর্থ তার পরবর্তী শব্দের সাথে যুক্ত করার জন্য যে حرف الجر ব্যবহার করা হয় তাকে صلة الأفعال বলে।
- صلة বলা হয় এমন حرف কে, যে حرف দ্বারা ফেয়েলকে মুতায়াদ্দি করা হয়। যেমন: ذهب خالد إلى المدرسة براشد
- صلة বলা হয় حرف الجر এর নির্দিষ্ট কিছু حرف কে যেগুলো দ্বারা ফেয়েলকে মাফউল এর দিকে মুতায়াদ্দি করা হয়।

আরবি ভাষায় যে সিলাহগুলো ব্যবহার হয়

ب، عن، ل، على، من إلى، في

صلة الأفعال এর গুরুত্ব

- সিলাহ দ্বারা ফেয়েলকে মুতায়াদ্দি করা যায়।
- ফেয়েলের অর্থ পরিবর্তন করা সম্ভব।

- জুমলার মাঝে সিলাহ ব্যবহারের স্থান পরিবর্তন করার দ্বারা বাক্যের অর্থের পরিপূর্ণ পরিবর্তন করা সম্ভব।
- আরবি নস বুঝার ক্ষেত্রে সিলাহর সঠিক ব্যবহারে ত্রুটি হলে বড়ো ধরনের সমস্যায় পড়তে হয়।
- সিলাহর কারণে অনেক সময় শব্দের অর্থ সম্পূর্ণ বিপরীত হয়ে যায়। নিম্নে কয়েকটি মিসাল লক্ষ্য করুন-

✓ الرغبة (س) শব্দটি যখন في সিলাহর সাথে ব্যবহৃত হবে তখন তার অর্থ হবে "আগ্রহী হওয়া, আকাঙ্ক্ষা করা।" কিন্তু এ শব্দের সিলাহ যদি عن সিলাহর সাথে ব্যবহৃত হয় তখন তার অর্থ হবে "বিমুখ হওয়া, অপছন্দ করা, ফিরে আসা, বর্জন করা।" দেখুন, এখানে শব্দ একটাই। কিন্তু শুধু সিলাহর পরিবর্তনের কারণে তার অর্থ সম্পূর্ণ বিপরীত হয়ে যাচ্ছে।

✓ دعاه (دعاء ودعوة -ن-) অর্থ হলো, তাকে ডাকল, دعاه إلى الأمر أو للأمر তাকে টেনে নিলো, প্রণোদিত করল। دعا به অর্থ: তাকে ডেকে পাঠালো। دعا له অর্থ: তার জন্য দুআ করল। دعا عليه অর্থ: তাকে বদদুআ দিলো, অভিশাপ দিলো। এখানেও বিভিন্ন সিলাহর কারণে বিভিন্ন অর্থ প্রদান করছে।

✓ صلى صلاة অর্থ: নামাজ আদায় করা। صلى عليه অর্থ: কারো জন্য কল্যাণ কামনা করা। যেমন, পবিত্র কুরআনে কারিমে বর্ণিত হয়েছে- وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم তাদের জন্য মঙ্গল কামনা করুন। صلى بالناس অর্থ: নামাজ পড়ানো। صلى الله على رسوله অর্থ: আল্লাহ কর্তৃক তাঁর রাসুলকে রহমত ও বরকত দিয়ে ঢেকে ফেলা।

✓ نظر (ن) نظرا-ه، وإليه অর্থ: তার দিকে তাকিয়ে তাকে দেখা। نظر في الأمر অর্থ: চিন্তা ভাবনা করা, অনুমান করা। نظر الشيء অর্থ: বস্তুটির প্রতীক্ষা করল, বাকি বিক্রি করল। نظر بين الناس লোকদের মাঝে

ফায়সালা করল। نظر للقوم অর্থ: লোকদের জন্য বেদনাবোধ করল। نظر فلانا অমুকের প্রতি মনোযোগী হলো, তার জন্য বিলম্ব করল। نظر فلانا الدين অর্থ: অমুককে ঋণ পরিশোধের অবকাশ দিলো। انظر لي فلانا অর্থ: আমার জন্য অমুককে ডাক। نظر الدهر إلى بني فلان অর্থ: কালের দুর্বিপাক তাদেরকে বরবাদ করল। অভিধান খুললে এমন শত শত দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে।

صلات الأفعال সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা

- সিলাহর সঠিক ব্যবহার জানতে হলে আরবি নস ও গ্রহণযোগ্য আরবি অভিধানগুলোর স্বরণাপন্ন হতে হবে।
- খুব সতর্কতার সাথে ফেয়েল মুখস্ত করতে হবে সিলাহর ব্যবহারসহ।
- সিলাহ পরিবর্তনের দ্বারা ফেয়েলের অর্থের যে পরিবর্তন হয় সেদিকে সতর্ক লক্ষ্য রাখা।
- বাংলা কিংবা উর্দু তরজমা ও লেখার ক্ষেত্রে যে সিলাহগুলো ব্যবহৃত হয় তার প্রভাব যেন আরবিতে না পড়ে সেদিকেও লক্ষ্য রাখা।
- নির্দিষ্ট খাতায় সিলাহগুলো ভিন্ন ভিন্ন করে লিখে ফেয়েলগুলো অর্থসহ লিখে রাখা।

একটি صلة দ্বারা কিছু ফেয়েল মুতায়াদ্দি হওয়ার উদাহরণ:

١. لجأ إلى بمعنى لاذ إلى.

مثلا: لجأ خالد إلى الحصن، لجأ لاجئوا روهينجا إلى بنغلاديش.

٢. **أعرب عن بمعنى أبدى.**

مثلا: أعرب راشد عن أمله. أعرب شفيق عن مخافه. أعرب الشيخ الشريم لدى وصوله إلى داكا عن سروره بزيارة بنغلاديش.

٣. **تعرض لـ بمعنى واجه.**

مثلا: الطلاب الذين لا يجتهدون في الدراسة والمسؤوليات اليومية يتعرضون لشتى المشاكل في قاعة الامتحان. نيبال تتعرض دائما للزلزال.

٤. **اعتمد على بمعنى اتكأ.**

مثلا: تعتمد المدارس الإسلامية الأهلية على تبرعات الشعب المسلم لا على تبرعات الحكومة.

٥. **فرح بـ بمعنى ابتهج.**

مثلا: فرحت بزيارتك. فرحت بنجاحك في الامتحان.

٦. **تمتّع بـ بمعنى تلذذ.**

مثلا: تمتّعت بمنظر بهيج. أتمتع بالصحة والعافية.

٧. **حرّض على بمعنى حثّ على.**

مثلا: حرّض الدين الإسلامي على التعاون فيما بيننا.

٨. **اهتمّ بـ بمعنى اعتنى بـ**

مثلا: تهتمّ دار العلوم بتعليم أبنائنا وتربيتهم.

দুই বা ততোধিক صلة দ্বারা কিছু ফেয়েলের অর্থ পরিবর্তন ব্যতীত মুতায়াদ্দি হওয়ার উদাহরণ

١. دلّ على/إلى بمعنى أرشد.

مثلا: ما دلّهم على موته إلا دابة الأرض تأكل منسأته، من دلّ على خير فله مثل أجر فاعله. خير الكلام ما قلّ ودلّ.

٢. جلا عن/من بمعنى خرج من بلد إلى بلد آخر.

مثلا: جلا العدو عن البلاد. جلا الفقر القوم عن منازلهم.

٣. خلد ب/إلى بمعنى أقام وسكن.

مثلا: خلد بالمكان: أقام فيه ودام واستقرّ طويلا.

٤. خلا من/عن بمعنى تبرأ.

مثلا: خلا الرجل من الهمّ أي عاش سعيدا، خلا باله من كل همّ: اطمأن واستراح.

٥. درّب ب/على/في بمعنى عوّد.

مثلا: دربه على الكتابة: عوده على الكتابة بخط جميل. درب المدرب الفريق الرياضي في الملعب.

٦. دنى من/ ل/ إلى بمعنى قرب.

مثلا: دنتِ الشمس إلى الغروب. دنتِ السفينة من الشاطئ.

٧. رخّص في/ل بمعنى أذن له.

مثلا: رخّص الشرع لنا بالإفطار في السفر. رخّص له المدير الذهاب لزيارة أهله.

٨. أنزل إلى/على بمعنى أوحى إلى.

مثلا: أنزل الله الكلام على أنبيائه. وأنزل لكم من السماء ماء. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات.

দুই বা ততোধিক صلة দ্বারা কিছু ফেয়েলের অর্থ পরিবর্তনসহ মুতায়াদ্দি হওয়ার উদাহরণ

١. حطّ عن بمعنى أزال شيء، حطّ في بمعنى طعن، حط من بمعنى خفف.

مثلا: حسناتك تحط عنك سيئاتك.

٢. حافظ على بمعنى واظب على، حافظ عن بمعنى دافع عن.

٣. نزل ب/على بمعنى هبط، نزل عن بمعنى ترك، نزل في بمعنى دخل، نزل ب/على بمعنى أقام.

٤. تاب إلى بمعنى استغفر، تاب على بمعنى غفر.

একটি صلة বা صلة ছাড়া কিছু ফেয়েল এর অর্থ পরিবর্তনসহ মুতায়াদ্দি হওয়ার উদাহরণ

١. سأل (بلا صلة) بمعنى طلب، مثلا: سألته كتابا.

٢. سال عن بمعنى استفسر.

٣. دخل (بلا صلة) بمعنى ولج، وبصلة في بمعنى انضمام، مثلا: فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.

٤. حلّ (بلا صلة) بمعنى فكّ أو أطلق، وبصلة ب/على بمعنى أصاب.

الفعل اللازم এর ক্ষেত্রে صلة এর ব্যবহার

ফেয়েলে লাজিমের সাধারণত সুনির্ধারিত কোনো সিলাহ নেই; বরং স্থান ও অবস্থান হিসেবে এর সিলাহ নির্ধারিত হয়ে থাকে। যেমন: بدا يبدو একটি ফেয়েলে লাজিম। এর সুনির্ধারিত সিলাহ নেই; বরং এর সিলাহ স্থান হিসেবে বিভিন্ন রকম হয়।

যেমন: بدا له এর আরবি হবে- তার কাছে প্রকাশ পেয়েছে।

بدا على وجهه তার চেহারায় প্রকাশ পেয়েছে।

* وثب অর্থ লাফ দেয়া। এটি একটি ফেয়েলে লাজিম। এর সুনির্ধারিত কোন সিলাহ নেই। স্থান ও অবস্থান যেমন হবে এর সিলাহও তেমন হবে। যেমন:

وثب له তার জন্য লাফ দিয়েছে।

وثب عليه তার উপরে লাফ দিয়েছে।

وثب إليه তার দিকে লাফ দিয়েছে।

যেহেতু ফেয়েলে লাজিমের কোন সুনির্ধারিত সিলাহ নেই তাই সাধারণত অভিধানে এর সিলাহ পাওয়া যায় না।

এই সিলাহ ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমরা প্রচুর ভুল করে থাকি। যেই স্থানে যেই সিলাহ দরকার সেখানে উপযুক্ত সিলাহ ব্যবহার না করে মন মতো একটি সিলাহ ব্যবহার করে থাকি। আবার অনেক জায়গায় সিলাহর প্রয়োজন নেই কিন্তু সেখানে নিশ্চিন্তে মনমতো একটি সিলাহ ব্যবহার করে থাকি। এমন ভুল থেকে অবশ্যই বাঁচতে হবে। পরিশিষ্টে একটি তালিকা দেয়া হয়েছে তাতে

বহুল ব্যবহৃত ভুলগুলো উল্লেখ করা হয়েছে। পাশাপাশি সঠিক শব্দও উল্লেখ করে দেখানো হয়েছে।

আরবি ভাষাকে উর্দুর প্রভাব থেকে মুক্ত রাখা আবশ্যক

আরবি ভাষায় কোনো মাকালা বা প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে লক্ষণীয় হলো, আরবি ভাষায় যেন উর্দু শব্দ ব্যবহৃত না হয়। আমরা অনেকেই এই ভুলটা করে থাকি। এমন অনেক শব্দ আছে যা আরবি ও উর্দু উভয় ভাষায় ব্যবহৃত হয়। তবে অর্থ থাকে ভিন্ন ভিন্ন। অর্থাৎ একটি শব্দ আরবি ভাষায় ব্যবহৃত হয় এক অর্থে। আবার ওই শব্দটিই উর্দু ভাষায় ব্যবহৃত হয় অন্য অর্থে। এ প্রসঙ্গে মাওলানা নুর আলম খলিল আমিনি রহ. বলতেন, "কোনো পরিচিত শব্দ আসলেই আনন্দিত ও খুশি হওয়ার কোনো কারণ নেই; বরং তার সঠিক অর্থ হৃদয়ঙ্গম করার জন্য অভিধান দেখা চাই।"

নিম্নে এর কয়েকটি উদাহরণ লক্ষ্য করুন-

- 'প্রধানমন্ত্রী' এর জন্য উর্দু ভাষায় وزیر أعظم শব্দ ব্যবহৃত হয়। আরবি ভাষায় 'প্রধানমন্ত্রী' বোঝাতে وزیر أعظم শব্দ ব্যবহার হয় না। যদিও পৃথক পৃথক ভাবে وزیر ও أعظم শব্দদ্বয় আরবি। আরবি ভাষায় তার অর্থ হলো, وزیر অর্থ মন্ত্রী। আর أعظم অর্থ মহান/বড়ো। কিন্তু 'প্রধানমন্ত্রী' বোঝাতে আরবি ভাষায় যে শব্দটি ব্যবহার হয় সেটি হলো- رئيس الوزراء

  এখন যদি কেউ 'প্রধানমন্ত্রী'-র অর্থে وزیر أعظم শব্দ ব্যহার করে তাহলে তা অবশ্যই ভুল হবে।
- 'প্রধান' এর অর্থ বোঝানোর জন্য উর্দু ভাষায় ব্যবহৃত হয় صدر শব্দ। যদিও صدر শব্দটি আরবি ভাষার একটি শব্দ। তবে আরবি ভাষায় তার অর্থ ভিন্ন। আরবি ভাষায় তার অর্থ হলো, বুক। আর 'প্রধান' এর অর্থ বোঝানোর জন্য আরবি ভাষায় যে শব্দটি ব্যবহৃত হয় সেটি হলো, رئيس

অতএব, আরবি ভাষায় 'প্রধান' এর অর্থ বোঝাতে رئيس ব্যবহার না করে যদি صدر শব্দ ব্যবহার করা হয় তবে তা মোটেই শুদ্ধ হবে না।

- 'দরিদ্র' অর্থ বোঝানোর জন্য উর্দু ভাষায় غريب শব্দ ব্যবহার হয়। কিন্তু আরবি ভাষায় غريب শব্দটি 'দরিদ্র' অর্থে ব্যবহৃত হয় না। বরং 'বিরল' অর্থে ব্যবহৃত হয়। পক্ষান্তরে 'দরিদ্র' বোঝানোর জন্য আরবি ভাষায় ব্যবহৃত হয় فقير শব্দ।
- 'উকিল' অর্থে উর্দু ভাষায় ব্যবহৃত হয় وكيل শব্দ। পক্ষান্তরে আরবি ভাষায় ব্যবহৃত হয় المحامي শব্দ।
- অনুরূপ 'বর্তমান পরিস্থিতি' অর্থে উর্দু ভাষায় ব্যবহৃত হয় موجوده حالت শব্দ। পক্ষান্তরে আরবিতে ব্যবহৃত হয় الوضع الراهن শব্দ।
- উর্দু ভাষায় 'চাকরিজীবি, কর্মী' অর্থ বোঝানোর জন্য ملازم শব্দ ব্যবহৃত হয়। আর ملازمة অর্থ হলো, চাকরি, ডিউটি। এ শব্দটি আরবিতেও ব্যবহৃত হয়। তবে চাকরি, ডিউটি ইত্যাদি অর্থে নয়। বরং কোনো কাজে অব্যাহতভাবে লেগে থাকা, বিরামহীনভাবে করা, আবশ্যকভাবে করা ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়। পক্ষান্তরে আরবিতে 'চাকরি' অর্থে ব্যবহৃত হয় وظيفة, আর চাকরিজীবি অর্থে موظّف শব্দ ব্যবহৃত হয়। তাই কোনো আরব 'আমি চাকরি পেয়েছি' মর্মটি বোঝানোর জন্য حصلت على الملازمة বলে না। বরং حصلت على الوظيفة বলে। আর وظيفة শব্দটি উর্দু ভাষায়ও ব্যবহৃত হয়। কিন্তু 'বেতন, পারিশ্রমিক, কোনো নির্দিষ্ট দুআ বা পীর-বুজুর্গের সবক বা বিশেষ কোনো আমলের অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর 'বেতন, পারিশ্রমিক' অর্থের জন্য আরবিতে راتب، منحة، شهرية এবং অজিফার জন্য وِرْدٌ (ج) أوراد শব্দ ব্যবহৃত হয়।

- আরবি ভাষায় تقرير (ج) تقارير অর্থ: রিপোর্ট, প্রতিবেদন। যেমন: تقرير سنوي বার্ষিক রিপোর্ট। অথচ উর্দু ভাষায় تقرير শব্দটি ব্যবহৃত হয় 'ভাষণ, বক্তৃতা' অর্থে। যেমন: وه تقرير كرينكي তিনি ভাষণ প্রদান করবেন। আর আরবি ভাষায় 'ভাষণ, বক্তৃতা' এর অর্থ প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত হয় خطبة، بيان ইত্যাদি শব্দ।

- আরবিতে أهمّ শব্দটি اسم التفضيل অর্থ: অধিক গুরুত্বপূর্ণ। উর্দুতেও এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। তবে তার অর্থ হয় শুধু 'গুরুত্ব'। তার মধ্যে আধিক্যের অর্থটি থাকে না। আর উর্দুতে 'অধিক গুরুত্ব' বোঝানোর জন্য زياده اهم، اهم ترين ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হয়।

অতএব, অত্যন্ত গভীরভাবে খেয়াল রাখতে হবে যেন উর্দু শব্দ আরবি ভাষায় ব্যবহৃত না হয়ে যায়।

আরবি লেখায় علامات الترقيم ও কাওয়ায়িদুল ইমলার প্রতি লক্ষ্য রাখা জরুরি

আরবি লেখার ক্ষেত্রে আলামাতুত তারকিম ও কাওয়ায়িদুল ইমলার প্রতি লক্ষ্য রাখা অত্যন্ত জরুরি। এই বিষয়টির ক্ষেত্রে আমাদের যথেষ্ট অবহেলা রয়েছে। অনেক সুন্দর মাকালা বা প্রবন্ধ লিখলেও তাতে আলামাতুত তারকিম ও কাওয়ায়িদুল ইমলার ব্যবহার ঠিক না থাকার কারণে আরবদের নিকট লেখার মান অনেকটাই কমে যাবে। আমরা এ বিষয়ের প্রতি একদম গুরুত্ব দিই না। এটা যে ভুল তা মনেই করি না।

নিম্নে কিছু আলামাতুত তারকিম ও কাওয়ায়িদুল ইমলা সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

علامات الترقيم এর পরিচয়

বাক্যের অর্থ ও উদ্দেশ্য স্পষ্টরূপে বুঝানোর জন্য বাক্যের মাঝে যেসব চিহ্ন ব্যবহৃত হয় তাকে علامات الترقيم বলে। বাংলা ভাষায় علامات الترقيم

কে যতি চিহ্ন, বিরাম চিহ্ন, বিরতি চিহ্ন ইত্যাদি বলা হয়। নিম্নে علامات الترقيم গুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও ব্যবহারের ক্ষেত্র উল্লেখ করা হলো।

১. الفاصلة - কমা

২. الفاصلة المنقوطة – সেমিকোলন

৩. النقطة/الوقفة – দাঁড়ি

৪. علامة الاستفهام – প্রশ্নবোধক চিহ্ন

৫. علامة التعجب – বিস্ময় প্রকাশক চিহ্ন

৬. النقطتان الفوقيتان – কোলন

৭. الشرطة/الوصلة – হাইফেন ও ড্যাস

৮. القوسان/الهلالان – বন্ধনী

৯. علامة التنصيص – উদ্ধৃতি চিহ্ন

১০. علامة الحذف – বর্জন চিহ্ন

১১. البديل – বিকল্প চিহ্ন

যতি চিহ্ন ব্যবহারের স্থানসমূহ

- الفاصلة - কমা (،)

কমার স্থানে অল্পক্ষণ বিরতি দিতে হয়। নিম্নোক্ত স্থানসমূহে الفاصلة বা কমা চিহ্ন ব্যবহার হয়:

১. المنادى এর পর। যেমন- .يا خالد، أعزّ الله بك الإسلام

২. কোনো জিনিসের দুই বা ততোধিক প্রকার, শ্রেণি বা অংশের মাঝে। যেমন- .أنواع المواصلات ثلاثة: بريّة، وبحريّة، وجويّة

৩. এমন ছোট ছোট একাধিক বাক্যের মাঝে, যেগুলো মিলে অর্থবোধক বড়ো বাক্য গঠিত হয়। যেমন-

أدب الإسلام أدب ملتزم: يلتزم بالدفاع عن عقيدة التوحيد، ويدعو إلى التخلق بخلق القرآن المجيد، وينافع عن الفقراء والمستضعفين.

৪. প্রধান বাক্য ও উপবাক্যের মাঝে। যেমন:

لا ينام فاعل خير على فعله، ولا كريم على كرمه، ولا صادق على صدقه.

৫. بدل ও مبدل منه এর মাঝে। যেমন:

جاء رجل إلى أمير المؤمنين، أبي بكر رضي الله عنه

৬. معطوف ও معطوف عليه এর মাঝে। যেমন:

كانت عائشة، وخديجة رضي الله عنهما من أمهات المؤمنين

৭. الجملة الحالية এর পূর্বে। যেমন: رأيت الأستاذ، يصلي في المسجد.

৮. الجملة الوصفية তথা বর্ণনামূলক ও গুণবাচক বাক্যের পূর্বে। যেমন:

هذا طالب يحبه المدرسون

৯. قسم ও جواب قسم এর মাঝে। যেমন: والله، لأسافرن إلى مكة المكرمة.

১০. شرط ও جواب شرط এর মাঝে। যেমন: إذا صدقتني الحديث، عفوت عنك

১১. এক জাতীয় একাধিক শব্দ পাশাপাশি ব্যবহৃত হলে তাদের মাঝে। যেমন: علمت زيدا، وراشدا، وخالدا.

১২. একই ধরনের একাধিক বাক্যের মাঝে। যেমন:

بلال دخل الفصل، ووضع الحقيبة، وأخذ الكتاب، وقرأ الدرس

১৩. একাধিক সংখ্যার মাঝে। যেমন: ২৮٠ ،٥٠ ،١٢ ،٨ ،٣ ،

- **الفاصلة المنقوطة বা সেমিকোলন (;)**

الفاصلة المنقوطة চিহ্নের স্থানে কমার চেয়ে একটু বেশী এবং দাঁড়ির চেয়ে একটু কম পরিমাণ বিরতি দিতে হবে। নিম্নোক্ত স্থানসমূহে الفاصلة المنقوطة ব্যবহৃত হয়:

১. অর্থের দিক থেকে একই গঠনের একাধিক বড়ো বাক্যের মাঝে। যেমন-

إن رأيتم الخير فخذوه به؛ وإن رأيتم ا لشر فدعوه.

২. এমন দু'বাক্যের মাঝে, যার দ্বিতীয়টি প্রথমটির কারণ হয়। যেমন-

كافأ المعلم خالدا؛ لأنه متفوّق في دراسته.

৩. এমন দু'বাক্যের মাঝে, যার প্রথমটি দ্বিতীয়টির কারণ হয়। যেমন-

إذا ما رسبتُ في الاختبار؛ أهانني زملائي.

৪. একই বাক্যে বিভিন্ন শ্রেণির কয়েক প্রকার জিনিস থাকলে ভিন্ন ভিন্ন শেণির মাঝে। যেমন-

علم الحيوان: الجمل، والثور، والحمار؛ والأسد، والنمر، والذئب؛ والحوت، والسمك، والضفدع.

- **النقطة/الوقفة বা দাঁড়ি/পূর্ণচ্ছেদ (।)**

যেখানে বাক্য সম্পূর্ণ হয়ে যায়, সেখানে النقطة/الوقفة বা দাঁড়ি ব্যবহৃত হয়। যেমন-

لا تجعل في أمورك.

- **علامة الاستفهام বা প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?)**

যে বাক্য দ্বারা কোনো কিছু প্রশ্ন করা হয়, সে বাক্যের শেষে علامة الاستفهام প্রশ্নবোধক চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যেমন- ما اسمك؟

- **علامة التعجب বা প্রভাব/বিস্ময় প্রকাশক চিহ্ন (!)**

নিম্নোক্ত স্থানসমূহে علامة التعجب ব্যবহৃত হয়:

১. تعجب বা বিস্ময় প্রকাশক বাক্যের শেষে। যেমন-

ما أحسن هذا الكتاب!

২. كم خبرية যুক্ত বাক্যের শেষে। যেমন-

كم كتب عندك!

৩. تمني প্রকাশক বাক্যের শেষে। যেমন-

ليت الشباب يعود يوما!

৪. التحذير তথা সতর্ককরণের জন্য ব্যবহৃত বাক্যের শেষে। যেমন-

إياك والنميمة يا أحمد!

৫. উদ্বুদ্ধ ও প্ররোচনা দেয়ার জন্য ব্যবহৃত বাক্যের শেষে। যেমন-

الجهاد، الجهاد!

৬. দুআর জন্য ব্যবহৃত বাক্যের শেষে। যেমন-

جزاك الله خيرا!

৭. দুঃখ ও অনুতাপ প্রকাশক বাক্যের শেষে। যেমন-

وا مصيبتاه!

৮. আনন্দ প্রকাশক বাক্যের শেষে। যেমন-

وا فرحتاه!

৯. সাহায্য প্রার্থনা প্রকাশক বাক্যের শেষে। যেমন-

يا للضعفاء من ظلم الأقوياء!

- **النقطتان الفوقيتان বা কোলন (:)**

নিম্নোক্ত স্থানসমূহে القطتان الفوقيتان ব্যবহৃত হয়:

১. قول ও مقولة এবং قول ও مقولة এর সাথে সাদৃশ্য রাখে এমন বাক্যের মাঝে। যেমন:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "طلب العلم فريضة على كل مسلم".

২. যে কোনো উদ্ধৃতির পূর্বে। যেমন-

جاء في الحديث الشريف: "طلب العلم فريضة على كل مسلم".

৩. যে কোনো কিছুর তালিকার পূর্বে। যেমন-

جب الأشياء الآتية من السوق: الكتاب، والكراسة، والقلم.

৪. قسم ও مقسم এর মাঝে। যেমন- الاسم قسمان: جامد، ومشتق.

৫. শব্দ বা বাক্যের বিশ্লেষণের পূর্বে। যেমন-

الاسم: ما دلّ على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة.

৬. দৃষ্টান্তের পূর্বে। যেমন-

كان وأخواتها تدخل على المبتدأ والخبر، فترفع المبتدأ، وتنصب الخبر، مثل: كان الرجل صالحا.

৭. محادثة বা কথোপকথনে বক্তার নামের শেষে। যেমন-

خالد: السلام عليكم ورحمة الله.

راشد: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

خالد: ما اسمك الكريم يا أخي؟

راشد: اسمي راشد الإسلام.

- **الوصلة বা হাইফেন (-) ও الشرطة বা ড্যাস (-):**

আরবিতে الوصلة আর الشرطة এর মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। নিম্নোক্ত স্থানসমূহে الوصلة বা الشرطة ব্যবহৃত হয়। যেমন-

১. جملة معترضة এর আগে ও পরে। যেমন-

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الطهور شطر الإيمان."

২. বাক্যের শেষে যখন কোনো কিছু ইচ্ছাকৃত ছেড়ে দেয়া হয়। যেমন-

بكر: أين عمك؟ يا خالد!

خالد: لا أدري، أذهب إلى بيته، و-

৩. محادثة বা কথোপকথনে বক্তার নামের পরিবর্তে। যেমন-

-كيف حالك؟

-بخير والحمد لله.

-متى رجعت إلى المدرسة؟

-رجعت اليوم؟

৪. থেকে বুঝানোর জন্য। যেমন-

مكة المكرمة-المدينة المنورة/٣-٨

৫. শব্দ ও তার বিশ্লেষণের মাঝে। যেমন-

ما ذهب خالد.

ما- حرف النفي، مبنية على السكون.

ذهب- فعل ماض، مبني على الفتح.

خالد- فاعل، مرفوع بالضم.

৬. সমান প্রয়োজনীয় অনেকগুলো শব্দ বা বাক্যের মাঝে। যেমন-

اجمع الكلمات الآيتة. كتاب -قلم -كراسة -طاولة.

৭. ক্রমিক নং এর পরে। যেমন-

الكلمة على ثلاثة أقسام : ١. اسم ٢. فعل ٣. حرف

- **القوسان/الهلالان বা বন্ধনী {}-[]-()**

নিম্নোক্ত স্থানসমূহে القوسان/الهلالان ব্যবহৃত হয়:

১. বাক্যের মাঝে তার কোনো অংশের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে।

যেমন:

أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا إلى كسرى (ملك فارس) يدعوه فيه للإسلام.

২. কোনো বক্তব্যকে ব্যাপক করতে যেসব শব্দ নেয়া হয়, সেগুলোর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য। যেমন-

أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرباط على سواحل بلاد الشام (فلسطين وما يحيط بها) إلى يوم القيامة.

৩. বাক্যের মাঝে সতর্কতামূলক কোনো কিছু উল্লেখ করা হলে। যেমন-

جاء موسم الحصاد (بفتح الحاء وكسرها) ونزل المزارعون إلى حقولهم.

- **علامة التنصيص/الاقتباس বা উদ্ধৃতি চিহ্ন ("" ও '')**

বাংলায় চিহ্ন দু'ধরনের হয়ে থাকে:

১. এক উদ্ধৃতি চিহ্ন । যেমন: ''

২. জোড় উদ্ধৃতি চিহ্ন । যেমন: “”

আরবিতেও উদ্ধৃতি চিহ্ন দু'ধরনের হয়ে থাকে:

১. এক উদ্ধৃতি চিহ্ন । যেমন: ‘’

২. জোড় উদ্ধৃতি চিহ্ন । যেমন: “”

নিম্নোক্ত স্থানসমূহে علامة التنصيص/الاقتباس বা উদ্ধৃতি চিহ্ন ব্যবহৃত হয়:

১. কোনো উৎস, সূত্র বা গ্রন্থ থেকে অন্যের বক্তব্য বা উক্তি অবিকল নিজ লেখায় উল্লেখ করতে। যেমন:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الطهور شطر الإيمان."

২. নির্দিষ্ট শব্দে মনোযোগ আকর্ষণের জন্য। যেমন-

أوزان جموع القلة أربعة: "أفعلة"، و"أفعل"، و"أفعال"، و"فعلة."

৩. নির্দিষ্ট কোনো কিছুর নাম উল্লেখের জন্য। যেমন-

وبعد، فهذا كتاب "الهداية."

- **علامة الحذف বা বর্জন চিহ্ন (...)**

অন্যের বক্তব্য বা লেখা থেকে কিছু অংশ বাদ দেয়ার জন্য علامة الحذف ব্যবহৃত হয়। যেমন-

سجود التلاوة في القرآن أربعة عشر: وهي ... والسجود واجب في هذه المواضع كلها على التلي والسامع.

- البديل বা বিকল্প চিহ্ন (/)

দুই বা ততোধিক জিনিসের মধ্যে সন্দেহমূলক কোনো একটি বর্ণনার জন্য البديل ব্যবহৃত হয়। যেমন: جاء بلال/هلال

الهمزة الأصلية والوصلية والقطعية এর পরিচয়

الهمزة الوصلية : শব্দের শুরুতে সাকিন থাকার কারণে যে হামজাকে শব্দের শুরুতে যুক্ত করা হয় তাকে الهمزة الوصلية বলে।

الهمزة الوصلية চেনার সহজ উপায় হলো, الهمزة الوصلية যুক্ত কোনো শব্দ বাক্যের শুরুতে এলে হামযাটি উচ্চারিত হয়। কিন্তু বাক্যের মাঝে এলে হামযার পূর্বের হরফ পরের হরফের সাথে মিলিয়ে পড়ার কারণে হামজাটি উচ্চারিত হয় না।

الهمزة الوصلية এর তালিকা:

- তিন হরফ বিশিষ্ট মাজির আমরের হামজা। যেমন- اسمع، اضرب، انصر، افتح
- পাঁচ ও ছয় হরফ বিশিষ্ট মাজির মাসদারের হামজা, মাজির হামজা ও আমরের হামজা। যেমন–

  افتتاح، افتتح، افتتِحْ

  استغفار، استغفر، استغفِرْ
- معرفة এর ال এর শুরুর হামজা। যেমন- المسجد، المدرسة، البيت، الدين
- নিম্নোক্ত শব্দগুলোর শুরুর হামজা:

  ابن، ابنان، ابنة، امرؤ، امران، امرأة، امرأتان، اِبْنُم[1]، ابنَمان، .اسم، اسمان، است، استان، اثنان، اثنتان، ايمُنٌ، ايمُ

الهمزة القطعية/الأصلية : যে হামজা শব্দের শুরুতে আসে এবং শব্দটি বাক্যের শুরুতে ও মাঝে যেখানেই আসুক সর্বত্র হামজাটি উচ্চারিত হয়।

---

(১) ابنم শব্দটি ابن এর অর্থে ব্যবহৃত হয়।

الهمزة القطعية/الأصلية এর তালিকা:

তিন বা চার হরফ বিশিষ্ট মাজির মাসদারের হামজা ও মাজির হামজা। যেমন:

أخذ، أكل، أخذٌ، أكلٌ

أقام، أكرم، إقامة، إكرام

১. চার হরফ বিশিষ্ট মাজির আমরের হামজা। যেমন:

أَقِمْ، أَكْرِمْ

২. مضارع এর المفرد المتكلم এর শুরুর همزة। যেমন:

أجتنب، أضرب، أنفطر، أستنصر

৩. সকল فعل التعجب এর همزة। যেমন: ما أحسنه، وأحسن به

৪. معرفة এর ال ব্যতীত অন্য সকল হরফের শুরুর همزة। যেমন: ألا، إلى، أ، إن، إلا

৫. অসলি/আরেজি হামজার এর বর্ণনায় উল্লিখিত ইসমগুলো ব্যতীত সকল ইসমের শুরুর হামজা এবং সেগুলোসহ সকল ইসমের جمع এর শুরুর همزة। যেমন:

أنت، أنا، أسماء، أبناء، أفضل، أديان، أسد، إحسان، أحمد، أحد عشر، أمس، إذا، أفّ، أيّ، أولئك.

বি. দ্র.

- তিন, চার, পাঁচ বা ছয় হরফ বিশিষ্ট মাজি দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, মাজির المفرد المذكر الغائب এর সিগাটি তিন, চার, পাঁচ বা ছয় হরফ বিশিষ্ট হওয়া। হরফগুলো মূল হরফ হোক বা অতিরিক্ত হরফ হোক, সবগুলোকে গুনতে হবে।

- হামজায়ে অসলি যখন হামযায়ে কতয়ি হয়:

১. যখন হরফে নেদার মাধ্যমে الله শব্দটি মুনাদা হয়। যেমন: يا أللہ

২. যখন হামজায়ে অসলি বিশিষ্ট শব্দ দ্বারা কারো নাম রাখা হয়। যেমন: امتياز، اهتشام যখন কারো নাম রাখা হয়, তখন লিখতে হবে-

إمتياز، إهتشام

তেমনিভাবে يوم الإثنين একটি বারের নাম হওয়ায় কারণে اثنين এর همزة টি কতয়ি হয়ে গেছে।

৩. ال সম্পর্কে যখন কিছু বলা হয়। যেমন:

عرِّفْ هذه النكرة بـ (أل)

همزه কীভাবে লিখতে হবে?

হামজা যদি কোনো শব্দের শুরুতে হয়, সর্বদা তাকে আলিফের ওপর লেখা হয়। চাই হামজা জবর বিশিষ্ট হোক, যেমন- أخذ, অথবা যের বিশিষ্ট হোক। যেমন- إلى, অথবা পেশবিশিষ্ট হোক। যেমন- أكل।

বি. দ্র. আলিফ যদি জবর জের বা পেশ বিশিষ্ট অর্থাৎ তার ওপরে হরকত হয়, তা হলে আলিফের ওপর শুধু হামজা লিখে দেওয়া হয়। আর যদি জের বিশিষ্ট হয়, তাহলে আলিফের নিচে হামজা লিখে দেওয়া হয়। এ বিষয়টির প্রতি আমাদের অনেকেই লক্ষ্য রাখে না। অথচ বর্তমানে মুদ্রিত আরববিশ্বের কোনো কিতাবে এর ব্যতিক্রম দেয়া যায় না।

همزه কোনো শব্দের মধ্যে ব্যবহৃত হলে তার বিধান

প্রথমত তাকে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলোতে একাকী অর্থাৎ কোনো হরফের সাথে সংযুক্ত করা ছাড়া লেখা হবে-

- যখন আলিফের পরে (অর্থাৎ যে আলিফ মদের হরফ হয়) জবর বিশিষ্ট হামজা হয়। যেমন:

قراءة، غوغاء، ضوضاء، تفاءل এ শব্দগুলোর মধ্যে হামজা আলিফে মদের পরে এসেছে বিধায় হামজাকে একাকী লেখা হয়েছে।

- واو ساكنة তথা জজমবিশিষ্ট واو এর পর যদি হামজাটি পেশ অথবা জবরবিশিষ্ট হয় (অর্থাৎ তার উপরে যেই হরকত দুটি হয়) তখনও হামজাকে একাকী লেখা হয়। যেমন: السَّموءل، هُدوء، ضَوءك এসবগুলো শব্দে হামজা واو সাকিনের পর যবর অথবা পেশ বিশিষ্ট হয়েছে বিধায় হামজাকে একাকী লেখা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়



مهارة الكلام বা কথন-দক্ষতা

الكلام বা কথন এর পরিচয়

الكلام বা কথন হচ্ছে মানুষের মনে যে চিন্তার উদয় হয়, তা প্রকাশের ধ্বনি বা উচ্চারণগত রূপ। ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে الكلام বা কথন একটি মৌলিক দক্ষতা। কেননা এর মাধ্যমে ভাষা শিক্ষার উদ্দেশ্য তথা অপরের সাথে যোগাযোগ করার বিষয়টি কার্যকর হয়ে থাকে। মানুষ শ্রবণ ও পঠনের মাধ্যমে যা কিছু শিক্ষা গ্রহণ করে তা মুখে প্রকাশ করাই হচ্ছে الكلام বা কথন। পারিভাষিক সংজ্ঞায় الكلام বা কথন হলো, যথার্থ সম্পাদন ও সঠিক বাচনভঙ্গিসহ বক্তার মনের অনুভূতি, বিশ্বাস, চিন্তা-চেতনা, দৃষ্টিভঙ্গি, তাৎপর্য,

সুখ-দুঃখ, হাসি-আনন্দ, বিপদাপদ ইত্যাদির সংবাদ সাবলীলভাবে অন্যের কাছে পৌঁছানোর দক্ষতা।

المحادثة বা কথোপকথন এর পরিচয়

المحادثة বা কথোপকথন এর পরিচয় বর্ণনা করতে গিয়ে ড. আহমদ বলেন, "মুহাদাছা হলো, উন্মুক্ত আলোচনা, যা নির্দিষ্ট বিষয়ে দুই ব্যক্তির মাঝে চলতে থাকে।" এ সংজ্ঞা থেকে চারটি বিষয় প্রকাশ পাচ্ছে। (ক) আলোচনা। (খ) স্বাধীনতা। (গ) দুই ব্যক্তি। (ঘ) একটি নির্দিষ্ট বিষয়। তাই বলা যায়, মুহাদাছা হলো, কোনোরূপ বলপ্রয়োগ ব্যতীত দুই ব্যক্তির মাঝে কোনো একটি বিষয় নিয়ে উন্মুক্ত আলোচনা। সুতরাং আলোচনাবিহীন, অনুন্মুক্ত ও নির্দিষ্ট বিষয় বহির্ভূত কোনো ব্যক্তির কথাকে মুহাদাছা বলা যায় না। নাহুর পরিভাষায়, কালাম, কথোপকথন, সংবাদ ও আলোচনা এক বিষয় নয়। আর এখানে কালাম দ্বারা বোঝায় কথোপকথন, সংবাদ ও আলোচনা।

কথন-দক্ষতার গুরুত্ব

কথন দক্ষতা মানুষের স্বতন্ত্র আলামত বা নিদর্শন ও বৈশিষ্ট। মৌখিক কথন ভাষা সম্পাদনের প্রথম ও প্রধান রূপ। আর লিখন হচ্ছে কথাকে অঙ্কনের প্রচেষ্টা মাত্র। এর পেছনে অনেক যুক্তিও রয়েছে। যেমনঃ

- মানুষ লেখা শেখার অনেক আগেই কথা বলতে শিখে। অর্থাৎ মানুষের জীবনে লিখন দক্ষতা অনেক বিলম্বে অর্জিত হয়ে থাকে।

- মানুষ বিশেষত শিশুরা লিখনের প্রশিক্ষণ গ্রহণের পূর্বেই কথনের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে থাকে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গমনের পূর্বেই কথা বলার প্রশিক্ষণ এমনিতেই হয়ে যায়। কিন্তু সাধারণত লিখনের প্রশিক্ষণটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গমনের পরই হয়ে থাকে।

- পৃথিবীর প্রায় সব ভাষাতেই কথা বলতে পারে এমন অনেক মানুষ আছে, যারা সে ভাষাটি লিখতে পারে না।

- আবার পৃথিবীতে এমন কিছু ভাষা আছে যাতে শুধু কথা বলা হয়, কিন্তু তার কোনো লিখিত রূপ নেই। যেমন, মালয় ভাষা।

ভাষা সম্পাদনের অনেক রূপ থাকা সত্ত্বেও কথন রূপকে অন্তরের অভ্যন্তরে লুকায়িত বিষয়কে অন্যের নিকট পৌঁছানোর মৌলিক উপায় হিসেবে গণ্য করা হয়। অধিকাংশ ভাষাবিদদের মতে, ভাষার কার্যক্রমের শতকরা ৯৫ ভাগ মৌখিক কথনের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। কেননা মানুষ এর মাধ্যমে অপরের সাথে দ্রুত যোগাযোগ করতে পারে। আর যে ব্যক্তি কথায় দক্ষ এবং সুন্দরভাবে কথা বলতে পারে সে জীবনের অধিকাংশ ক্ষেত্রে সফল হয়ে থাকে। এ দক্ষতার মাধ্যমে মানুষ নিজেকে অন্যের নিকট আকৃষ্ট করে তোলে। মূলত এর মাধ্যমে ব্যক্তির বিচক্ষণতার পরিচয় ঘটে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে যোগাযোগের ক্ষেত্র ও মাধ্যমসমূহ বৃদ্ধি পেতে থাকে। তখন এক দেশ থেকে অন্য দেশে ভ্রমণ বা স্থানান্তরের বিষয়টি ব্যাপক আকার ধারণ করলে মানুষের মৌখিক যোগাযোগের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে তখন থেকে বিদেশী ভাষা শেখার ক্ষেত্রে এ দক্ষতার তীব্র প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা হয়।[১]

কথন দক্ষতার লক্ষ্য

'কথন দক্ষতা'র অন্যতম লক্ষ্য তিনটি:

- المحادثة তথা কথোপকথন।
- الخطبة তথা বক্তৃতা।
- الكلام الوظيفي তথা ব্যবহারিক কথাবার্তা।

المحادثة তথা কথোপকথন

কথন দক্ষতার তিনটি লক্ষ্যের অন্যমত একটি হলো, المحادثة বা কথোপকথন করা। অর্থাৎ বন্ধু, ভাই, সহপাঠী, উসতাদ কিংবা অন্য কারো সাথে কোনো একটি বিষয় নিয়ে সঠিক উচ্চারণে এবং আরবদের লাহজা বা বাচনভঙ্গি ও ধ্বনি-তরঙ্গ বজায় রেখে আরবি ভাষায় পরস্পরে কথা বলা।

---

(১) তথ্যসূত্র: তালিমুল আরাবিয়্যাহ লিগাইরিন নাতিকিনা বিহা মানাহিজুহু ওয়া আসালিবুহু: ড. রুশদী আহমাদ তুআইমাহ, পৃষ্ঠা: ১৬০, আরবি ভাষায় দক্ষতা শিক্ষাদান পদ্ধতি, প্রফেসর ড. মোহাম্মদ ইউছুফ, পৃষ্ঠা: ৭৮, আরবি ভাষা পাঠদান পদ্ধতি, ড. মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম, পৃষ্ঠা: ৬৬-৬৭

الخطبة। তথা বক্তৃতা প্রদান করা

কথন দক্ষতার আরেকটি অন্যতম লক্ষ্য হলো, কোনো সভা-সেমিনারে বক্তৃতা প্রদান করা। এছাড়া কোনো সভায় আরব মেহমানদের আগমন উপলক্ষ্যে অভিনন্দন ও স্বাগত বক্তব্য পেশ করা বা শোকসভার স্থানে শোক প্রকাশ করা।

কথন দক্ষতার আরেকটি লক্ষ্য হলো, ব্যবহারিক কথাবার্তা। অর্থাৎ মানুষের পরস্পরের সাথে যোগাযোগ করতে কথা বলা। মানুষ তাদের জীবনের বিভিন্ন প্রয়োজন মিটানোর জন্য কথা বলে। যেমন, পারস্পরিক কথোপকথন, আলোচনা, সামাজিক কথাবার্তা, ক্রয়-বিক্রয়ের কথাবার্তা, প্রশাসনিক প্রয়োজনীয় আলোচনা, পরামর্শ, বাণী, খবরাখবর, রাজনৈতিক ও সামাজিক বক্তৃতা, ধর্মীয় আলোচনা, সান্ধ্যকালীন খোশগল্প ইত্যাদি। মানব জীবনে ব্যবহারিক কথাবার্তা অতীব প্রয়োজন। মানুষ একে এড়িয়ে চলতে পারে না। এছাড়া তার জীবনপথ চলা অসম্ভব। তো এই কথাবার্তা ও আলোচনা যেন আরবি ভাষায় সাবলীলভাবে করা সম্ভব হয় সেজন্যই কথন দক্ষতা অর্জন করতে হয়।

আরবি ভাষায় কথন দক্ষতা অর্জনের পদ্ধতি

আমরা সবাই আরবি ভাষায় কথা বলতে চাই। কিন্তু সমস্যা হলো, আরবি ভাষায় কথা বলার সময় আটকে যাই। সাবলীলভাবে মুখ থেকে কথা বের হয় না ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের ভুলের কারণে বাধাগ্রস্থ হতে হয়। যেমন, ইরাবজনিত ভুল, সিগার ভুল, ইজাফতের ভুল, মাওসুফ-সিফাতের ভুল, বাক্যগঠনগতসহ ইত্যাদি নানারকমের ভুল-ভ্রান্তি আরবিতে কথা বলার সময় এসে ভিড় করে। এজাতীয় সমস্যা শুধু দুর্বল ছাত্রদের হয় তা কিন্তু নয়। এমন অনেক ভালো ছাত্র আছে, যারা সাবলীলভাবে শুদ্ধ করে আরবি কিতাবের ইবারত পড়তে পারে, তরজমাও করতে পারে, নাহু-সরফের কাওয়ায়িদও যথেষ্ট পরিমাণ জানে, আরবি শব্দভাণ্ডার অনেক মুখস্থ; অথচ বলার সময় মনের ভাব সাবলীলভাবে প্রকাশ করতে পারছে না। বারবার আটকে যাচ্ছে। বিভিন্ন ধরনের ভুলের সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

এখন প্রশ্ন হলো, কী পদ্ধতি অবলম্বন করলে সাবলীলভাবে অনর্গল আরবিতে কথা বলা শেখা যাবে? আরবিতে কথা বলার দক্ষতা অর্জন করার জন্য করণীয় হলো–

- লজ্জা, ভয় ও সংকোচ ত্যাগ করা।
- আরবিতে কথা বলার সময় নাহু-সরফ বা অন্য কোনো ভুল-ত্রুটির প্রতি খেয়াল না করা।
- একটি সময় নির্ধারণ করা, যখন শুধু আরবিতে কথা বলা হবে।
- ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সময়গুলোকে কাজে লাগানো।
- আরবিতে কথা বলার জন্য সম্মিলিত প্রচেষ্টা জরুরি।
- আরবিতে চিন্তা-ভাবনা করা।
- আরবিতে কথোপকথনের পূর্বে নিজে নিজে তামরিন করা।
- আরবি শব্দভাণ্ডার বৃদ্ধি করা।
- আরবি ভাষায় প্রশ্ন করা ও উত্তর দেয়ার দক্ষতা অর্জন করা।
- প্রতি সপ্তাহে একটি আরবি বক্তৃতা প্রদান করা।
- আরবিতে বিতর্ক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা
- আরবি কথোপকথন ও আরবি বক্তৃতা আরবীয় লাহজা বা আরবীয় বাচনভঙ্গিতে করার চেষ্টা করা।
- দাওয়াত ও তাবলিগ জামাতে আগত আরব মেহমানদের সাথে আরবিতে কথা বলার সুযোগ হাতছাড়া না করা।
- আরবি ভাষার কিছু আদর্শ মুকালামা মনোযোগ সহকারে পড়া ও আয়ত্ত করা।
- প্রতিদিন কিছু কিছু আরবদের বয়ান শ্রবণ করা এবং তা অনুকরণ করার চেষ্টা করা।

উপরোল্লিখিত বিষয়গুলো সম্পর্কে এখন বিস্তারিত আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

লজ্জা, ভয় ও সংকোচ ত্যাগ করা

আরবিতে কথা বলার দক্ষতা অর্জনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড়ো বাঁধা হলো, লজ্জা, ভয় ও সংকোচ। অনেকেই মনে করে যে, আমি আরবিতে কথা বললে অন্যরা কী ভাববে? কী বলবে? আমি কি আরবিতে কথা বলতে পারব? এধরনের ভীতি ভেতরে কাজ করে থাকে। না, এধরনের লজ্জা ও ভীতি একদম করা যাবে না। কে কী বলল, কে কী ভাবলো তা নিয়ে মাথা ঘামানো যাবে না। লজ্জা ভেঙে, ভয়-ভীতি দূর করে বুকে সাহস নিয়ে আরবিতে কথা বলে যেতে হবে।

আপনার চারপাশের যেসকল মানুষের জন্য লজ্জাবোধ করে আপনি কথা বলা হতে বিরত থাকছেন, একদিন তারাই আপনাকে তিরস্কার করবে যখন আপনি আরবিতে কথা বলতে অক্ষম হবেন। পক্ষান্তরে লজ্জা ভেঙে হিম্মত করে আরবিতে কথা বলতে বলতে একসময় যখন কথন দক্ষতা পাকাপোক্তভাবে অর্জিত হয়ে যাবে তখন তারাই আপনার প্রশংসা করতে বাধ্য হবে।

আরবিতে কথা বলার সময় নাহু-সরফ বা অন্য কোনো ভুল-ত্রুটির প্রতি খেয়াল না করা

এই ভুলটা আমরা অনেকেই করে থাকি যে, আরবিতে কথা বলার সময় আমরা চিন্তা করি যে, কোনো ভুল হচ্ছে কি না, মুজাফ মুজাফ ইলাইহির তাতাবুক ঠিক থাকছে কি না, মাওসুফ-সিফাতের ব্যবহার সহিহ হচ্ছে কি না, মুবতাদা-খবরের ব্যবহার ঠিক আছে কি না ইত্যাদি। বলার সময় যখন চিন্তা এসবের দিকে চলে যাবে তখন মুখ থেকে সাবলীলভাবে কথা বের হবে না; বরং প্রতিটি লাইনেই বাধাগ্রস্ত হতে হবে। যবান চালু হবে না। ভেবে ভেবে একটু একটু করে বলতে হবে।

"আরবি ইলমি কথোপকথন" বইয়ের শুরুতে মাওলানা সফিউল্লাহ ফুআদ হাফিজাহুল্লাহ এর একটি অভিব্যক্তি রয়েছে। তাতে হুজুর লিখেছেন, "যেকোনা ভাষার মতো আরবি ভাষায় কথা বলার দক্ষতা অর্জন করার স্বাভাবিক পদ্ধতি হলো, আরবি ভাষায় কথা বলা শুরু করে দেওয়া-মনের বিভিন্ন ভাব প্রকাশ করার মতো যথেষ্ট পরিমাণ আরবি শব্দ ও বাচনভঙ্গি জানা থাকুক বা না থাকুক, এবং উক্ত কথোপকথন আরবি ব্যাকরণের মানদণ্ডে শুদ্ধ হোক কিংবা ভুল। মাতৃভাষায় কথোপকথনকারীদের অনেকের কথাই যখন ব্যাকরণের মানদণ্ডে নির্ভুল হয় না, তখন অনারবীদের আরবি কথোপকথন আরবি ভাষার

ব্যাকরণের মানদণ্ডে প্রথম থেকেই নির্ভুল না হলে কি মহা দুর্ঘটনা ঘটে যাবে? তাই দ্বিধা-সংকোচ উপেক্ষা করে এবং ভুল-ভ্রান্তির তোয়াক্কা না করে আরবি ভাষায় কথা বলা শুরু করে দিতে হবে। কথন-দক্ষতা অর্জনের এই কর্মরীতি শুধু প্রথমই নয়, প্রধানও বটে।"

মাওলানা সফিউল্লাহ ফুআদ দা. বা. "কাইফা নাতাআল্লামুল ইনশা" ২য় খণ্ডের শুরুতে লিখেছেন, "শুদ্ধ-অশুদ্ধ যেমনই হোক, আরবি ভাষায় কথা বলতে অভ্যস্ত হও। শোনো, কোনো ভাষায় কথা বলার দক্ষতা ওই ভাষায় কথা বলার দ্বারাই অর্জন হয়। শুধু পড়ার দ্বারা বলার দক্ষতা অর্জন হয় না। লজ্জা-সংকোচ উপেক্ষা করে আরবিতে কথা বলতে থাকো, আরবিতে কথা বলার দক্ষতা অবশ্যই অর্জন হবে।"

তাই নিয়ম হলো, চর্চার জন্য যখন আমরা আরবিতে কথা বলব, তখন কোনো ভুলের দিকে তাকাবো না। শুধু আরবিতে বলে যাবো। ভুল যতই হোক, আমার কাজ বলে যাওয়া, আমি আমার গতিতে বলেই যাবো। এভাবে ধীরে ধীরে যবান চালু হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

পাশের তালিবে ইলম ভাইয়ের উচিত হবে না, আরবিতে কথা বলার সময় কোনো ধরনের ভুল-ত্রুটি ধরা। বরং একজন বলবে অপরজন শুধু শুনবে। এভাবে পরস্পর আরবিতে কথোপকথন করবে।

হ্যাঁ, কথোপকথন পর্ব শেষ হওয়ার পর বলা যেতে পারে বা ভাবা যেতে পারে যে, আজ কথোপকথনের ক্ষেত্রে এই ভুলগুলো হয়েছে। তার সঠিক রূপ কী হবে সে নিয়ে তামরিন করে ও পরস্পর মুজাকার করে শুধরে নিবে।

এই নিয়মে প্রতিদিন আরবিতে কথোপকথন অব্যাহত রাখলে অতি অল্প সময়েই আরবিতে কথন দক্ষতা অর্জিত হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

একটি সময় নির্ধারণ করা, যখন শুধু আরবিতে কথা বলা হবে

প্রতিদিন আরবিতে কথা বলার জন্য নির্দিষ্ট একটি সময় নির্ধারণ করা চাই। হোক তা সামান্য সময়। আসরের পর বা ইশার পর কিংবা ঘুমের আগে ১৫/২০/২৫/৩০ মিনিট দুজন দুজন করে দাঁড়িয়ে আরবিতে কথা বলবে। এই নির্দিষ্ট সময়টুকুতে বাংলায় কোনো কথা বলা যাবে না। ভুল হোক তবুও

আরবিতে কথা বলে যেতে হবে। দুজনে দাঁড়িয়ে আরবিতে কথা বলার সময় হাত নাড়িয়ে নাড়িয়ে স্বর কখনো উঁচু কখনো নিচু করে কথা বলবে। বাংলা ভাষায় দুজনে কথা বললে যেমনটা করে থাকি। এমন যেন না হয় যে, দুজনে দাঁড়িয়ে নিচের দিকে তাকিয়ে খুব আদবের সাথে একে অপরকে সবক শুনিয়ে দেয়ার মতো মুখস্ত মুকালামা শুনিয়ে দিলো।

এরপর একসময় দৃঢ় সংকল্প করতে হবে যে, একটা লম্বা সময় সবার সাথে আরবিতে কথা বলবে। যেমন, আসরের পর থেকে মাগরিব পর্যন্ত বা যোহরের পর থেকে আসর পর্যন্ত, কিংবা মাগরিবের পর থেকে ঘুমের আগ মুহূর্ত পর্যন্ত আরবিতে কথা বলবে। একটা সময় এমন হতে হবে যে, হিম্মত করতে হবে, আজ সারাদিন বাংলায় কোনো কথা বলব না। শুধু আরবি ভাষায় কথা বলব। এমনকি রাস্তাঘাটে চলাকালীন যার সাথে দেখা হবে তার সাথে আরবিতে কথা বলবে; যদিও সে আরবি না বুঝে। সে যেন এ কথা মনে করতে বাধ্য হয় যে, আপনি আরব দেশ থেকে বাংলাদেশে এসেছেন। একটা সময় পুরো এক সপ্তাহ আরবি ভাষায় কথা বলতে হবে। সেই সপ্তাহটির নাম দেয়া হবে " الأسبوع العربي" বা আরবি সপ্তাহ।

এভাবে নিয়মিত আরবিতে কথা বলা অব্যাহত রাখলে ধীরে ধীরে আরবিতে কথা বলতে অভ্যস্ত হয়ে যাবে। এক পর্যায়ে এমন হবে যে, মুখে বাংলার তুলনায় আরবি কথাই বেশি আসবে ইনশাআল্লাহ।

ক্ষুদ্র সময়গুলোকে কাজে লাগানো

আমরা ক্ষুদ্র সময়কে অবহেলা করে নষ্ট করে দিই। এই ছোট ছোট সময়কে কাজে লাগালে মনের অজান্তেই অনেক কাজ হয়ে যায়। যেমন, খাওয়া দাওয়ার সময়। এই সময়টাতে আমরা গল্পগুজব তো করিই। তো এই গল্পগুজবই যদি আরবিতে করা হয় তাহলে গল্পগুজবও হয় আরবিতে কথা বলাও হয়। এতে যবানটা চালু হয়।

মসজিদে যাওয়ার সময় আমরা কথাবার্তা বলতে বলতে যাই। তো এই কথাগুলো আমরা আরবিতে বলতে পারি। ঘুমের সময় ঘনিয়ে এলে বিছানা করতে করতে আমরা সাথী ভাইদের সাথে যখন কথা বলব তখন সেই

কথাগুলো আরবিতে বলব। এভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সময়গুলোকে কাজে লাগালে আমরা অনেক দূর এগিয়ে যেতে পারি।

আরবিতে কথা বলার জন্য সম্মিলিত প্রচেষ্টা জরুরি

ক্লাসের সকলে মিলে যদি এই নীতির উপর দৃঢ় সংকল্প করে যে, আমরা সকলে পরস্পরে সর্বদা আরবিতে কথা বলব। কেউ বাংলায় কথা বলব না। যদি কেউ বাংলায় কথা বলে তাহলে সে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সবার সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে, কিংবা সাবান দিয়ে মুখ ধুয়ে আসবে। এজাতীয় নিয়ম তৈরি করে আরবিতে কথা বলার পরিবেশ একবার কায়েম করতে পারলে তখন এমনিতেই আরবিতে কথা বলতে ইচ্ছে হবে।

দুঃখের ব্যাপার হলো, এই পরিবেশটা আমরা তৈরি করতে পারি না; বরং দুয়েকজন আরবিতে কথা বললে বাকিরা উপহাস করে, ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে। ফলে তাদের মাঝে সংকোচ তৈরি হয়। একসময় তারাও আরবিতে কথা বলা ছেড়ে দেয়। এভাবে ইনহিতাত নেমে আসে তালিবুল ইলমদের মাঝে। এজন্য আমি আরবিতে কথা বলি আর নাই বলি, কেউ বলতে চাইলে আমার দ্বারা যেন তার কোনো ক্ষতি না হয়।

তবে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, কেউ আরবিতে কথা বলুক আর নাই বলুক, আমি আরবিতে বলেই যাবো। কেউ ঠাট্টা-বিদ্রুপ করলে তার প্রতি কোনো ভ্রুক্ষেপ করব না। কারো কোনো কথায় কান দিব না। আমার কাজ আমি করেই যাব।

আরবিতে চিন্তা-ভাবনা

আমরা অনেক সময় বিভিন্ন বিষয়ে মনে মনে চিন্তা ভাবনা করে থাকি। সেই চিন্তা ভাবনাগুলো তো আরবিতেই করা যেতে পারে। প্রথমে হয়তো একটু কষ্ট হবে। অভ্যাস করে ফেললে তখন আর কষ্টকর মনে হবে না ইনশাআল্লাহ।

আরবিতে কথোপকথনের পূর্বে নিজে নিজে তামরিন করা

প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে আরবিতে কথোপকথনের পূর্বে যেই বিষয়ে কথা বলবে তা প্রথমে মনে মনে চিন্তা করবে। তারপর নিজে নিজে বলে তামরিন

করবে, তাহলে অপরের সাথে কথা বলার সময় ওই কথাগুলো দ্রুত মুখে চলে আসবে ইনশাআল্লাহ।

আরবি শব্দভাণ্ডার বৃদ্ধি করা

আরবিতে সাবলীল ভাবে কথা বলার জন্য প্রচুর পরিমাণ আরবি শব্দ মুখস্ত থাকতে হয়। কেননা যেকোনো ভাষায় কথা বলতে শব্দভাণ্ডার মুখস্ত করার বিকল্প নেই। প্রতিদিন পাঠ্য বইয়ে যেসকল নতুন নতুন শব্দ অতিবাহিত হয় সেগুলো তো অবশ্যই মুখস্ত করে নিতে হবে। এর পাশাপাশি আরবি শব্দ ভাণ্ডার বৃদ্ধির জন্য প্রতিদিন ৫/৬ টি করে নতুন শব্দ মুখস্ত করা এবং সেগুলো দিয়ে তামরিন করা এবং আরবিতে কথা বলার সময় সেগুলো প্রয়োগ করার চেষ্টা করা চাই। অনুরূপ প্রতিদিন কিছু কিছু আরবি তাবির মুখস্ত করা চাই এবং প্রচুর পরিমাণ মৌখিক তামরিন করে সেই তাবির আয়ত্ব করা চাই।

আরবি ভাষায় প্রশ্ন করা ও উত্তর দেয়ার দক্ষতা অর্জন করা

আরবি ভাষায় প্রশ্ন করার জন্য আরবি ভাষায় যতগুলো أدوات الاستفهام ব্যবহৃত হয় সেগুলো ব্যবহার করে ব্যাপক তামরিনের মাধ্যমে প্রশ্ন ও উত্তর দেয়ার দক্ষতা অর্জন করা। أدوات الاستفهام ব্যবহার করা ও সেগুলো ব্যবহার করে কৃত প্রশ্নের উত্তর দেয়ার দক্ষতা অর্জন করার পর আশা করা যায় আরবি ভাষায় কথা বলার ক্ষেত্রে পদ্ধতিগত কোনো সমস্যা থাকবে না ইনশাআল্লাহ।

জেনে রাখা উচিত, আরবি ভাষার الاستفهام এর অব্যয়গুলো দু'ধরনের। যুক্ত ও বিযুক্ত। বিযুক্ত মানে যা যুক্ত নয়। অর্থাৎ প্রশ্নবোধক অব্যয়টি অন্য শব্দ থেকে পৃথক। আর যুক্ত মানে হলো যা অন্য শব্দের সাথে মিলিত।

বিযুক্ত أدوات الاستفهام এর উদাহরণ হলো, أ- هل- أيّ-كم-كيف- أين-مِن-ما

আর যুক্ত أدوات الاستفهام এর উদাহরণ হলো-

لِمَ - কেন?

لِمَن – কার জন্য?

من أين – কোথা থেকে?

إلى من – কার কাছে?

بِكَم – কত দিয়ে? কতোতে?

إلى أين – কোথায়?

مع من – কার সাথে?

في كم يوما – কতো দিনে?

প্রতি সপ্তাহে একটি আরবি বক্তৃতা প্রদান করা

নিজের তত্ত্বাবধায়ক উসতাদের পরামর্শ অনুযায়ী প্রতি সপ্তাহে আরবি বক্তৃতার আয়োজন করা। তাতে প্রত্যেক তালিবুল ইলম আরবিতে বক্তৃতা প্রদান করবে। এখানে একটি কথা মনে রাখতে হবে যে, কোনো বক্তৃতার বই থেকে আরবি বক্তৃতা মুখস্ত করে বক্তৃতার মঞ্চে উঠে তা শুনিয়ে দেয়া যথেষ্ঠ নয়; বরং নিজে নিজেই আরবি বক্তৃতা তৈরি করবে এবং তা খাতায় লিখবে। তারপর তা প্রথমে নিজে সম্পাদনা করবে। অতঃপর উসতাদকে দেখিয়ে তাসহিহ করে বারবার পড়বে, যাতে প্রায় মুখস্ত হয়ে যায় এবং বলার সময় সেই বাক্য ও শব্দ চলে আসে। এমনভাবে বক্তৃতা প্রদান করবে যে, যেন নিজে থেকে বানিয়ে বানিয়ে তাৎক্ষণিক আরবিতে বক্তৃতা প্রদান করছে। এমন যেন না হয় যে, একটি বক্তৃতা হুবহু মুখস্ত করে সবার সামনে কবিতার মতো মুখস্ত শুনিয়ে দিলাম। এতে তেমন ফায়দা হবে না। না লেখার ক্ষেত্রে, না বলার ক্ষেত্রে। হ্যাঁ, বক্তৃতা লেখার সময় কোনো বক্তৃতার বই থেকে প্রয়োজনীয় সহায়তা নেয়া যেতে পারে এবং মানসম্মত কিছু আদর্শ বক্তৃতা মুখস্ত করে নেয়া ভালো। যাতে নিজে বক্তৃতা লেখার ক্ষেত্রে তা থেকে উপকৃত হতে পারে।

আরবিতে বিতর্ক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা

বাংলা ভাষায় যেমনিভাবে আমরা মুনাজারা বা বিতর্ক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকি; তদ্রূপ আরবি ভাষায়ও বিতর্ক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা যেতে

পারে। এটি অন্তত প্রতি মাসে একবার বা দুই মাস অন্তর অন্তর একবার হতে পারে। আগে থেকেই দুই গ্রুপ প্রস্তুতি নিয়ে থাকবে। মুনাজারা বা বক্তৃতা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হওয়ার এক সপ্তাহ আগেই বিষয়বস্তু সম্পর্কে উভয় গ্রুপকে অবহিত করা হবে। এক সপ্তাহ মেহনত করে লিখিতভাবে মুনাজারা প্রস্তুত করবে এবং মুনাজারার সময় তা পেশ করবে। এ মুনাজারা দীর্ঘ সময়ব্যাপী হতে হবে। নির্দিষ্ট সময় বাধা থাকবে না। যার যত ইচ্ছে আরবিতে উন্মুক্তভাবে বলে যাবে। কারণ এখানে মূল লক্ষ্য হলো, আরবিতে সাবলীলভাবে কথা বলার দক্ষতা অর্জন করা। আর এই মুনাজারায় নির্দিষ্ট কিছু তালিবুল ইলম অংশগ্রহণ করবে না; বরং প্রত্যেককেই সাধ্য অনুযায়ী বলতে হবে এবং বলার সুযোগ দিতে হবে। আর এই মুনাজারা অবশ্যই উসতাদের তত্ত্বাবধানে হতে হবে।

এভাবে এক বছরে যদি পাঁচ/সাতটি মুনাজারা হয় তাহলে ছাত্রদের আরবি বলার দক্ষতা অনেক গুণ বৃদ্ধি পাবে ইনশাআল্লাহ।

আরবি কথোপকথন ও আরবি বক্তৃতা আরবীয় লাহজা বা আরবীয় বাচনভঙ্গিতে করার চেষ্টা করা

আরবি কথোপকথন ও আরবি বক্তৃতা প্রদান করার সময় আরবীয় লাহজা বা আরবীয় বাচনভঙ্গিতে করার চেষ্টা করতে হবে। প্রত্যেক ভাষার নিজস্ব একটি লাহজা বা বাচনভঙ্গি থাকে। যেই ভাষায় কথা বলবে কথা বলার সময় সেই ভাষার বাচনভঙ্গিও অনুসরণ করতে হয়। তাতে ভাষা অনেক সুন্দর শোনা যায়। নতুবা তা শ্রুতিকটু হবে। যেমন কোনো আমেরিকান ব্যক্তি যদি বাংলা ভাষায় কথা বলে আমেরিকান ভাষার লাহজা বা বাচনভঙ্গিতে তাহলে তার কথা শুনতে বিশ্রি শোনা যাবে। তার কথা শুনে বাংলাদেশী মানুষ হাসবে। তদ্রুপ আরবি ভাষারও নিজস্ব একটি লাহজা বা বাচনভঙ্গি আছে। আরবিতে কথা বলার সময় সেই লাহজা বা বাচনভঙ্গি অনুসরণ করতে হবে। এখন যদি কেউ আরবি ভাষা শিখে। কিন্তু আরবিতে কথা বলার সময় আরবের বাচনভঙ্গি অনুসরণ না করে তাহলে তার কথা শুনতে আরবদের নিকট খারাপ লাগবে। যদিও সে তার কথায় উচ্চাঙ্গের শব্দ ও বাক্য ব্যবহার করে থাকে।

দাওয়াত ও তাবলিগ জামাতে আগত আরব মেহমানদের সাথে কথা বলার সুযোগকে কাজে লাগানো

দাওয়াত ও তাবলিগের উদ্দেশ্যে অনেক সময় বাংলাদেশে আরব মেহমান আগমন করেন। তাদের মধ্যে শুদ্ধ ভাষায় কথোপকথনকারীও অনেক আরব থাকেন। তাদের সাথে কথা বলার সুযোগ হলে সে সুযোগ কিছুতেই হাতছাড়া করা উচিত নয়। কেননা যেকোনো ভাষা যদি আহলে লিসান ভাষাবিদ থেকে শেখা হয় তাহলে তা যথাযথ ও নির্ভুলভাবে শেখা হয় এবং খুব সহজে ও তাড়াতাড়ি শেখা যায় এবং শব্দ ও বাক্য ব্যবহারের সঠিক ক্ষেত্র জানা যায়। আমাদের সবার তো সব সময় আরবদের সোহবত ও সাহচর্য পাওয়ার সুযোগ হয়ে উঠে না। তাই আরব মেহমান যখন দাওয়াত ও তাবলিগের উদ্দেশ্যে আমাদের দেশে আগমন করেন তখন সেই সুযোগটাকে গনিমত মনে করা চাই। যতটুকু সম্ভব তাদের সাহচর্যে থেকে তাদের সাথে আরবি ভাষায় কথা বলা ও সাধ্য অনুযায়ী তাদের থেকে আরবি ভাষা সংক্রান্ত ইস্তিফাদা করা চাই।

দীর্ঘ সময় না হোক অন্তত দুয়েক দিন বা কয়েক ঘণ্টা যদি আরবদের সাথে কথা বলতে পারি ও তাদের থেকে কিছু ইস্তিফাদা করতে পারি তবুও তো আহলে লিসান থেকে কিছুটা আরবি ভাষা শেখা হলো।

যদি কারো সম্ভব হয় শুদ্ধ কথোপকথনকারী আরব জামাতের সাথে এক চিল্লা লাগালে অনেক উপকার হবে। তা সম্ভব না হলে বিশ্ব ইজতেমায় তো প্রতি বছরই যাওয়া হয়, সেখানে অনেক আরব জামাত আগমন করে থাকেন। তো বিশ্ব ইজতেমায় যে তিন দিন অতিবাহিত হয় সেই দিনগুলিতে আরবদের সাথে প্রচুর কথোপকথন করার চেষ্টা করা কাম্য।

হৃদয়ে আরবি ভাষার গভীর প্রেম থাকলে অবস্থা এমন হবে যে, শুধুমাত্র আহলে লিসান থেকে আরবি ভাষা শেখার জন্য রমজান মাসটা সৌদি আরবে গিয়ে কাটাবে। এতে উমরা পালনও হবে। আবার আহলে লিসান থেকে আরবি ভাষা শেখার কাজও হবে। আল্লাহ সকলকে এমন সৌভাগ্য দান করুন। আমিন।

এখানে আরেকটি কথা মনে রাখতে হবে যে, আমাদের দেশে যেমন আঞ্চলিক ভাষা আছে ঠিক তেমনি আরব দেশেও আঞ্চলিক ভাষা আছে। তো যেসকল আরব আঞ্চলিক আরবি ভাষায় কথা বলেন তাদের থেকে কিন্তু

আঞ্চলিক ভাষা গ্রহণ করা যাবে না; তাহলে উপকারের পরিবর্তে ক্ষতি হয়ে যাবে। কারণ একবার যবানে ভুল ও আঞ্চলিক ভাষা জারি হয়ে গেলে তা দূর করা কঠিন। যেমন আমাদের দেশে অনেক শিক্ষিত মানুষ আছেন, যারা বিশুদ্ধ ভাষা জানা সত্ত্বেও অশুদ্ধ ও আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলে থাকেন। অনেক সময় তারা শুদ্ধ ভাষায় কথা বলার চেষ্টা করলেও মনের অজান্তে যবানে আঞ্চলিক ভাষাই এসে পড়ে। এর কারণ হলো, তারা আঞ্চলিক ভাষায়ই কথা বলতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন। ফলে কোন শব্দটি আঞ্চলিক, কোনটা শুদ্ধ তা জানা সত্ত্বেও বারবার ভুলটাই মুখে চলে আসে। তদ্রূপ অনেক আরব এমনও আছেন যারা ফাসিহ ভাষা জানা সত্ত্বেও আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলতে অভ্যস্ত। তাদের থেকে আমরা আঞ্চলিক ভাষা কখনো শিখব না।

আরবি ভাষার কিছু আদর্শ মুকালামা মনোযোগ সহকারে পড়া ও আয়ত্ত করা

আরবি ভাষায় লিখিত মুকালামার কিতাব থেকে বিভিন্ন বিষয়ে আদর্শ কিছু মুকালামা মনোযোগ সহকারে পড়া ও আয়ত্ত করা। তাতে আরবি কথোপকথনে ব্যবহৃত বিশেষ শব্দাবলি ও বাচনভঙ্গি যেমন সহজে জানা যায়, তদ্রূপ অনুকরণযোগ্য প্রয়োজনীয় অনেক বাক্য-কাঠামো সম্পর্কেও অবগত হওয়া যায়। সেগুলো নিজের কথোপকথনে ব্যবহার করলে কথোপকথন আরো সুন্দর ও মানসম্মত হবে।

প্রতিদিন কিছু কিছু আরবদের বয়ান শ্রবণ করা এবং তা অনুকরণ করার চেষ্টা করা

প্রতিদিন কিছু সময় ফাসিহ আরবদের আদর্শ আরবি কথা, কথোপকথন, বক্তৃতা, বিতর্ক, আবৃত্তি, সংবাদপাঠ ইত্যাদি শ্রবণ করা উচিত। আরবদের আরবি কথাগুলো অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করতে হবে। কোন শব্দ কীভাবে উচ্চারণ করছে, কোন কোন জায়গায় থামছে, কোথায় আওয়াজ উঁচু করছে, কোথায় নিচু করছে ইত্যাদি বিষয় ভালোভাবে খেয়াল করবে।

আরবদের বয়ান বা কথা শ্রবণের অন্যতম লক্ষ্য হলো, تعلم التلفظ الصحيح بالكلمات والحروف العربية وأداؤها من مخارجها অর্থাৎ আরবি শব্দাবলি ও হরফসমূহের সঠিক উচ্চারণ করা এবং হরফসমূহকে মাখরাজ

থেকে কীভাবে আদায় করতে হয় তা শেখা। এই বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব দেয়া অত্যন্ত জরুরি। কেননা, আরবি ভাষার অনেক হরফের আওয়াজ এক রকম। কিন্তু সেগুলোর মাখরাজ ভিন্ন। ফলে আরবি হরফগুলোকে সঠিকভাবে উচ্চারণ করার প্রতি মনোযোগী না হলে সেগুলো দুর্বোধ্য হয়ে যায়। সেগুলোকে ভালোভাবে পৃথক করা যায় না। শ্রোতা সেগুলোর মধ্যকার পার্থক্য অনুধাবন করতে সক্ষম হয় না। শ্রোতার সামনে বিষয় দুর্বোধ্য হয়ে যায়। ফলে অনেক সময় শ্রোতা উদ্দিষ্ট অর্থ না বুঝে অন্য কোনো অর্থ বুঝে।

উদাহরণস্বরূপ কিছু শব্দ দেখুন,

ضرب وجرب، المسير والمصير، الصيف والسيف، الضليل والظليل، التَّلُّ والطَّلُّ، التوق والطوق، الأريب والعريب

উপরোল্লিখিত শব্দগুলোকে যদি সঠিকভাবে উচ্চারণ না করা হয়, তাহলে সেগুলোর যে পার্থক্য রয়েছে তা কিন্তু বোঝা যাবে না। কেউ যদি এই শব্দগুলোকে ভুল উচ্চারণ করে, তাহলে শ্রোতা অর্থ বুঝতে ভুল করবে এটাই স্বাভাবিক।

হজরত মাওলানা ওহীদুজ্জামান কিরানভী রহ. (১৩৪৮-১৪১৫হি./১৯৩০-১৯৯৫ঈ.), যিনি

القراءة الواضحة، القاموس الاصطلاحي، القاموس المحيط، القاموس الوحيد، نفحة الأدب

ইত্যাদি কিতাবের লেখক এবং সমকালীন ভারতবর্ষে ব্যবহারিক আরবি ভাষার যে নবজাগরণ শুরু হয়েছে, তার প্রাণপুরুষ ছিলেন। তিনি দারুল উলুম দেওবন্দের আরবি ভাষা ও সাহিত্য এবং হাদিস শরিফের উসতাদ ছিলেন এবং দারুল উলুম দেওবেন্দর এক সময়ের নায়েবে মুহতামিম ছিলেন। তিনি বলতেন, "তুমি যদি চাও যে, তোমার পড়া ঠিকভাবে বুঝা হোক, তাহলে ঠিকভাবে পড়ো। তদ্রূপ তুমি যদি চাও যে, তোমার লেখা সঠিকভাবে পড়া হোক, তাহলে সঠিকভাবে লেখো। তুমি যেমন করবে, তোমার সঙ্গে তেমন আচরণ করা হবে।" (আরবি ভাষা পাঠদান পদ্ধতি, পৃ: ২৭)

শ্রবণের আরেকটি লক্ষ্য হলো, আরবদের বাচনভঙ্গি শেখা। আরবদের বাচনভঙ্গি শুনতে কানে বড়ো মধুর লাগে। আমাদের উচিত আরবি কথা বলার সময় আরবদের বাচনভঙ্গিতে কথা বলার চেষ্টা করা। প্রতিটি ভাষারই নিজস্ব একটি বাচনভঙ্গি আছে। ওই ভাষায় কথা বলতে হলে সেই ভাষার বাচনভঙ্গিতেই কথা বলতে হয়। পক্ষান্তরে যদি অন্য বাচনভঙ্গিতে কথা বলে তাহলে তা শুনতে শ্রুতিকটু লাগবে। তদ্রূপ আরবি ভাষারও নিজস্ব একটি বাচনভঙ্গি আছে। তাই আরবি ভাষায় কথা বলার সময় সেই বাচনভঙ্গির প্রতি গুরুত্বারোপ করা উচিত। এই বাচনভঙ্গি কখনো বই পড়ে শেখা যায় না। বরং বাচনভঙ্গি শিখতে হয় বিশুদ্ধ ভাষাবিদদের মুখ থেকে কথা বা আলোচনা শোনার দ্বারা। অতএব, আমাদের আরবদের আরবি বক্তৃতা, কথোপকথন, বিতর্ক ইত্যাদি শোনা উচিত এবং তারা কোন শব্দ কীভাবে উচ্চারণ করেন তা ভালোভাবে খেয়াল করা ও আরবি ভাষায় কথা বলার সময় তা অনুসরণ করা।

শ্রবণের আরো একটি উদ্দেশ্য হলো, نبرات الصوت তথা ধ্বনি-তরঙ্গ বা আওয়াজের ঢেউ লক্ষ্য করা। বক্তা কখন আওয়াজ উঁচু করছেন, কখন নিচু করছেন, কখন কোমল আওয়াজে আর কখন কঠিন আওয়াজে কথা বলছেন তা বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

অর্থ ও ভাবের প্রতি লক্ষ্য রেখে আওয়াজ উঁচু-নিচু ও শক্ত-কোমল করার বিষয়টি ভালোভাবে খেয়াল করা উচিত। অর্থাৎ হৃদয়ে যে ভাব ও আবেগ থাকে তা কথা বলার সময় যেন উচ্চারণে প্রকাশ পায়।

কালাম মানসম্মত ও সুন্দর হওয়ার জন্য কিছু করণীয়

আরবিতে কথাবার্তা, বক্তৃতা ইত্যাদি মানসম্মত ও সুন্দর হওয়ার জন্য কিছু বিষয় অনুসরণ করা জরুরি। নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো:

- **সঠিক মাখরাজ থেকে হরফ সঠিকভাবে উচ্চারণ করা।**

এটি একটি গরুত্বপূর্ণ দক্ষতা। কারণ হরফের উচ্চারণ সঠিক না হলে সঠিক অর্থও বোঝা যায় না। যেমন, ذهاب ও زهاب শব্দদ্বয়ের প্রথম শব্দ নিকট স্থান থেকে দূরবর্তী স্থানে চলে যাওয়া অর্থে ব্যবহৃত হয়। দ্বিতীয় শব্দ আসবাবপত্র বহন করা অর্থে ব্যবহৃত হয়। অনুরূপ حرث ও حرس এবং ثمن ও سمن শব্দাবলি।

- **নির্দিষ্টভাবে বাক্যকে সাজানো।**

যেভাবে বাক্যকে সাজালে বক্তা ও শ্রোতা উভয়ের লক্ষ্যকে সমানভাবে বাস্তবায়ন করবে এমনভাবে বাক্যকে সাজানো। বক্তা অবশ্য তার চিন্তা-চেতনাকে সাজিয়ে গুছিয়ে দক্ষতার সাথে পেশ করবে। যাতে তার উপস্থাপিত বিষয় কঠিন থেকে সহজতর হয় এবং অস্পষ্ট থাকলে স্পষ্ট হয়। তবে তা নিয়মমাফিক হওয়া চাই। বক্তা যদি এরূপ পদ্ধতি পালন না করে তাহলে শ্রোতাদের বোঝানো এবং তাদের কাছে যা পৌঁছাতে চায় তা পৌঁছাতে সক্ষম হবে না।

- **চিন্তার ধারাবাহিকতা ও প্রাসঙ্গিকতার প্রতি লক্ষ্য রাখা।**

কথা বলার সময় চিন্তার ধারাবাহিকতা ও প্রাসঙ্গিকতার প্রতি লক্ষ্য রাখলে শ্রোতা বিষয়বস্তুকে ধীরে ধীরে বুঝতে সক্ষম হবে। ফলে বক্তাকে মৌলিক বিষয় থেকে বের হয়ে শাখা-প্রশাখার দিকে ধাবিত হতে হবে না এবং মূল বিষয়বস্তুও আলোচনা শোনা থেকে শ্রোতাদের বঞ্চিত করবে না। এক কথায়, তার কথা প্রাণবন্ত ও ব্যতিক্রমধর্মী হবে।

- **শব্দগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করা।**

শব্দকে মনে করা হয় অর্থের কাঠামো। কখনো কখনো একটি শব্দ বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে। যেমন,عين শব্দের অর্থ হলো, চোখ, ঝরনা, গুপ্তচর এবং শহরের নাম। অনুরূপভাবে مغرب শব্দ। এর অর্থ মাগরিবের নামাজের ওয়াক্ত, অস্ত যাওয়ার সময় এবং আফ্রিকা মহাদেশের একটি অঞ্চলের নাম।

- **শ্রোতাদের মনোযোগ আকর্ষণ করার ক্ষমতা থাকা।**

বক্তা শ্রোতাদের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে কথা বলবে। তাদের অবস্থা অনুযায়ী দ্রুত, আস্তে, সংক্ষেপে ও দীর্ঘ আলোচনা করবে বা সাম্যতা বজায় রাখতে চেষ্টা করবে।

- **উপস্থাপনে সৌন্দর্য বজায় রাখা।**

বক্তার উপস্থাপনে ধ্বনির সুরে থাকবে শ্রেণিবিন্যাস ও কথার মধ্যে থাকবে আকর্ষণ। বিস্ময় মিশ্রিত স্থানগুলোতে শ্রোতাকে সতর্ক করা ও প্রশ্ন করা থাকবে।

দুই বাক্যের মাঝে নতুন বাক্য আনা, প্রার্থনামূলক বাক্যের ব্যবহার করা ইত্যাদি। বক্তা অর্থকে ধ্বনি এবং ইঙ্গিতের মাধ্যমে অভিনয় করে বুঝিয়ে দিবে।

- **শ্রোতাদের মানসিক অবস্থার দিকে লক্ষ্য রাখা।**

বক্তার উচিত শ্রোতাদের মানসিক অবস্থার দিকে লক্ষ্য রাখা এবং তার বক্তৃতায় তাদের মনে যেন বিরক্তির উদ্রেগ না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা। সে যা বলবে তা সুন্দরভাবে উপস্থাপন করবে। তাহলে তা শ্রোতার হৃদয়ে আগ্রহ সৃষ্টি করবে। তার বক্তৃতার মধ্যে যথার্থ বিরাম চিহ্ন হরকত এবং আনুষঙ্গিক উপকরণের ব্যবহার হওয়া চাই।

- **কথাকে উপযুক্ত ক্ষেত্র অনুযায়ী চয়ন করা।**

বক্তার উচিত শ্রোতাদের অবস্থা অনুযায়ী তাদের বয়স, লিঙ্গ, মান ও ধারণ ক্ষমতার প্রতি লক্ষ রাখা, যাতে কথাকে উপযুক্ত ক্ষেত্র অনুযায়ী নির্বাচন করা যায়।[১]

মুকালামার কিতাব থেকে ইস্তিফাদাহ করার পদ্ধতি

আরবি মুকালামা বিষয়ে লিখিত কিতাব মুতালাআ আরবি কথোপকথন শেখার ক্ষেত্রে অনেক উপকারী। তবে কেবল মুকালামার কিতাব মুতালাআ করলেই বা মুকালামা মুখস্ত করাই যথেষ্ট নয়। বরং আরবিতে কথা বলা আবশ্যক। মুকালামার কিতাব থেকে এতটুকু উপকারিতা অর্জন করা যেতে পারে যে, কোন শব্দ কোথায় ব্যবহার করতে হয় এবং কোন ভাব ও মর্মের জন্য কোন তাবির ব্যবহৃত হয় তা ভালোভাবে আত্মস্থ করা। প্রয়োজনে দৈনন্দিন ব্যবহৃত হয় এমন কিছু জরুরি মুকালামা মুখস্ত করে আরবিতে কথা বলার সময় তা দ্বারা তামরিন করা।

পরস্পর আরবিতে কথা বলার সময় মুকালামার কোনো কিতাব সামনে রাখার প্রয়োজন নেই; বরং কথা বলার আগে বা পরে মুকালামার কিতাব থেকে ইসতিফাদা করা যেতে পারে। কথা বলার সময় নিজ থেকে আরবিতে কথা বলে যেতে হবে।

---

(১) আরবি ভাষায় দক্ষতা ও শিক্ষাদান পদ্ধতি, প্রফেসর ড. মোহাম্মদ ইউসুফ, পৃ: ৭৯-৮১

আরবি কথোপকথন বিষয়ে লিখিত কিছু কিতাব ও তার বৈশিষ্ট্যসমূহ

আরবি কথোপকথন বিষয়ে অনেক কিতাব রচিত হয়েছে। এখানে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ও নির্ভরযোগ্য উপকারী কিতাবের নাম উল্লেখ করা হলো।

১. دروس اللغة العربية الوظيفية। এটি রচনা করেছেন কয়েকজন বিদগ্ধ গবেষক আলেমে দ্বীন। তাঁরা হলেন: প্রফেসর ডক্টর শফিক আহমাদ খান নাদাবি। ডক্টর হাবিবুল্লাহ খান। ডক্টর ফারহানা তায়্যিব সিদ্দিকী। কিতাবটি প্রকাশ করেছে আল মাজলিসুল কওমি লিতারবিজিল লুগাতিল উরদিয়্যাহ, নিউ দিল্লী।

কিতাবটি অত্যন্ত উপকারী। তাতে বিষয় ভিত্তিক সুন্দর সুন্দর মুকালামা লেখা হয়েছে। প্রতিটি মুকালামার শেষে প্রচুর পরিমাণ তাদরিবাত রয়েছে। কোনো তালিবুল ইলম যদি মনোযোগ সহকারে এই কিতাবটি অধ্যয়ন করে এবং তাদরিবাতগুলো যথাযথভাবে আদায় করে তাহলে তার আরবি কথোপকথন অনেক মানসম্মত হবে বলে আশা করি।

২. العربية بين يديك। এটি মূলত একটি সিরিজ সংকলন। অনারবীদের জন্য এটি লেখা হয়েছে। 'আল আরাবিয়্যাহ লিল জামি' নামক একটি সংগঠন এই কিতাবটি সংকলন করেছে। এটি সৌদি আরবের একটি সংস্থা। এটি নির্দিষ্ট কোনো বয়সের শিক্ষার্থীদেরকে লক্ষ্য করে সংকলন করা হয় নি; বরং আরবদেশগুলোতে অবস্থান গ্রহণকারী অনারবরা এই গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য। গ্রন্থটির ভলিউম সংখ্যা ১২।

৩. المؤطا في العربية الوظيفية। এটির রচয়িতা হলেন আরবি সাহিত্যের জগতে উজ্জ্বল নক্ষত্র মাওলানা সফিউল্লাহ ফুআদ হাফিজাহুল্লাহ। কিতাবটি প্রকাশিত হয়েছে মাকতাবাতুত তাকওয়া বাংলাবাজার, ঢাকা থেকে। এটিও دروس اللغة العربية الوظيفية কিতাবের আলোকে লিখিত হয়েছে। এটির বিশেষ বৈশিষ্ট হলো, সুন্দর সুন্দর আরবি তাবির ও বাক্যের কাওয়ালিব অনুসরণ করে একাধিক বাক্য গঠনের নমুনা পেশ করা

হয়েছে। এবং প্রত্যেক মুহাদাছার শেষে জটিল শব্দের অর্থ উল্লেখ করা হয়েছে।

৪. আরবি কথোপকথন। লিখেছেন ডক্টর নুরুল হক। কিতাবটিতে বিষয়ভিত্তিক সহজ সরল ভাষায় ছোট আকারে আরবি মুকালামা স্থান পেয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের জন্য উপযোগী। প্রতিটি মুকালামার শেষে কঠিন শব্দের অর্থ লিখে দেয়া হয়েছে।

৫. আরবি ইলমি কথোপকথন/مكالمة عربية علمية। কিতাবটি রচনা করেছেন মাওলানা আবদুল হালীম নোমানী আযহারী হাফি.। প্রকাশিত হয়েছে মাকতাবাতুল আফনান থেকে। বেশ উপকারী কিতাব। প্রতিটি মুকালামা বিষয়ভিত্তিক ও ছোট। ভাষা অত্যন্ত সহজ সরল ও প্রাঞ্জল। প্রত্যেক মুহাদাছার শেষে কঠিন শব্দের অর্থ লিখে দেয়া হয়েছে।

৬. এসো আরবিতে কথা বলি। মাওলানা আবদুল্লাহ আল ফারুক হাফি. কর্তৃক অনূদিত। প্রকাশিত হয়েছে মাকতাবাতুদ দাওয়াহ, উত্তরা, ঢাকা থেকে। এটি বাচ্চাদের উপযোগী করে লেখা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়



مهارة الاستماع বা শ্রবণ দক্ষতা

শ্রবণ দক্ষতার গুরুত্ব

যেকোনো ভাষা দক্ষতার প্রথম স্তর হলো শ্রবণ দক্ষতা। একজন শিশুর ভূমিষ্ট হওয়ার পর দর্শন ও শ্রবণের সাহায্যে ভাষাজ্ঞান অর্জন প্রক্রিয়ার সূত্রপাত ঘটে। শ্রবণের উপর শিশুর কথন নির্ভর করে। কোনো শিশু যদি শুনতে না পারে তাহলে তার কথন দক্ষতা বিকশিত হবে না। বোবা ব্যক্তিদের কথা বলতে অক্ষম হওয়ার কারণ তারা শুনতে পায় না। কেননা যারা বোবা তারা বধিরও। কোনো মানুষ যদি বধির না হয়, তার শ্রবণশক্তি যদি সচল হয় এবং সে মানুষের কথা শোনে তাহলে তার ওই ভাষা শেখা হবেই।

অপরদিকে কথন দক্ষতার উপর পঠন ও লিখন দক্ষতা নির্ভরশীল। তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে, মানব শিশুর ভাষা বিকাশের একদম ভিত্তিতে রয়েছে শ্রবণ দক্ষতা।

আমাদের দেশের অনেক সাধারণ মানুষ সৌদি আরবে যায়, যারা আরবি তো দূরের কথা বাংলা লেখাও দেখে পড়তে পারে না। তারা সৌদি আরবে গিয়ে অল্প কিছু দিনের মধ্যেই কথা বলার মতো আরবি ভাষা শিখে ফেলে। তারা কিন্তু কোনো ভাষা ইনস্টিটিউটে ভর্তি হয়ে ভাষা শিখে না; বরং আরবদের থেকে শুনে শুনে ভাষা শিখে ফেলে। এ থেকেই শ্রবণের গুরুত্ব বোঝা যায়।

مهارة الاستماع বা শ্রবণ দক্ষতার লক্ষ্য

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, আরবদের বয়ান বা কথা শ্রবণের অন্যতম লক্ষ্য হলো, تعلم التلفظ الصحيح بالكلمات والحروف العربية وأداؤها من مخارجها অর্থাৎ আরবি শব্দাবলি ও হরফসমূহের সঠিক উচ্চারণ করা এবং হরফসমূহকে মাখরাজ থেকে কীভাবে আদায় করতে হয় তা শেখা। এবিষয়ের প্রতি অত্যন্ত

গুরুত্ব দেয়া জরুরি। কেননা, আরবি ভাষার অনেক হরফের আওয়াজ এক রকম। কিন্তু সেগুলোর মাখরাজ ভিন্ন। ফলে আরবি হরফগুলোকে সঠিকভাবে উচ্চারণ করার প্রতি মনোযোগী না হলে সেগুলো দুর্বোধ্য হয়ে যায়। সেগুলোকে ভালোভাবে পৃথক করা যায় না। শ্রোতা সেগুলোর মধ্যকার পার্থক্য অনুধাবন করতে সক্ষম হয় না। শ্রোতার সামনে বিষয় দুর্বোধ্য হয়ে যায়। ফলে অনেক সময় শ্রোতা উদ্দিষ্ট অর্থ না বুঝে অন্য কোনো অর্থ বুঝে।

উদারহরণস্বরূপ কিছু শব্দ দেখুন,

ضرب وجرب، المسير والمصير، الصيف والسيف، الضليل والظليل، التَّلُّ والظَّلُّ، التوق والطوق، الأريب والعريب

উপরোল্লিখিত শব্দগুলোকে যদি সঠিকভাবে উচ্চারণ না করা হয়, তাহলে সেগুলোর যে পার্থক্য রয়েছে তা কিন্তু বোঝা যাবে না। কেউ যদি এই শব্দগুলোকে ভুল উচ্চারণ করে, তাহলে শ্রোতা অর্থ বুঝতে ভুল করবে এটাই স্বাভাবিক।

হজরত মাওলানা ওহীদুজ্জামান কিরানভী রহ. (১৩৪৮-১৪১৫হি./১৯৩০-১৯৯৫ঈ.), যিনি

القراءة الواضحة، القموس الاصطلاحي، القاموس المحيط، القاموس الوحيد، نفحة الأدب

ইত্যাদি কিতাবের লেখক এবং সমকালীন ভারতবর্ষে ব্যবহারিক আরবি ভাষার যে নবজাগরণ শুরু হয়েছে, তার প্রাণপুরুষ ছিলেন। তিনি দারুল উলুম দেওবন্দের আরবি ভাষা ও সাহিত্য এবং হাদিস শরিফের উসতাদ ছিলেন, এবং দারুল দেওবেন্দর এক সময়ের নায়েবে মুহতামিম ছিলেন। তিনি বলতেন, “তুমি যদি চাও যে, তোমার পড়া ঠিকভাবে বুঝা হোক, তাহলে ঠিকভাবে পড়ো। তদ্রুপ তুমি যদি চাও যে, তোমার লেখা সঠিকভাবে পড়া হোক, তাহলে সঠিকভাবে লেখো। তুমি যেমন করবে, তোমার সঙ্গে তেমন আচরণ করা হবে।”[১]

---

(১) আরবি ভাষা পাঠদান পদ্ধতি: মাওলানা সফিউল্লাহ ফুআদ, পৃ: ২৭

শ্রবণের আরেকটি লক্ষ্য হলো, আরবদের বাচনভঙ্গি শেখা। আরবদের বাচনভঙ্গি শুনতে কানে বড়ো মধুর লাগে। আমাদের উচিত, আরবি কথা বলার সময় আরবদের বাচনভঙ্গিতে কথা বলার চেষ্টা করা। প্রতিটি ভাষারই নিজস্ব একটি বাচনভঙ্গি আছে। ওই ভাষায় কথা বলতে হলে সেই ভাষার বাচনভঙ্গিতেই কথা বলতে হয়। পক্ষান্তরে যদি অন্য বাচনভঙ্গিতে কথা বলে তাহলে তা শুনতে শ্রুতিকটু লাগবে। তদ্রূপ আরবি ভাষারও নিজস্ব একটি বাচনভঙ্গি আছে। তাই আরবি ভাষায় কথা বলার সময় সেই বাচনভঙ্গির প্রতি গুরুত্বারোপ করা উচিত। এই বাচনভঙ্গি কখনো বই পড়ে শেখা যায় না। বরং বাচনভঙ্গি শিখতে হয় বিশুদ্ধ ভাষাবিদদের মুখ থেকে কথা বা আলোচনা শোনার দ্বারা। অতএব, আমাদের আরবদের আরবি বক্তৃতা, কথোপকথন, বিতর্ক ইত্যাদি শোনা উচিত এবং তারা কোন শব্দ কীভাবে উচ্চারণ করে তা ভালোভাবে খেয়াল করা ও আরবি ভাষায় কথা বলার সময় তা অনুসরণ করা উচিত।

শ্রবণের আরো একটি উদ্দেশ্য হলো, نبرات الصوت তথা ধ্বনি-তরঙ্গ বা আওয়াজের ঢেউ লক্ষ্য করা। বক্তা কখন আওয়াজ উঁচু করছেন, কখন নিচু করছেন, কখন কোমল আওয়াজে আর কখন কঠিন আওয়াজে কথা বলছেন তা বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

অর্থ ও ভাবের প্রতি লক্ষ্য রেখে আওয়াজ উঁচু-নিচু ও শক্ত-কোমল করার বিষয়টি ভালোভাবে খেয়াল করা উচিত। অর্থাৎ হৃদয়ে যে ভাব ও আবেগ থাকে তা কথা বলার সময় যেন উচ্চারণে প্রকাশ পায়।

কী শ্রবণ করব?

প্রতিদিন কিছু সময় ফাসিহ আরবদের আদর্শ আরবি কথা, কথোপকথন, বক্তৃতা, বিতর্ক, আবৃত্তি, সংবাদপাঠ ইত্যাদি শ্রবণ করা উচিত। আরবদের আরবি কথাগুলো অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করতে হবে। কোন শব্দ কীভাবে উচ্চারণ করছে, কোন কোন জায়গা থামছে, কোথায় আওয়াজ উঁচু করছে, কোথায় নিচু করছে ইত্যাদি বিষয় ভালোভাবে খেয়াল করবে এবং তাদের লাহজা তথা বাচনভঙ্গি শেখার চেষ্টা করবে। আগেই আলোচনা করা হয়েছে যে, প্রত্যেক ভাষার নিজস্ব একটি বাচনভঙ্গি রয়েছে। যেই ভাষায় কথা বলবে সেই ভাষার বাচনভঙ্গি দিয়েই বলতে হবে। নতুবা শ্রুতিকটু লাগবে। আরবদের বাচনভঙ্গি ফাসিহুল লিসান বা শুদ্ধ ও মার্জিত ভাষার অধিকারী

শিক্ষিত আরবদের সাহচর্যে থেকে অর্জন করতে হয়। এছাড়া আরবি বেতার কেন্দ্রের সংবাদ সম্প্রচার, তদ্রুপ আদর্শ আরবি অডিও ক্যাসেড থেকে আরবদের বাচনভঙ্গি অর্জন করা যেতে পারে। আরবদের বাচনভঙ্গি অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। একে খাটো করে দেখার কোনো সুযোগ নেই।

এখানে একটি কথা মনে রাখতে হবে যে, আমরা আরবদের বাচনভঙ্গি শেখার উদ্দেশ্যে তাদের যে অডিও বয়ান, কথোপকথন, সংবাদ সম্প্রচার ইত্যাদি শ্রবণ করবো তা অবশ্যই উসতাদের তত্ত্বাবধানে হতে হবে। এমন যেন না হয় যে, আরবদের বয়ান শ্রবণের উদ্দেশ্যে জাওয়াল গ্রহণ করলাম এবং স্বাধীনভাবে ব্যবহার করতে শুরু করলাম। এতে অনেক ক্ষতির আশঙ্কা আছে। আল্লাহ সকলকে জাওয়ালের ভয়াবহ ক্ষতি থেকে হেফাজত করুন। আমিন।

নিয়মিত আরবদের আলোচনা শোনা

দৈনিক রুটিনের তালিকায় আরবদের বক্তৃতা বা টকশো বা অন্য কোনো আলোচনা শোনা বাধ্যতামূলকভাবে রাখা উচিত। নিয়মিত আরবদের আলোচনা শ্রবণের অভ্যাস করলে ধীরে ধীরে আরবদের লাহজা বা আরবীয় বাচনভঙ্গি শেখা হয়ে যাবে। যতটুকু সময়ই হোক, পাঁচ মিনিট বা দশ মিনিট করে হলেও নিয়মিত এই কাজটি করে যাওয়া চাই।

গ্রন্থপঞ্জি

১. আল কুরআনুল কারিম।

২. তাফসিরে তাওযীহুল কুরআন, শাইখুল ইসলাম আল্লামা মুফতি তাকি উসামানি হাফিজাহুল্লাহ রচিত, মাকতাবাতুল আশরাফ, বাংলাবাজার, ঢাকা থেকে প্রকাশিত মাওলানা আবুল বাশার মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম হাফি. কর্তৃক অনূদিত।

৩. ইকতিদউস সিরাতিল মুসতাকিম লি মুখালাফাতি আসহাবিল জাহিমঃ ইবনে তাইমিয়া রহ., ড. নাসির বিন আবদুল কারিম এর তাহকিক ও তালিককৃত, মাকতাবাতুর রশিদ, রিয়াদ, সৌদি আরব।

৪. তালিমুল আরাবিয়্যাহ লিগাইরিন নাতিকিনা বিহাঃ ড. রুশদি আহমাদ তুআইমা।

৫. আরবি ভাষা পাঠদান পদ্ধতি: ড. মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম। ইসলামিক ফাউণ্ডেশন।

৬. আরবি ভাষায় দক্ষতা ও শিক্ষাদান পদ্ধতি: প্রফেসর ড. মোহাম্মদ ইউসুফ। ইসলামিক ফাউণ্ডেশন।

৭. মাতা তাকুনুল কিতাবাতু মুআস্সিরাতানঃ মাওলানা নুর আলম খলিল আমিনি রহ., মুআসসাসাতুল ইলমি ওয়াল আদাব, দেওবন্দ, ভারত।

৮. তাআল্লামুল আরাবিয়্যাতা ফাইন্নাহা মিন দিনিকুমঃ মাওলানা নুর আলম খলিল আমিনি রহ., মুআসসাসাতুল ইলমি ওয়াল আদাব, দেওবন্দ, ভারত।

৯. আল কিরাআতুর রাশিদা (৩য় খণ্ড) : সাইয়েদ আবুল হাসান আলি নাদাবি রহ., মাকতাবাতুত তাকওয়া, বাংলাবাজার ঢাকা।

১০. কাসাসুন নাবিয়্যিনঃ সাইয়েদ আবুল হাসান আলি নাদাবি রহ., দারুল কলম।

১১. মাজা খাসিরাল আলাম বিনহিতাতিল মুসলিমিনঃ সাইয়েদ আবুল হাসান আলি নাদাবি রহ.।

১২. মুসলিম উম্মাহর পতনে বিশ্বের কী ক্ষতি হলো: মাওলানা আবু তাহের মিসবাহ, দারুল কলম আশরাফাবাদ, ঢাকা। (সাইয়েদ আবুল হাসান আলি নাদাবি রহ. এর 'মাজা খাসিরাল আলাম বিনহিতাতিল মুসলিমিন' এর অনুবাদগ্রন্থ)।

১৩. আল কাওয়ায়িদুন নাহবিয়্যাহ আল মুয়াসসারাহ: ড. মাহমুদ ইসমাঈল, ড. ইবরাহিম ইউসুফ, মুহাম্মাদ রিফাই।

১৪. আন নাহবুল ওয়াজিহ ফি কাওয়ায়িদিল লুগাতিল আরাবিয়্যাহ: ড. মুস্তফা আমিন, ড. আলি আল জাবির।

১৫. হেদায়াতুন নাহু: আল্লামা সিরাজুদ্দিন ইবনে উসমান (মৃত্যু: ৭৮৫)

১৬. আরবি ভাষা পাঠদান পদ্ধতি: মাওলানা সফিউল্লাহ ফুআদ হাফিজাহুল্লাহ। মাকতাবাতুত তাকওয়া, বাংলাবাজার ঢাকা।

১৭. কাইফা নাতাআল্লামুল ইনশা (৩য় খণ্ড): মাওলানা সফিউল্লাহ ফুআদ হাফিজাহুল্লাহ। মাকতাবাতুত তাকওয়া, বাংলাবাজার ঢাকা।

১৮. কাইফা নাতাআল্লামুল ইনশা (২য় খণ্ড): মাওলানা সফিউল্লাহ ফুআদ হাফিজাহুল্লাহ। মাকতাবাতুত তাকওয়া, বাংলাবাজার ঢাকা।

১৯. আসালিবুল ইনশা: মাহমুদ ওমর।

২০. আত তরিকু ইলাল ইনশা: (৩য় খণ্ড): মাওলানা সুলতান জওক নাদাবি হাফিজাহুল্লাহ।

২১. আল ইনশাউল ওয়াজিফি: মাওলানা শহীদুল্লাহ ফজলুল বারী রহ.।

২২. সুয়ারুম মিন হায়াতিস সাহাবা: ড. আবদুর রহমান রাফাত পাশা।

২৩. রাওয়ায়িয়ুল কিসাসিল আদাবিয়্যাহ: মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল আউয়াল আফাল্লাহু আনহু এর তাহকিক ও তালিককৃত, মুআসসাসাহ আরাবিয়্যাহ বাংলাদেশ।

২৪. আরবি কথোপকথন কীভাবে শিখব: মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল আউয়াল আফাল্লাহু আনহু। মুআসসাসাহ আরাবিয়্যাহ বাংলাদেশ।

২৫. আরবি ইলমি কথোপকথন: মাওলানা আবদুল হালীম নোমানী আযহারী হাফি.। মাকতাবাতুল আফনান, মাদানীনগর, ঢাকা।

২৬. আল মাদখাল ইলা ওয়াসায়িলিল ইলাম: ড. আবদুল আজিজ শরফকৃত।

২৭. আল লুগাতুল ইলামিয়্যাহ।

২৮. লুগাতুস সুহুফিল আরাবিয়্যাহ: মাওলানা শহীদুল্লাহ ফজলুল বারী রহ.।

২৯. আসসিহাফাতু ওয়া তাজদিদুল লুগাহ: আবদুল্লাহ কানুন

৩০. মিডিয়া আরবি কীভাবে শিখব: মাওলানা মিযান হারুন হাফি., মাকতাবাতুদ দাওয়াহ, উত্তরা, ঢাকা।

৩১. মাসিক আল কাউসার।

৩২. আরবি ভাষা শিক্ষা: ড. হায়াৎ মামুদ।

পাঠকের মন্তব্য

লেখক পরিচিতি

মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল আউয়াল হাফিজাহুল্লাহ। একজন মাটির মানুষ। সদা হাস্যোজ্জ্বল। বিনয়ী। উদ্যমী। প্রখর মেধাবী। তরুণ প্রতিভাবান লেখক। আরবি ভাষা প্রেমিক এবং একজন দরদী উস্তাদ। ১৮ অক্টোবর ১৯৯৫ ঈ. সালে মানিকগঞ্জ জেলার হরিরামপুর থানাধীন পূর্বখলিলপুর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া সাতমস-জিদ, মুহাম্মদপুর, ঢাকা থেকে ২০১৫ ঈ. সালে দাওরায়ে হাদিস (মাস্টার্স) সমাপ্ত করে আল জামিয়াতুল ইসলামিয়া দারুল উলুম মাদানীনগর ঢাকা-য় উচ্চতর আরবি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগে কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। তাঁর গোটা ছাত্রজীবন পরিচালিত হয়েছে তালিমি মুরব্বির তত্ত্বাবধানে। অধ্যাপনাজীবনেও তিনি তালিমি ও ইসলাহি মুরব্বির তত্ত্বাবধানে ইলমি কাজ করে যাচ্ছেন।

তিনি আমার সহপাঠী। রাহমানিয়ার কাননে আমরা এক সাথে কাটিয়েছি অনেক বছর। শরহে বেকায়া থেকে দাওরায়ে হাদিস। লেখাপড়া ছিল তাঁর নেশা। রুটিন অনুযায়ী চলত তাঁর সময়ের গতি। প্রতিটি কাজ করতেন অতি স্বল্প সময়ে। একদিনের ঘটনা। আমরা পাশাপাশি বসতাম। তিনি গামছা হাতে বের হচ্ছেন। জিজ্ঞেস করলাম, "কোথায় যাচ্ছেন?" উত্তরে বললেন, "গোসল সেরে আসি।" আমি বসে কিতাব পড়ছিলাম। আমার দৃষ্টি কিতাবের দিকেই ছিল। মাত্র পাঁচ মিনিট পরেই দেখি তিনি আমার পাশে বসে কিতাব পড়ছেন। বললাম, "কী ভাই, গোসলের সিরিয়াল পান নি?" তিনি বললেন, "না ভাই, গোসল তো শেষ।" আমি অবাক হয়ে বললাম, "আপনি তো দেখি একটা রোবট।" আমার কথা শুনে বললেন, "আপনি তো আরো বড়ো রোবট।" যখনই তাঁর সাথে দেখা হতো একগাল স্নিগ্ধ হাসি তাঁর মায়াবী মুখে শোভা পেত। তিনি প্রায়ই একটি কথা বলতেন, "ভাই, সময় নেই। অনেক মুতালাআ করতে হবে, লিখতে হবে অনেক।"

ফ্ল্যাপের অপর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

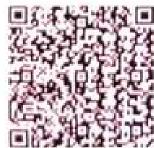
বইটিতে যা রয়েছে

- আরবি ভাষায় চারটি দক্ষতা তথা পঠন, লিখন, কথন ও শ্রবণ দক্ষতা অর্জনের আদর্শ পদ্ধতি উদাহরণ ও নমুনাসহ বিস্তারিত আলোচনা।
- 'এসো আরবি শিখি' ও আততামরিনুল কিতাবী' কিতাব পড়ার সহিহ পদ্ধতি।
- প্রাথমিক পর্যায়ে আরবি ভাষা শেখার নীতিমালা।
- নাহু-সরফের কিতাব পড়ার বিশুদ্ধ নিয়ম।
- কিতাবি ইস্তিদাদ অর্জনের পদ্ধতি।
- আরবি ভাষা ও সাহিত্যের কিতাব পড়ার ক্ষেত্রে যে পাঁচটি পদ্ধতি অনুসরণ করা জরুরি।
- আরবি থেকে বাংলায় অনুবাদের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় ২৫ টি বিষয়।
- যেকোনো অনুবাদের ক্ষেত্রে (আরবি থেকে বাংলা কিংবা বাংলা থেকে আরবি) লক্ষণীয় ১৭ টি বিষয়।
- আরবি অভিধান ব্যবহারের প্রয়োজনীতা এবং অধিক উপকারী ও গ্রহণযোগ্য আরবি অভিধানের একটি তালিকা।
- আরবি পত্রিকা পড়ার যোগ্যতা অর্জনের পদ্ধতি।
- আরবিতে রোজনামচা, প্রবন্ধ-নিবন্ধ, দরখাস্ত, চিঠিপত্র ইত্যাদি লেখার নিয়মকানুন।
- সফল লেখক হওয়ার কলাকৌশল।
- আরবি কথোপকথন শেখার গুরুত্বপূর্ণ ১৫ টি পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা।

প্রকাশনায়



মুআসসাসাহ আরাবিয়্যাহ বাংলাদেশ
০১৭৬৫১২৭৭৫৫



পরিবেশনায়



মাকতাবাতুত তাব ওয়া
১১/১ ইসলামী টাওয়ার (আন্ডার গ্রাউন্ড), বাংলাবা , ঢাকা।